গল্পসমগ্র

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়
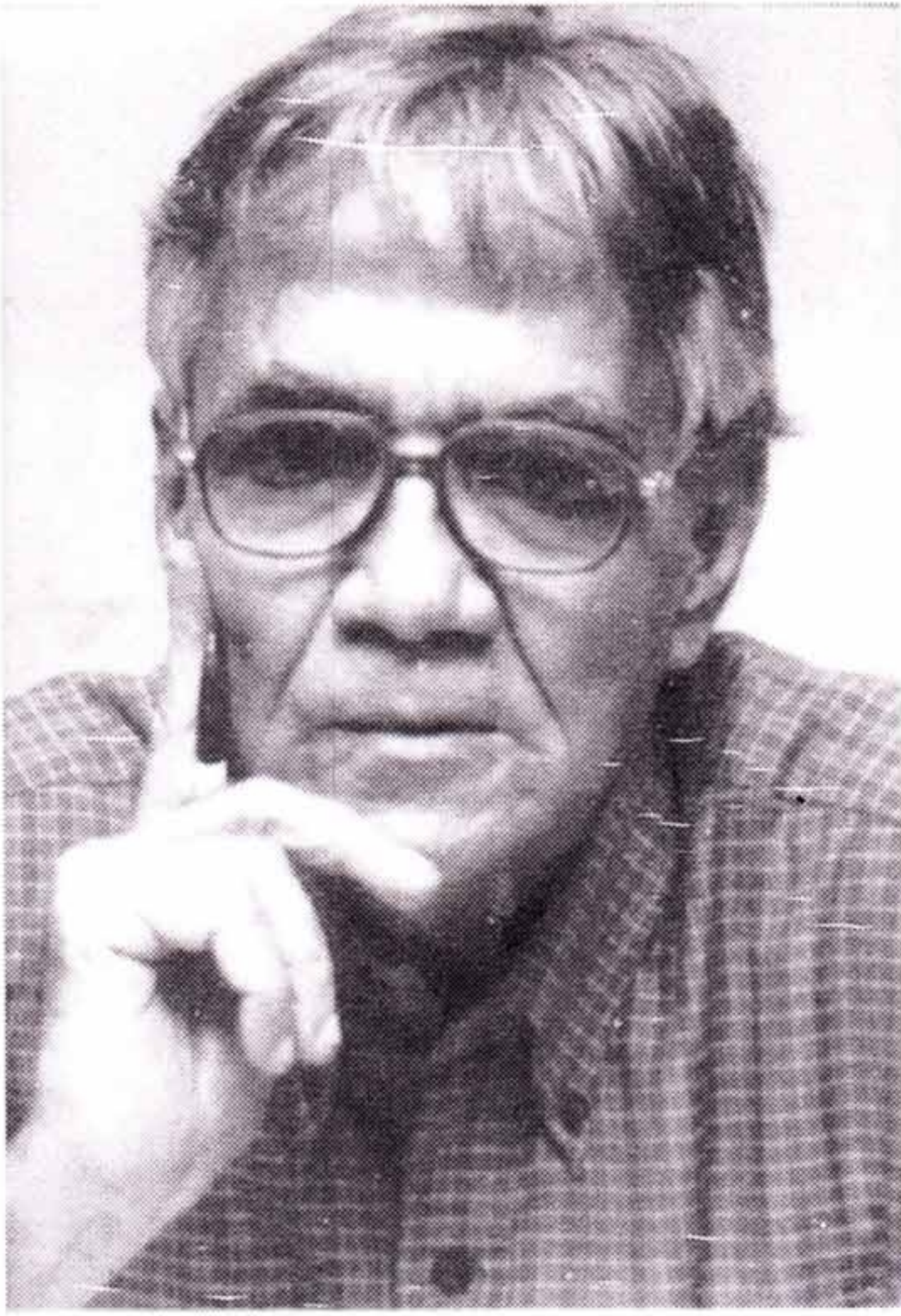
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ঃ ২৫ অক্টোবর ১৯৩৩

বঙ্কিম পুরস্কার ঃ ১৯৯৫

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ঃ ২০০২

*

'আমি প্রায় সবকিছুকেই মিথ্যে ও ভুল বলে ধরে নিয়েছি। সবচেয়ে বড় ভুল ও বেশি সন্দেহজনক মনে করেছি আমার আন্তরিকতাকে। কোনো ভোর ভালো লাগলে, কোথাও বা গড়ের পিছনে সূর্যাস্ত দেখে মুগ্ধ হলে কোনোদিন, কাঁধে হাত রেখেছি নিজের, 'সত্যি তো, নাকি বই পড়ে শিখেছ?' জানতে চেয়েছি, 'বা, এইরকম প্রচলিত বলে ভালো লাগছে!'

ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী (১৯৬১)

আমার মতো মৃত্যু-শিক্ষায় যারা অশিক্ষিত,- মৃত্যু এসে যথাসময়ে তাদেরও যৎপরোনাস্তি শিক্ষিত করে নেবে। সব দায়দায়িত্ব তো তার! মৃত্যুর। দরকার হলে সে স্বয়ং কবর খুঁড়বে। তবে কোনো এপিটাফ লিখতে সে পারবে না। জিজ্ঞাসা একটাই। কতটা হাঁটাবে?

বলি তাহলে গল্পটা?

ত্রিপুরার বইমেলায় যাই ১৯৯৯ সালে। ওখানে মেলার মধ্যে তথ্য দপ্তরের এক আই. এ. এস অফিসার কথায় কথায় বললেন, 'নাঃ আপনার জন্যে লাখ পাঁচেকের বেশি চাইবে না।' বলে আমার দিকে এমনভাবে চাইলেন যেন আমার বায়ো-ডাটা শুনে আমাকে তাঁর ভিখারিই মনে হয়েছে।

কথা হচ্ছিল জঙ্গিরা বইমেলা থেকে সাহিত্যিক তুলে নিয়ে গেলে কার জন্য কত দর হাঁকবে। প্রথমেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের দর জানতে চাই। উনি ভেবেচিন্তে বললেন, 'তা এক কোটি তো চাইবেই!'

আমার দর শুনে আমি আতঙ্কিত হয়ে বললাম, 'আমার তো ৫০ হাজারই নেই।'

'সে গয়নাগাটি বেচে ফ্ল্যাট বেচে আপনার স্ত্রী ঠিক জোগাড় করবেন। কিন্তু কথাটা তো তা নয়।' সেক্রেটারি সাহেব আমাকে বললেন, 'কথা হল, কতটা হাঁটাবে?'

'হাঁটাবে মানে?'

'যতক্ষণ না টাকা পায় এ-পাহাড় থেকে ও-পাহাড় হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে না? এক জায়গায় তো রাখবে না!' বিমর্ষ হাসি হেসে সেক্রেটারি বললেন।

সত্যিই, সেটাই কথা! মুক্তিপণ তো নেবেই। কিন্তু কতটা হাঁটাবে?

জঙ্গি ও অপহরণ বিষয়ে ২টো-১টা কথা যা আমি জানি
আড়িয়াল খাঁ, প্রথম সংখ্যা, বইমেলা ২০০৫

গল্পসমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা

অদ্রীশ বিশ্বাস

মিত্র ও ঘোষ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

উ ৎ স র্গ

মা ও মেয়ে
রিনা চট্টোপাধ্যায়
তৃনা চট্টোপাধ্যায় (বসু)
ভাইঝি
ডা. মিতালি গঙ্গোপাধ্যায়কে

সম্পাদকের নিবেদন

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বিশ্বাস করেন ভাল লেখার জন্য বেশি লেখার দরকার নেই। বরং কম লেখার প্রতিই তাঁর পক্ষপাত। তাই দ্বিতীয় খণ্ড 'গল্পসমগ্র'-তে গল্পের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কমে গেল। জীবনের প্রথম দিকের কিছু গল্প বাদ দিলে, প্রথম গল্পগ্রন্থ থেকেই তিনি নিজের ভাষা খুঁজে পান, দৃষ্টিভঙ্গিও স্পষ্ট হয়ে যায়। যাকে বলে 'স্ট্যান্ড'। সেই পাঁচের দশক থেকে বা বলা যায় ষাট দশকের শুরুতেই তিনি পাঠকদের কাছে গৃহীত একজন অন্য ধারার লেখালিখির উল্লেখযোগ্য গদ্যকার। তথাকথিত গল্প বলতে যা বোঝায় তিনি তা লেখেননি। এমনকি প্রথাগত ফর্মেও সব সময় বিশ্বস্ত থাকেননি। অনেক সময় ফর্মটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে প্রচলিত গল্পের গঠন-ধারণা বেশ বদলে গেছে। এর জন্য তাঁকে কোনো আন্দোলন করতে হয়নি, তিনিই হয়ে উঠেছেন আন্দোলনের সমগোত্রীয়। হ্যাঁ, তাঁকে অনুসরণ করে বাংলাভাষায় কেউ কেউ লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ বা পরবর্তীকালে নিজের পথ খুঁজে পেয়েছেন, কেউ সেই ঘোরে আটকে গেছেন। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে তত জরুরি নয়।

এই খণ্ডে গ্রথিত হল এমন সব গল্প, যখন তিনি লেখক রূপে পরিণত, সচেতন। বুদ্ধি ও অনুভূতিতে নির্ভুল। আর সেটাই লক্ষ্য করার বর্তমান খণ্ডে।

১৯৯৩ সালে প্রকাশিত 'পঞ্চাশটি গল্প', তারপর যতগুলো গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সব নিয়ে গ্রন্থায়িত গল্পের অংশ। বাকি সব অগ্রন্থায়িত গল্প। যেসব গল্পের একাধিক পাঠ আছে একই নামে কিংবা নানা নামে; তাদের মধ্যে পরিচিত নামের পাঠটিকে কিংবা সম্পাদিত পাঠটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। উৎস পরিচিতিতে প্রকাশিত গল্পের উৎস জানানোর পাশাপাশি প্রথম উৎসটাকেও উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত গল্পই কালানুক্রমিকভাবে ছাপা হল—গ্রন্থের ক্ষেত্রে গ্রন্থ প্রকাশের কালানুক্রম অনুসারে এবং অগ্রন্থায়িত গল্পের ক্ষেত্রে পত্রিকার প্রকাশের কাল অনুসারে।

প্রথম খণ্ডের মত এই খণ্ডের শেষেও যুক্ত হল বিস্তারিত গ্রন্থপরিচিতি, যাতে রইল আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়া ও লেখকের সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত নানা টুকরো। শেষে পরিশিষ্ট দুটিতে ধরা পড়বে সন্দীপনের সামগ্রিক সাহিত্যভাবনা —সেগুলো ছাপা হয়েছে 'সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' ও 'পঞ্চাশটি গল্প'-র ভূমিকা হিসাবে।

সংশোধন : প্রথম খণ্ডের গ্রন্থপরিচিতে সন্দীপনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখা হয়েছিল 'প্রথমে বঙ্গবাসী কলেজ তারপর প্রেসিডেন্সি'; সেটা উল্টো হবে, আগে প্রেসিডেন্সিতে পড়েন, পরে বঙ্গবাসী থেকে পরীক্ষা দেন।

এই খণ্ডের কাজে যাঁদের সাহায্য পেয়েছি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই : রিনা চট্টোপাধ্যায়, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত ঘোষ, মউ ভট্টাচার্য, প্রচেতা ঘোষ, সন্দীপ দত্ত।

অদ্রীশ বিশ্বাস

এখনো গেল না আঁধার
সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

To show things in bright colours in devastating
—মিকোলস্ ইয়াঞ্চো

রেমণ্ড উইলিয়ামস, আমাদের পক্ষে স্মরণীয় একজন মহাজন, তাঁর কোনো একটি কৃশকায় নিবন্ধের এরকম শিরোনাম দিয়েছিলেন—হোয়েন ওয়জ মডার্নিজম? এই জিজ্ঞাসা চিহ্নটুকু আমাকে অভিভূত করে। এ জন্য নয় যে উইলিয়ামস আধুনিকতার স্থানাঙ্ক নির্ণয় করে দেবেন। বরং আমরা এ জাতীয় জিজ্ঞাসার প্রহারে মাত্রামোচন করি। সাধারণভাবে জানা পৃথিবীর পরিধি থেকে মুক্ত হয়ে গেলে যেভাবে আরেক পরিধি জড়িয়ে ধরে, সন্দীপনকে আধুনিক বললে শেষপর্যন্ত আধুনিকতার আয়ুরেখা বিচার আমাদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। অত্যন্ত বিমূঢ় আমি তবে প্রশ্ন করতেই পারি সন্দীপনের পরিচয়পত্রটি কোথায়? যদি বলি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এমন এক গদ্যলেখক যিনি শুধু আমাদের গল্প বা উপন্যাস পাঠের রীতিটিকেই সকৌতুকে ওলোটপালোট করে দেননি, সম্প্রসারিত করেছেন আমাদের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাকেও, তবে কি এই মন্তব্যকে অতিশয়োক্তি মনে করা হবে?

বছর ষোল আগে প্যারিসের একটি দৈনিক পত্রিকায় দেওয়া তাঁর শেষ সাক্ষাৎকারে খ্রিস্টের অধিক সেই চলচ্চিত্রকার আন্দ্রেই তারকোভসকি অত্যন্ত অর্থপূর্ণভাবে বলেন—আমাদের সৌন্দর্য উপলব্ধিতে পিকাসোর অবদানই সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সৌন্দর্যের যথাযথ ব্যাখ্যা করবার বদলে তিনি বিনষ্টি, অপব্যবহার ও অবনমনের মাধ্যমে সৌন্দর্যকে মহিমান্বিত করতে চেয়েছেন। আমরা দেখব গদ্যশিল্পী সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় চান বাস্তবতার স্বধর্মে লিপ্ত থেকে বাস্তবতার নরকটুকু পার হয়ে যেতে। নারী-পুরুষের রতি-সুষমায় এমনকি বিজ্ঞাপনের সংযোজনীতে প্রমাণ করতে চান এই-তো পাপের ফুল, একে ছোঁয়া তো যেতেই পারে। বড় জোর তারকোভসকির মত মহৎ দৃষ্টান্ত হাতের সামনে থাকায় আমরা বলতে পারি, যেমন তাঁর 'স্টকার' নামক চলচ্চিত্রে বিজ্ঞানী ও লেখক 'অঞ্চল' পেরিয়ে ইচ্ছাপূরণের ঘরটিতে প্রবেশ করতে পারে না, সন্দীপনের ক্ষেত্রেও হয়ত উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি আত্মার নিরাময় নয়। রোধে-অবরোধে-ক্লেশে ইতিহাসের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে থমকে থাকেন তিনি; দ্রষ্টার ভূমিকায় উন্নীত হতে পারেন না। হয়তো চান না বলেই।

যাঁরা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা পড়েন তাঁদের আর নতুন করে বলে দিতে হবে না যে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এত নাগরিক লেখক আর নেই। তাঁর শব্দে কোনো মেঘমায়া নেই; কণ্ঠস্বরে পাঁচালি নেই। আছে মডেলযুবতী। ক্যাইজসফল প্রজন্ম। যৌনযুদ্ধ ও অন্তহীন জেব্রাঋতু। আর আছে মৃত্যু : নক্ষত্র নারীর কেশপাশ। এত অসামান্য যত্নশীল এই লেখক যে তাঁর তুচ্ছ পর্যবেক্ষণকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। ম্লান এই শহরের আকাশ চুম্বন আর উচ্ছন্নের ঝুপড়ির অন্তর্বর্তী মধ্যবিত্ত দুনিয়ার বিষাদ নিয়তি তাঁর কররেখা। আমরা গত চল্লিশ বছর অনিঃশেষ মুগ্ধতার সঙ্গে খেয়াল করে এলাম প্রচলিত নন্দনতত্ত্বের থেকে মুখ ফিরিয়ে সন্দীপন কিভাবে রচনা করে যাচ্ছেন নিজেরই সমাধিফলক।

যে ভাষা রূপসীর শরীরে মতই মেদহীন ও অব্যর্থ, যে উচ্চারণ আমাদের শহরের বায়ুদূষণের মতই সত্য, যেখানে তিমিরলিপ্ত অকুস্থল ও অন্তর্বাসমথিত হাহাকার সন্দীপনের সেই কথ্যভঙ্গী ইতিমধ্যেই বহুবার প্রশংসিত; বহুচর্চিত, বহু মুদ্রাদোষের জনয়িতা, কিন্তু আমার বিনীত বক্তব্য এই যে শুধুই ভাষা ব্যবহার ও যুবাপুরুষের অস্তিত্বের অসুখের জন্যই তিনি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন না। আমি বলতে চাই সন্দীপনের রচনাসমূহ পাঠ করলে আধুনিকতার জরায়ু পর্যন্ত চলে যাওয়া যায়, আর তার এই আপাত-উজ্জ্বল প্রসাধন-চর্চার অন্তরালেই রয়ে গেছে আমাদের শতাব্দীর যাবতীয় পুণ্যকর্মের সারাৎসার। তথ্য আমাদের জানায় যে 'বিজনের রক্তমাংস' গল্পটির বঙ্গবিজয় ষাট দশকের শুরুতে। কিন্তু এই অসুখের রোগলক্ষণ, তা দুশ্চিকিৎস্য বা অচিকিৎস্য এ জাতীয় দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসাকে সরিয়ে রেখে এখন স্বচ্ছন্দে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় বিজনের বাস্তবতা এক প্রামাণ্য স্বপ্ন অথবা স্বপ্নের নথি। ঐতিহাসিকভাবেই বিজন প্রথম বাস্তবতার সারূপ্যরহিত গদ্য লেখার প্রয়াস আমাদের সাহিত্যে। একটি উপলব্ধি যে এত আত্মসমীক্ষার আয়োজন করতে পারে তার আগে আমরা জানতে পারিনি।

ম্যাথু আর্নল্ড প্রসঙ্গে এলিয়ট একদা বলেন, যদি আর্নল্ড এমন সমাজে জন্মাতেন যেখানে শিল্প সম্মানিত, যেখানে শিল্প গভীরভাবে চর্চিত হয় তবে আর্নল্ড আবির্ভূত হতেন সমালোচক হিসেবে। আমি দাবি করব সন্দীপন এ জাতীয় সমীক্ষার একটি বঙ্গীয় সমর্থন। এখন শিক্ষিত মানুষ মাত্রেই জানেন যে সেই কবে ফরাসি দেশে ইংরেজির এক স্কুল মাস্টার স্তেফান মালার্মে 'লা পয়েজি ক্রিতিক'-এর কথা তুললেন : শিল্প ক্রমশ সমালোচনামূলক, প্রতিফলনশীল হয়ে উঠল। আশ্চর্য হলেও সত্য যে এমন এক কবি যিনি গাঢ় নীলিমায় ও প্রখর রৌদ্রে, নির্জন তটরেখায় ধ্বনির তাৎপর্য খুঁজে পেতেন তিনিই শব্দের নিজস্ব ও অন্তর্গত তর্ককে সমর্থন করতে পারলেন। পঞ্চাশ দশকের শিল্পচর্চায় এই বক্তব্য ও প্রতিবক্তব্যের সমন্বয় কতদূর ইতিহাসে ছায়া ফেলতে পারে তা জঁ পল সার্ত্র-এর 'পরিস্থিতি' পড়লে বোধগম্য হয়ে উঠবে। ওই নিবন্ধে সার্ত্র দাবি করছেন যে মালার্মের পর থেকে (অবশ্যই ইউরোপিয় ভূখণ্ডে) এমন কোনো শিল্পই রচিত হয়নি, যা নিজের গঠনরীতি সম্বন্ধে প্রশ্নশীল হয়নি। সার্ত্রের হাতের পাঁচ উদাহরণ হিসেবে মনে এসেছিল জ্যাকোমেত্তির নাম। এই বক্তব্যের সূত্র ধরেই হয়ত আমরা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের ফরাসি নবতরঙ্গের রূপরেখাটি খুঁজে পাব। ছোট কোনো লেখাতে সন্দীপন যখন হঠাৎ অত্যন্ত সম্ভ্রমী অথচ মৃদু স্বরে বলেন যে সকল চক্ষুষ্মানতার মধ্যে বিশ্বাস হল কেন্দ্রীয় অন্ধত্ব, তখন আমরা তার লঘু আলাপের সুর ছিন্ন করে বর্ষার পরিব্যাপ্ত রাত্রিতে বিদ্যুতের আশ্চর্য পথনির্দেশিকার মতো খুঁজে পাই যে একটি অবিশ্বাসই সন্দীপনের সহমরণে যাবে যা হল—এই সন্দেহ। তার যাবতীয় বিশ্বাস এই অবিশ্বাসের সূত্রে সগর্ভ হয়ে উঠেছে আজীবন। আমি এবারে উদাহরণ দেব কি? যেমন ধরা যেতে পারে 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী'র সেই অতিখ্যাত অংশটি—

'সবচেয়ে ভুল ও সন্দেহজনক মনে করেছি আমার আন্তরিকতাকে। তবুও কোনো ভোর ভাল লাগলে বা পৃথিবীর বিখ্যাত সিনারিগুলির অন্যতম গড়ের পিছনের সূর্যাস্ত দেখে মুগ্ধ হয়ে আমি কাঁধে হাত রেখেছি নিজের 'সত্যি তো, নাকি বই পড়ে শিখেছ?'

ঠিক এই জন্যেই সন্দীপনের লেখার মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট বা কোনটি অপকৃষ্ট তা বলা যায় না। কেননা তার বিষয় নেই। একটি সংশয়কে অন্ধের যষ্টির মতো আগলে রাখা বা জীবনানন্দ যেমন 'আমাদেরই আন্তরিকতাতে আমাদেরই সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যথা পান, তেমনভাবেই অথচ বেদনাহীন, প্রেমহীন, আবেগহীন অক্ষরের পারাপার,

শব্দের গ্রন্থিমোচন সন্দীপনের নিত্যকর্মপদ্ধতি। যেমন গত শতাব্দীর অনেক আধুনিক শিল্প, যেমন পিকাসো তাঁর কোলাজে বা এলিয়ট তাঁর কাব্যে কিংবা গোদার তাঁর চলচ্চিত্রে উদ্ধৃত করেন, সন্দীপনের পক্ষেও শিল্পচর্চা প্রায়ই কোটেশনের সমাহার। এমনকি একটি গোয়েন্দা কাহিনীর ঠাঁস বুনোট, সেলুলয়েডের গোদারকে ও ভাষার সন্দীপনকে প্রতিহত করতে পারে না জীবন বিষয়ে, নরনারীর রতি চুম্বন বিষয়ে, এমন কি রচনার পন্থা বিষয়ে টীকার সংযোজনীতে।

যেমন শত মুখে বলা যায় সমকালীনতার প্রসঙ্গ। সন্দীপন শুধু সমকালীন নন, তিনি তো সময়েরই, বাস্তবিক, সহবাস করেন। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় আত্মসচেতনভাবে সমকালীন। তথ্যের দিক থেকে তো বটেই, তার প্রতিটি দৃশ্যবিন্যাস. বাক্‌রীতির অনুপুঙ্খ ও ছেদচিহ্নের শিহরণ মনে রাখে যে তারা ঘটমান বর্তমানেরই অংশ। একইসঙ্গে উল্লেখ করার যে এই লেখকের গদ্যচর্চার যা কিছু সীমাবদ্ধতা ও সফলতা তা হল এই এমন এক ভাষা-মাধ্যম যা শুধু বর্তমান। যেন এক অন্তহীন ক্রিয়া বিপর্যয় যেখানে নেই কোনো অতীত বা ভবিষ্যৎ। সন্দীপনের ঘটনাসমূহ মনে রাখার, দ্রৌপদীর খোলা শাড়ী, একধরনের মেটাফিজিক্যাল ন্যুডিটি। তিনি জানেন শেষ কুড়ির শতকে রহস্য আর কিছু নেই। রৈখিক কথকতার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সন্দীপনের কোনো লেখাই যাকে বলে সত্য ও স্থায়ী কিছুর অভিব্যক্তি নয়। তাঁর ক্ষেত্রে জীবনের সীমারেখা ও তাৎক্ষণিকতাই সত্য আর এই তাৎক্ষণিকতার ওষ্ঠ সংলগ্ন হয়ে থাকে মৃত্যু : কূটনীতি, ঠাণ্ডা, শূন্য আগ্নেয় তোরণ। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহ, উল্লাস ও মত্ততা, এই নামহীন নশ্বরতার বিকিরণ। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সজ্ঞানে নশ্বর। লেখকেরা যদি সাধারণভাবে জীবনানুগত হন, ইনি আমাদের আলোচ্য এই সন্দীপন তবে মৃত্যুর দ্বারা অধিগৃহীত। 'ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী' থেকে 'এসো নীপবনে' বস্তুত একটি বিরতিহীন এপিটাফ। মৃত্যু যা অমরতার সমায়তন, যা সমুদ্রসমান, তা এই লেখকের প্রধান পরীক্ষা আজীবন। যারা তাঁর সহজীবী, যারা জড়ের সন্ততি, মৃত্যুভয় থেকে যারা পরিত্রাণ চেয়েছে মিথুনে, এই লেখক তাদের পক্ষে আধুনিক নচিকেতাপ্রতিম। সন্দীপন পরিক্রমা সেদিক থেকে দেখলে যমালয়ে রাত্রিযাপন।

'যামিনীর অন্ধকারে শরীর উৎকীর্ণ করে ব্যভিচারিণী সে দাঁড়িয়ে আছে নিষিদ্ধ নিমন্ত্রণ তরল পারার মত জ্যোৎস্নায় তার মুখ পুড়ে যাচ্ছে তার দুই কানে শোলার কাঠি ও গলায় পলালমণ্ডিত নীল মালা রূপা তামা লোহা ও গালা এইসব ধাতু ধারণ করে কারুকার্যময় ভগ্নমূর্তির মতো তুলাদণ্ড হাতে সে দাঁড়িয়ে শুধু তার চিরস্থির স্তনচূড়ায় রক্তাভ চোখ ধকধকিয়ে জ্বলছে।'

ওই নারী আমাদের টেনে নেয় নিজস্ব প্রদেশে। ভাষালাবণ্যের দাহ্যসুখে তিনি মজে যেতে চান না মোটেই, বরং প্যাস্টোরাল গদ্যের নির্মনন স্থূলতাকে প্রত্যাখ্যান করে পৌঁছে যেতে চান উৎস এবং আত্মায়। একদা সন্দীপনের নায়ক যে সমুদ্রের সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েও জীবানু সংক্রমণ থেকেই রেহাই পায়নি, আজ প্রায় তেতাল্লিশ বছর হল সেই সমুদ্রের নৈশ উপাখ্যান ও দুঃস্বপ্নরাশি আমরা দেখে আসছি। অতএব সন্দীপন ক্ষমতাবান, সন্দীপন ঝকঝকে ভাষা ব্যবহারে তুলনারহিত কিন্তু সন্দীপনের উত্তরণ নেই, একথা বলার আর কতদূর অর্থ আছে—আমাদের ভেবে দেখতে হবে। তবু এ মৃতের গল্প। এই লেখকের চরিত্র নির্মাণে জীবিতের ধর্ম আরোপ করলে প্রসঙ্গান্তরে চলে যেতে হবে। সন্দীপন, হে পাঠক, যাদের কথা বলেন জীবনের শুরু থেকে তারা, হাসুক কিংবা কাঁদুক, লিঙ্গোচ্ছ্বাস বা স্তনশ্রীর বশীভূত হোক বা না হোক, মাংস মণ্ডিত কঙ্কাল।

যেমন ধরা যাক 'পঞ্চাশটি গল্প' যা অদ্যাবধি মোটামুটি সবচেয়ে স্পষ্ট ও স্বচ্ছভাবে

লেখকের কৃতকর্ম সম্বন্ধে মন্তব্য করে। সপ্রাণ জননী নয়, মৃতা মা এবং তাও নয়—মৃত্যুর সময় ভুলে যাওয়া আমাদের সভ্যতার অন্তর্গত হাহাকার সম্বন্ধে কবে যে একটি বইয়ের প্রথম ছত্রটি লিখেছিলেন আলব্যেয়ার কামু! সন্দীপনের পক্ষে সেই মাতৃস্তোত্র বীজমন্ত্র হয়ে রইল। সন্দীপনের নায়ক দেখছি সমস্ত মানবিক সংযোগ ভেঙে পড়লে, জীবন যখন সতেজ ও রঙিন স্বাস্থ্যে ভরা নয়, হৃদযন্ত্র ও মস্তিষ্ক সচল রাখার প্রয়োজনে আশ্রয় নেয় সামাজিক অর্থে 'বিকৃত' বা 'অবৈধ' যৌন কামনার। জান্তব শরীরসংযোগে নিগৃহীত হতে হতে একদা অমৃতের সন্তান সে আসলে নিখিল বেদনার ভার বহন করে। পরিণামে যে সনাক্ত হয় সে এই সভ্যতা যে সন্দীপনের মাংসাশী স্ত্রীলোকদের মতই ঋতুস্তব্ধা। একজন প্রথিতযশা সমালোচক একবার এই গল্পসমূহকে আলোচনার উপকরণ ভাবতে গিয়ে সবিশেষ বিরক্ত বোধ করেছিলেন। অবিরাম মূত্রাগার, শৌচাগার, বাথরুম, কমোড ও পরিচারিকাগমনই বোধহয় শ্রদ্ধেয় সেই অধ্যাপকের নেত্রপীড়ার কারণ হয়ে থাকবে। কোনো সন্দেহ নেই নান্দনিকতা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাগুলিকে সন্দীপন আক্রমণ করেন আর সেই আক্রমণের তীব্রতা অনেক সময় অসুস্থতার সমীপবর্তী। এমনকি তিনি যৌনাঙ্গের রক্তাক্ত স্তরটিকে প্যাথোলজিকালি প্রস্থচ্ছেদ করেন। অর্থাৎ আধুনিক শিল্পীর বিবেকের তাড়নায় নিষিদ্ধ ও গোপন এই প্রতীক চিহ্নটিকেও ধ্বংস করেন। পড়ে থাকে পরিত্রাণহীন সর্বনাশ। সন্দীপনের সমর্থনে সহসাই আমার মনে পড়ে প্রধান এক চলচ্চিত্রকার ইংগমার বার্গমানের Cries and whispers; যেখানে তিনি অন্তহীন নিষ্ঠুরতায় মজে গিয়ে বিক্ষত যোনিরক্ত লেপন করে দেন নায়িকার মুখে, দেহের সবচেয়ে আধ্যাত্মিক অঞ্চলে। It's nothing but a tissue of lies—বাস্তবতার শেষ মায়া পর্দাটুকুও সরে যায়। রাতের পাহারা থেকে আর উদ্ধার নেই।

কুরূপা এই সরস্বতীর উপাসনা বস্তুত আধুনিকতার একটি অনিবার্য উপসর্গ যার সূচনা স্পেনীয় ক্ষতে—ফ্রানথিসকো গোইয়ার ছবিতে। আমার পাঠক মুহূর্তের জন্য মনে আনুন ডাচেস অফ আলবার স্মরণে ভয়াবহ সেই ছবিটির কথা যার আলঙ্কারিক নাম 'নগ্না মাহা'। নারী এই প্রথম প্রোজ্জ্বল ক্লেদ-জৈবতা ও মনোহীনতার প্রতীক। ওই স্ত্রীলোক কবরের মতো গভীর বাসরশয্যায় অপেক্ষমানা—তার ঘন উরুসন্ধিদেশে চৈতন্য লুপ্তির হাহাকার। যৌনতা অতঃপর আর মানবিক বিনোদনের অঙ্গীভূত রইল না। এই সূত্রেই ইউরোপিয় শিল্পধারার পরবর্তী পরিণতিতে পাপের ফুল ফুটে উঠল। ১৮৫৭ সাল। কবি শার্ল বোদলেয়ার প্রকাশ করলেন 'ফ্ল্যর দু মাল'। উদ্ধত কুসুম দুটি বহুদিনের জন্য শহীদ হয়ে যাবে। তার সবচেয়ে অন্তর্যামী শিষ্য ও আধুনিক কাব্যের অভিভাবকপ্রতিম র‍্যাবো নরকে এক ঋতু কাটাবেন আরো পরে ও এই ঘোষণায় যে 'সৌন্দর্য স্বয়ং উপবিষ্টা আমার জানুতে ও তাকে নিয়ে আমি ক্লান্ত'। সৌন্দর্য তবে এক আতঙ্কের সূচনা—রিলকে লিখবেন তাঁর এলেজিতে। সমস্ত বমনরহস্য খুলে ধরবার জন্যই বুঝি জঁ-লুক গোদার 'ম্যাস্কুলাঁ ফেমিনা' নামের চলচ্চিত্র নির্মাণের একটি যুক্তিসহ কৈফিয়ৎ দেবেন—

'I think it was Baudelaiere who said it was on the toilet walls that you see the human soul : you see graffiti there—politics and sex. Well that's what my film is.'

সন্দীপন যে এখনো আশা নামক পরিচারিকাকে কামনা করেন—এই তো যথেষ্ট। যখন আশা নেই, যখন হতাশা নেই, যখন গোপনীয়তাও নেই তখন একজন লেখক সমাজকে কোন সঙ্কেতবাক্য উপহার দেবেন? মানুষ তো পতিত—তার শাস্ত্র নেই, প্রকৃতি নেই, ঈশ্বর নেই। এইসব কবন্ধেরা মৃত্যুদণ্ডিতের দেশে হাততালি দিয়ে গান গায়।

সন্দীপনের অন্বিষ্ট হয়ে দাঁড়ায় বাইরের ও ভেতরের বন্ধন ও পরাজয় কাটিয়ে যদি কোনো মুক্ত, স্বাধীন কোনো সন্ন্যাসীকে দূরবীনের উল্টোদিক থেকে খুঁজে বার করা যায়। আর এ সমস্তই চড়া রঙে, উজ্জ্বল আবহে, কেননা সর্বনাশ তো আপাতভাবে রূপবান ও আয়তচক্ষু। এই সূত্রে এই ধরনের লেখকদের যেমন কাফকা বা কামু ও আমাদের সন্দীপনকে শবযাত্রার ধারাভাষ্যকার হিসেবে মনে করি, তবু সন্দীপন আমাদের ভাষার পক্ষে অগ্রণী পুরষ। কেননা তাঁর বর্ণনা—আমি উদাহরণ দিচ্ছি না—কোয়ান্টাম প্রকৃতির; যেখানে সময়ের কোনো দেওয়াল নেই। যেন এক আধুনিক সঞ্জয় উন্মোচন করছেন নশ্বরতার সৌন্দর্য ও আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতিমুখী বিক্রিয়ায়: বর্তমান হচ্ছে তাদের ব্যক্ত অস্তিত্ব। সামান্য কয়েকটি গল্প, হাতে গোনা ক্ষীণ-শরীর উপন্যাস, খানকয়েক আততায়ী পোলেমিকস—সন্দীপনের গ্রন্থতালিকা খুব দীর্ঘ নয়। উপরন্তু একই রচনা আবার বিভিন্ন বইতে আছে। তবু লেখকের প্রতিভার উপস্থিতি তো শুধুই পরিমাণগত নয়। আমরা সহর্ষে আবিষ্কার করি সন্দীপনের হাতে আধুনিকতার আরো দুই হাতিয়ার—অ্যামবিগুইটি ও স্ব-বিরোধ। তাঁর লেখক অস্তিত্ব অত্যন্ত চতুরভাবে হরণ করেছে ভাষার বস্ত্রাবরণী—ক্রমনির্দিষ্ট ও সুচিহ্নিত অর্থ। যার ফলে আমাদের অভিজ্ঞতার প্রান্তরেখা খসে পড়তে থাকে। আমরা দেখি যাকে আমরা নিছক বাক্-বিভূতি ভেবে এসেছি, যে সব উপমারহিত বিশেষণ তাঁকে করে তুলেছে জীবনানন্দের সবচেয়ে বিশ্বস্ত গ্রাহক এবং সেইসব অমোঘ সমাপিকা ক্রিয়া যা উন্মোচন করে স্তব্ধতার কারুশিল্প—এ সমস্তই আধুনিক মনের কাছে শব্দের প্ররোচনা ও প্রত্যাঘাত। এখনই তো সময় ভেবে দেখবার বাখতিন ডায়লজিক ইমাজিনেশ্নে কি উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, অতঃপর উদ্ধৃত অংশটি—

'The word is living conversation, is directly, blantanly orientated towards a future answer word. It provokes an answer, anticipates it and structures itself in the answer's direction.

তাঁর ভাষাধর্ম মাথায় থাকলে মনে হয সন্দীপনই ধার্মিক; আমরা যারা স্থিরলক্ষ্য ও একাগ্র চিত্তে তথ্য বিনিময় করছি তারা বড়োজোর তীর্থের কাক। এ জন্যেই বৃষ্টির শব্দে জেগে ওঠা বা ঘুম ভাঙতে ভাঙতে বৃষ্টির শব্দ যা আসলে ট্যাঙ্কের জল উপছে পড়ার প্রতিস্বর—এ সব আমাদের বেঁচে থাকার অ্যান্টিবায়োটিকস। এই ভাষা, সাংবাদিকী না বিপন্নতাধর্মী—সে তর্ক উহ্য থাক, ব্যাকরণ কৌমুদীর যোজন দূরে ও ডিসকোর্সধর্মী। আধুনিক ভাষাশাস্ত্র যাঁরা আগ্রহ নিয়ে পড়েন তাঁরা এসব নিয়ে নিজেরাই পঞ্চমুখ হতে পারবেন।

ব্যক্তিগতভাবে তাঁর গল্প ও বিতর্কমূলক নিবন্ধ আমার প্রিয়। যেখানে ক্রোধ ও উদ্বেগ। যেখানে তিনি নিজের অবিশ্বাসকেও বিশ্বাস করেন না। প্রামাণ্য নাস্তিক। তবু কখনোও দীর্ঘ মত্ততার অবসান হয়। 'হিরোসিমা, মাই লাভ'-এর মত কোনো উপন্যাস যেখানে মৃত মানুষ জীবিতের ছদ্মবেশ ধারণ করেনি। যে পাখিটির আঙুল দিয়ে গান গাওয়ার কথা ছিল সে যখন উপায়হীন, সারা বুক আঁচড়ে রক্ত ঝরায়, স্বেচ্ছাচারী উন্মার্গগামী সেই ভ্রাতুষ্পুত্র যখন সনাক্ত করে, তখন সন্দীপন পাখিটিকে উড়িয়ে দেন না, বরং নতমুখে অপরাধ স্বীকার করে নেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন বিষণ্ণভাবে শেষ হয়, সন্দীপন তেমনভাবেই প্রবীণ ও বিধুর হয়েছেন হিরোসিমায়। নেই সেই শাহরিক চতুরালি, বিদায় নিয়েছে প্রদর্শনবাদ। একজন বাঙালি পুরুষ যখন দূর সিন্ধুতীরে শবানুগমন করেন আমাদের অস্তিত্ব জুড়ে বেজে ওঠে স্নানশব্দ। মনীষার আমিষ গন্ধ, সময়ের নৃত্যরত

গোড়ালি—বর্ণমালার তত্ত্বাবধানে কি বিরাট অগ্নিশিল্পের আয়োজন! প্রশ্ন থেকে যায় সরলরেখা-প্লট-ন্যারেশনে থমকে থাকা আমাদের মগজের পরিকাঠামো সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের রাতের কড়া নাড়ার ধ্বনি শুনতে পাবে তো?

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের একটি ভূমিকা থেকে উদ্ধার করি, 'আমার আর সব রচনাই আত্মজৈবনিক। শুধু এই একটি ছাড়া। মৃত মানুষদের নিয়ে লিখতে গিয়ে এই প্রথম আমাকে একটি কাল্পনিক উপন্যাস লিখতে হল।' কোন উপন্যাসের কথা বলছেন লেখক? উত্তর হবে 'হিরোসিমা, মাই লাভ'। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে পাঠকেরা নানারকম উদাহরণ ও বর্ণনা সাপেক্ষে বড় হয়ে উঠেছেন। তাঁরা উপন্যাসের আলোচনায় একটু বড় জায়গা আশা করেন, আরও একটু মিশ্র স্বর—নিন্দা বা প্রশংসা, আরো প্রত্যক্ষ এবং জোর গলায়।

হ্যাঁ, আমরা বরং 'হিরোসিমা, মাই লাভ'কে নিয়ে একটু বেশি কথা বলি। এই উপন্যাস সন্দীপনের সাধারণ সজ্জার পথের অন্তর্গত হয়েও গাম্ভীর্যে ধ্রুপদী—পৃথক ও স্পষ্ট একটি ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আছে। আর প্রচ্ছন্ন নয়, মৃত্যু এসে নিশ্বাস ফেলেছে এই উপন্যাসের শিয়রে। প্যারিস সমীপে র‍্যাবো যেমন, নিউইয়র্ক সমীপে লোরকা যেমন, জীবনানন্দের পক্ষে কলকাতা যেমন এক সাতটি তারার তিমির. সন্দীপনের পক্ষে ক্যালিফোর্নিয়া তেমনই আদিঅন্তহীন এক নরক পরিক্রমা! মোটর দুর্ঘটনাজনিত যে আত্মীয় বিয়োগ এই কাহিনীর নায়ক হিরণ চ্যাটার্জিকে প্রাতিস্বিক হলোকস্টের দিকে টেনে নেয়, সেই অভিজ্ঞতাটুকুই সন্দীপনকে প্ররোচিত করে সভ্যতার শোণিতগন্ধী উৎসব উদ্বোধনে। আর সম্ভবত নামকরণে অ্যালাঁ্যা রেনের অতিখ্যাত ছবিটির উল্লেখ সেইজন্যেই। একান্ত ব্যক্তিগত অনুষঙ্গে জারিত বলেই হয়ত এই গ্রন্থের রচয়িতা পরিহাসমদির নন, পরিহার করেছেন যা তাঁর পক্ষে করতলধৃত আমলকি—মেধার সেই বঙ্কিম চিত্রলেখ ও সপ্রতিভতা। এই রচনার শরীরে প্রথম স্তরের বাস্তবতা, অন্তরালবর্তী প্রপাতধ্বনির সম্ভ্রম, অনুপুঙ্খের প্রতি বিপুল আনুগত্য আমাদের বিস্মিত করে। তথ্যচিত্রপ্রণেতা গ্রিয়ার্সন যাকে বলেন, ক্রিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট অফ অ্যাকচুয়ালিটি, তা ছড়িয়ে আছে এ লেখার পরতে পরতে! এমনকি সন্দীপনকে যখন স্বপ্নের অনুগমন করতে দেখি তখনও সে স্বপ্নের কোনো ওষ্ঠ নেই, উচ্চারণ নেই। এই সূত্রে আমরা যদি সন্দীপনকে ধারাভাষ্যকার হিসেবে চিহ্নিতও করি, তথাপি তিনি আমাদের সাহিত্যের পক্ষে একজন অগ্রণী পুরুষ।

একদিকে সাদা গ্রানাইটের প্রাকৃতিক সমাধিফলক—আল কাপিনো, অন্যদিকে নিয়তির মতো অব্যর্থ এক সুরযন্ত্র : অপার এই অক্ষরেখাদ্বয়ের মধ্যে সংক্ষিপ্ত এই উপন্যাস যে কী কারুকার্যময়! ঘটনাস্থল আমেরিকা—এমন এক ভূখণ্ড যেখানে সম্পদের দারিদ্র। আলোর অপেরাতে যে পেট্রোডলারের বিষাদপ্রতিমা ও ঝকঝকে দুপুরেও রোরুদ্যমানিনী। পাত্রপাত্রীরা জীবিতের ছদ্মবেশে মাংসমণ্ডিত কঙ্কাল। হিরণের ভ্রাতৃবধূ, প্রিয়দর্শিনী ককতোর 'অরফি'র সেই নায়িকা নাকি, বদলে হাতছানি দিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে যায় সর্বনাশে বিস্ফোরণে। সঙ্গে থাকে জীয়ন সে অমঙ্গলের এই অকূল সমুদ্রে, শিশু বলেই, একবিন্দু শুদ্ধতা। তার তো সংলাপ নেই; সে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খায়নি; সে পতিত নয়। সন্দীপনের অন্যতম প্রধান সঙ্কট যে তিনি নিজের অবিশ্বাসকেও বিশ্বাস করেন না। কিন্তু 'হিরোসিমা, মাই লাভ' যাঁরা পড়বেন তাঁদের সৌভাগ্য লেখকের অবিশ্বাস এখানে কপটতা করে পথভ্রষ্ট হয়নি; নিজেকে বিশ্বাস করেছে। 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' উপন্যাসের শেষদিকে যেমন একটি খুনী ও জনৈকা বেশ্যা লাজারাস পঠনে মনোযোগী, এই লেখা শেষদিকে সেভাবেই হাতরাখে ইতিহাসের জ্বরতপ্ত ললাটে। ভুলের থেকে,

পাপের থেকে, অন্ধ দুর্দশার থেকে পুনরুত্থানের সম্ভাবনা চেতনায় রয়ে গেছে তাহলে। বৃষ্টিশেষের কনে দেখা আলো ছড়িয়ে পড়ে হিরোসিমার ধ্বংসস্থলে। তুলনামূলক সমালোচনায় স্মরণ করা যেতেই পারে টমাস মান-এর 'ম্যাজিক মাউন্টেন' বা কমলকুমার মজুমদারের 'গোলাপ সুন্দরী' প্রসঙ্গ। সে বিষয়ে মুখর না হয়েও আমার বরং বিনীতভাবে মনে হয় যেমন ছিলেন বোদলেয়ার যুগপৎ হিন্দু ও ইয়াঙ্কি, হিরোসিমার মনোপ্রবণতাও তেমন দ্বান্দ্বিক অর্থাৎ বিপরীতের সমন্বয়ধর্মী। সন্দীপন এখানে যুগপৎ আক্রমণকারী ও আক্রান্ত, ঘাতক ও শহিদ, হিংস্র ও স্নেহপরায়ণ, বিচারক ও দণ্ডিত।

আসলে গদ্যশিল্পীর বিপর্যয়ের সঞ্চারপথ এই লেখক পরীক্ষা করেছেন আজীবন। চোখে দেখা যায় এমন বাস্তবের উপরিতল আঁচড়ে দেওয়ার ছলনাকে তিনি আমন্ত্রণ জানাননি। আমরা কি লক্ষ্য করিনি শব্দের প্রতিমা থেকে ভাষার ভাস্কর্যে উত্তীর্ণ হতে হতে লেখক উপেক্ষা করতে চাইছিলেন সাংবাদিকতার মুখোশে প্রতিচিত্রণের আকাঙ্ক্ষা? ঘটনার কুচকাওয়াজ থেকে গেলে যা পড়ে থাকে তা সময়ের জঞ্জাল। আর প্রকৃত লেখক তো সময় শাসন করেন। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন তথ্য বস্তুগতভাবে অস্তিত্ববান মাত্র, সত্য তার মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী এক গোপন সুরঙ্গপথ যা আপেক্ষিকভাবে লেখকের নির্দেশে আলোকিত হয়। অর্থাৎ বলতে চাইছি ইতিহাস কোনো উত্তরাধিকার প্রাপ্তি নয়, তথ্য সমাহার নয়, বরং তাকে নীতির ভিত্তিতে নির্মাণ করে নিতে হয়। সন্দীপনের উপকরণ যদি অস্তিত্বের ব্যাধি না হয়ে তুচ্ছ গোয়েন্দা বৃত্তান্তও হয় তবেও তার অভিযান ন্যাচারালিস্টিক অবরোহণের বদলে আরোহী বাস্তবতার প্রতি। এরকম একটি অপ্রধান রচনা—'এসো, নীপবনে'।

ছোট এই থ্রিলারটি বস্তুত ক্রনিকল অফ এ মার্ডার ফোরটোল্ড। ছোট এই আখ্যায়িকায় যে বাক্‌পটীয়সী নিয়তির পাশে পাশে রহস্যশূন্যভাবে হেঁটে চলে, সে লেখকের পাথেয়। কিন্তু আমাদের পক্ষে অতি পরিচিত। এ সেই মর-সুন্দরী যার নিবিড় কেশদাম এক আতঙ্কের সূচনা যা আমাদের পক্ষে আদৌ প্রীতিকর নয়, মাত্রই সহনীয়। নখদন্তময়ী ওই স্ত্রীলোক, তার তিমিরলিপ্ত অকুস্থল, তার তীব্র ওষ্ঠে যে প্রাচীর যা ভালবাসার দ্বারা অতিক্রমনীয় নয়—এ সবই আধুনিকতার মর্মন্তুদ দলিলচিত্র। যেমন চলচ্চিত্রের দৃশ্যবিন্যাস, সন্দীপনের বাকরীতি অত্যন্ত প্রখরভাবে মনে রাখে যে তারা ঘটমান বর্তমানের অংশ। দার্শনিক প্রচ্ছদটুকু ছিঁড়ে ফেলে জাক দেরিদা যাকে বিদ্যমানতার অধিবিদ্যা বলেন; যা অন্তত প্রতীচ্যের প্রধান মননাশ্রয়, তা চলচ্ছবির সবচেয়ে কাছাকাছি বলেই পশ্চিমী গণজ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় চলমান চিত্রমালা—নির্বিকল্প সমাধি। আমরা তো বলেইছি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়-এর লেখার ক্রিয়াপদ শুধুই ঘটমান বর্তমান। আমাদের পাঠক দয়া করে আরও লক্ষ্য করুন যে রহস্যকাহিনীর মোড়কে 'এসো, নীপবনে' যে এপিসোডিক উপস্থাপনার আশ্রয় নিয়েছে তা সাহিত্যের বদলে বরং চলচ্ছবির কথকতার কথা ভাবায়, যেখানে ল্যাটারাল ট্র্যাকিং ভূমিকার গভীরতা নষ্ট করে সমতলীয় ইমেজের প্রবর্তন করেছে।

যে সপ্রতিভতা সন্দীপনের কবচকুণ্ডল তা নিজেকে ও পাঠককে কুয়াশা থেকে স্বচ্ছতার দিকে পরিত্রাণহীন যাত্রার প্রতি প্রলুব্ধ করে। তাই একটি থ্রিলারের খোলসে সিনেমার অভিজ্ঞতা জুড়ে দেন লেখক; শুধু সাম্প্রতিকের স্পর্শক হবেন বলেই নয়, বরং এই সাম্প্রতিকতার স্বাক্ষর তাকে অবস্থান বুঝে নিতে সাহায্য করবে বলে। আমি পাঠককে একটু খুঁটিযে দেখতে বলি সেখানে বিশুদ্ধ 'গোদারীয়' রীতিতে লেখক জানান 'এ তো সেই সপ্তপদীর মোটর গাড়ির সিকোয়েন্স হয়ে যাচ্ছে'—সিনেমা থেকে জীবন এবং জীবন

থেকে সিনেমার আন্তর্সম্পর্কটুকু পরীক্ষা করার প্রয়োজনে কামিল ও গ্রেটা গার্বোর দ্বারস্থ হওয়া এবং অপর বাস্তবতার পরিধি নির্মাণ করে দিতে গিয়ে স্পষ্ট তীব্র অথচ অব্যর্থ সঙ্কেতবাক্য উপহার দেওয়া প্রসঙ্গে সন্দীপন আমাদের কাছে একজন সফল ও আধুনিক হয়ে ওঠেন এইভাবে যে বাস্তবতার ছাঁচটি তিনি শিল্পের মাত্রা দিয়ে পুনর্বিন্যাস করেন।

'ঠিক জিনিস ঠিক সময়ে মনে পড়ে শুধু উপন্যাসে। বাস্তবে, এ-রকম সময় মন শরীর ছেড়ে পালায়। কিন্তু আমার নির্ভুলভাবে মনে পড়ল, গত ফিল্ম-ফেস্টিভ্যালে লোকেশের সঙ্গেই দেখা ডাচ ফিল্মের (দ্য ম্যাজিক মাউন্টেন) কথা যার একটি দৃশ্যে তিন-চারদিন ধরে বরফচাপা এক মধ্যবয়সিনী মৃতের মুখে দেখা দিয়েছে পচনজনিত বিক্রিয়ার কারণেই জীবিতের মুখে দেখা দিলে যাকে বলা হয় স্বর্গীয়—সেই ভয়াবহ হাসি।' এই উদ্ধৃত অংশে যে বিরোধাভাষ সেখানে অসম্ভব বেদনার সঙ্গে সঙ্গে অমোঘ আমোদ মিশে আছে কিনা তা আধুনিকতার অন্যরকম তর্ক, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ হচ্ছে বাস্তববাদ বিষয়ে সন্দীপনের নিজস্ব পরিহাস। অথবা আমাদের তথাকথিত মৌলিক জ্ঞান যেখানে দৃষ্টান্ত, তুলনা ও উপমার মুখ হতে হতে মুখোশ; মুখের রগড়টুকু আর মনেই রাখে না। যা আমরা দেখি বা ভাবি তা অধীত বিদ্যার প্রয়োগ কিনা—আমাদের সব জ্ঞানে ব্যাখ্যার নিয়ম আছে এবং অনেক সমকালীন শিল্পই তার অনুপুঙ্খ বিবরণ এবং একই সঙ্গে সংস্কৃতির মাত্রামোচন। সন্দীপন সে ঐতিহ্যের অনুসরণে এমন এক শাহরিক মেধার অংশীদার যা জীবনের ক্ষেত্রে অভিভূত চাষার ভূমিকায় আর খাপ খায় না মোটেই। আমাদের আলোচ্য রচয়িতা তাঁর নিজস্ব উচ্চারণের অভিব্যক্তির প্রতিবিম্বটিকে ধরতে চান। এবং আমি বলতে চাই, তাঁর সৃষ্টিতে উক্ত প্রতিবিম্বই প্রধান অক্ষরেখাটি তৈরি করে। 'ডন কিহোতে' থেকে 'দ্য ফল'—সবই এই প্রতিফলনশীলতার ইতিবৃত্ত। সুতরাং আপাতত গোয়েন্দা কাহিনীর বুনট, রুদ্ধশ্বাস অগ্রগতি, রহস্য উন্মোচন প্রক্রিয়ার পর্যাপ্ত সম্ভার—এ সমস্তই প্রয়োজনীয় ভান; সন্দীপনের এই রচনা মোটেই তদন্ত কাহিনী নয় বরং তদন্ত কাহিনী বিষয়ে তদন্ত। সন্দীপন এখানে যে দুটি ছলনাকে মূল প্যারামিটার মনে করেন, তা হল—

(ক) যুক্তি-বুদ্ধি, বিচার ও বিশ্লেষণ, অনুমান এবং অনুসন্ধান—যে কোনো গোয়েন্দার এটাই স্বাভাবিক বিচরণভূমি।

(খ) কারণ, এটা একটা খুন যা আমরা করছি, সাক্ষ্য-প্রমাণ রাখা যাবে না।

কিন্তু যখন আমরা আখ্যায়িকার ভেতরে প্রবেশ করি তখন দেখি ইতিমধ্যেই প্রতিস্থাপিত হয়েছে রহস্য উপন্যাসের মূল্যমান। দুটি খুন যথাসময়ে আমাদের নজরে আসে, যা আসে না তা রক্তের দাগ। সন্দীপন অত্যন্ত প্রযত্নে পরিহার করেছেন নূন্যতম শিহরণ। এখানে আমরা গোয়েন্দার নয়, ঘাতকের সহযাত্রী, লেখকের কাহিনী অত্যন্ত সামান্য, এবং ভেবে দেখলে সোমনাথের আত্মহত্যা, রবীন্দ্রনাথের গান, অশ্রু ইত্যাদির সহাবস্থান মেলোড্রামাকে দূরে থাকতে বলেনি। যথাসাধ্য বোঝানোর চেষ্টা আছে গোয়েন্দার বুদ্ধিতে নয়, অপরাধীর নিজ দায়িত্বে, যদি চিত্তশুদ্ধি তার নাও হয়, এই নাট্যের যবনিকা। প্রথম পর্যায়ের জঁ লুক গোদারের মতই সন্দীপন স্ত্রীলোকের ঘাস, বাণিজ্যিক কথনবৃত্তের উপকরণ এমনকি ক্লিশে (যেমন উমেশবাবুকে ঠাট্টা) কোনো কিছুই বাদ দেননি। কিন্তু যেখানে এই আখ্যানের মর্মবস্তু তা হয়তো উমবার্তো একোর ভাষায় 'এলিমেন্ট অফ ফোর গন প্লে'। একো ইয়ান ফ্লেমিং-এর থ্রিলারের অবসরটিকে পাঁচভাগে ভাগ করেছিলেন। একটু বড় করে যদি আমরা আলোচনা করি তবে দেখতে পাব সন্দীপন কি আকুল আগ্রহে রহস্যোপন্যাসের বাণিজ্যিক ধর্মগুলিকে জড়িয়ে ধরেছেন। আমরা মার্কিন কথনবৃত্তের

সঙ্গে তার অন্তিম chase পর্যায়ের মিল খুঁজে পাব—সেই একই রকম রুদ্ধশ্বাস কাটিং। জেমস বন্ডের ভিলেন যেভাবে স্বর্ণকেশিনী বা নীরাবরণা নায়িকার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। বিখ্যাত ল্যান্ডস্কেপ ও উপমারহিত কল্লোল-উচ্ছ্বাসে সেভাবেই কন্যাকুমারীতে রাত্রি এসে দিনের পারাবারে মেশার সময় পিস্তলের চকিত ভাস্কর্য উৎকীর্ণ হয়ে থাকে সন্ধ্যার শিলাপটে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের নায়ক বেঁচে থাকে ডেঞ্জারসলি টু দি এন্ড। এবার আমি বক্তব্যের চুম্বক নিবেদন করি। নির্মনন প্রতিরূপায়ণে নয় অর্থাৎ এই যাবতীয় ক্রীড়াকৌশল ও সমগ্র আখ্যায়িকাটিকে একটি প্রণালীবদ্ধ 'গেম' প্রমাণ করার মধ্যে আমি সন্দীপনের উল্লেখযোগ্যতা লিপিবদ্ধ করতে চাই না। উল্টোদিকে বলতে চাই সন্দীপনের চাতুর্য ও গৃহিনীপনা স্বতঃপ্রমাণিত। কিন্তু 'এসো, নীপবনে' যে জন্য আমাদের মনোযোগ দাবি করে তাহল, গোদারের 'ব্রেথলেস'-এর মতই, এই তথাকথিত থ্রিলারটির অন্তরালে ও ফাঁক-ফোঁকরে উঁকি দেয় সমালোচনা প্রবৃত্তির ডালপালা—এক অতরিজম : সন্দীপনের শিলমোহর।

'এসো, নীপবনে' একটি জ্ঞাত ভবিতব্যের দিকে যাত্রা। কিন্তু আরও বেশিভাবে, পরিকল্পিতভাবে, থ্রিলার জাতীয় রচনা বিষয়ক একটি ডিসকোর্স। সন্দীপন লিখনরীতি প্রসঙ্গে একটি গুরু সন্দর্ভের অবতারণা করেছেন। এরকম তিনি ইতিপূর্বে করেছিলেন প্রেম, মৃত্যু বা যৌনতা বিষয়ে। সন্দীপন এখানে দারোগা উমেশ সামন্ত-এর সূত্রে কাব্যময় সংলাপ লেখেন ও যুগপৎ সেই বাগ্মিতার সমাধিলিপিও নির্মাণ করে যান। জীবনের বৈপরীত্য যেমন মৃত্যু; দিনের যেমন রাত্রি, 'এসো, নীপবনে' তেমনই এক ভয়াবহ আমন্ত্রণ, যেখানে কবরের মত গভীর বাসরশয়নে অপেক্ষা করে আছে ফ্যাশনমডেল : আমাদের কাহিনীবিন্যাস। বিপণননিয়ন্ত্রিত চিহ্নায়নের পদ্ধতি আজকাল সন্দীপনকে মাঝে মাঝেই বিপন্ন করে। কিন্তু সমালোচনাশীলতা বা আরও যুক্তিযুক্ত হবে যদি বলি অটোক্রিটিক এসে শেষপর্যন্ত তার হাত ধরে, অধঃপাত থেকে ফিরিয়ে আনে তাকে। 'এসো, নীপবনে' সন্দীপনের প্ররোচনায় বাস্তবতার হাঁ-মুখ দেখায় আর সেইজন্যেই বোধহয় আবার এড়িয়ে যেতে পারে বাস্তবতার অবরোহী চক্রান্ত।

এবার বোধহয় পাঠককে জানানো উচিত, অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে বলা উচিত, সন্দীপন প্রসঙ্গে আমার নিরপেক্ষ অবস্থান নেই। কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই সাহিত্যের আড্ডায় তাঁর সোনালি উপস্থিতি ও বাকচাতুর্য আমার মন মজায়নি। তাঁর পোলেমিকস-প্রীতি অথবা স্টাইলাইজড বাক্য বিন্যাসের জন্যই শুধু আমি বলতে চাই না যে তিনি আমাদের সম্প্রসারিত করেন। বরং এই জন্যেই যে এই লেখক আমাদের পক্ষে সংস্কৃতির এমন একটি পরিসর যেখানে সাহিত্য অন্তগর্ত ও সাহিত্য বহির্ভূত অনেক জলধারা সক্রিয়। কোনো সন্দেহ নেই, বঙ্কিমবাবুর মেধাবী নির্মাণ এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ও মানিকবাবুর মত কয়েকটি উদাহরণ বাদ দিলে বাংলা গদ্য প্রায় দপ্তরীর ভাষা। তাতে বাস্তবতার সিরিয়াল, আয়ব্যয়ের তালিকা এবং প্রেমপত্র লেখা যায় কিন্তু ইতিহাসের চিহ্নায়ন সম্ভব হয় না। মনে রাখতে হবে 'বিজনের রক্তমাংস' লেখার সময়ে সন্দীপন জীবনানন্দের গদ্যভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। একদা আমাদের মনে হত সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় তো এমন একজন যিনি গোদারের সিনেমার থেকে গল্পের শিরোনাম আত্মসাৎ করেন, কি না বলে হাতিয়ে নেন বিখ্যাত জার্মান লেখকের রচনাংশ। তারও পরে আমরা বুঝেছি, হয়ত রোলাঁ বার্ত প্রমুখ মহাজনের পরামর্শে, যে বয়ান কিভাবে উন্মুক্ত ও সর্বাগ্রাসী হয়ে উঠতে পারে।

কাজেই সন্দীপন যে নামেই আশা নামের পরিচারিকাকে কামনা করুন, আমাদের কিছু

যায় আসেনা। আমার আপত্তি এই কামনাও ক্রমশ বাণিজ্যবায়ুর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে বলে। বিজন সন্দেহ করেছিল নিজের আন্তরিকতাকে; সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে ঠিক করে নিতে হবে পেশাদার অবিশ্বাসীর ভূমিকা আর কতদিন তাঁকে মানাবে। আমার ক্লান্ত লাগে সন্দীপন যৌনতাকেও পরিবেশনযোগ্য মনে করেন বলে। বাস্তবিক কোনো আধুনিক লেখকের অন্বিষ্ট কি রতিমুখরতার সময়ে শরীরের ব্যবধান স্পষ্ট করে দেওয়া নয়? যেভাবে নির্বিকল্প শূন্যতা রাজত্ব করে দালির পটে বা আন্তোনিওনির সিনেমায়। আমি দুঃখ পাই যে মুহূর্তের কোনো স্মৃতি নেই। সন্দীপন হয়তো চান, আন্তরিকভাবেই চান, লেখাকে পলিফোনিক করতে; নির্ভার ও স্বয়ম্ভর করতে চান; লেখাকে লেখকের শাসনমুক্ত করতে চান। কিন্তু নিরুপায় হয়ে আমরা লক্ষ্য করে চলেছি তিনি ডুবতেও চান স্বখাত সলিলেই। আয়নায় তিনি নিজের মুখই দেখতে চান। তাঁর প্রতিটি কমা ও যে কোনো দাঁড়ি থেকে উঁকি দেয় অভ্রান্তভাবে একজন বিদ্রূপমদির বুদ্ধিজীবী যিনি নিজেকে নিয়েই ব্যাকুল ও কেন্দ্রাভিমুখী। একটা সময় আসে যখন সিদ্ধার্থকেও স্বর্গে পৌঁছবার লোভ ভুলে যেতে হয়। আকাদেমির মরণোত্তর সদস্য জীবনানন্দ দাশ আধুনিক উত্তরপুরুষের জন্য কি যে হাততালি ছড়িয়ে দিলেন! আমি নিশ্চিন্ত নয় সমিতিবদ্ধ অরাজকতা, সংস্থাস্বীকৃত বিদ্রোহ-বন্দনা, সম্বর্ধনা ও পানপাত্র সরিয়ে রেখে 'সোমেন পালিতের বৈবাহিক'-এর সঙ্গে সন্দেহজনক কথাবার্তা সন্দীপনের পক্ষে আর আদৌ সম্ভব কিনা। যদি হয়, সমর্থনের হাত তোলা থাকবে।

পঞ্চাশের দশকের কথাকার। সম্পাদনা: উজ্জ্বলকুমার মজুমদার
পুস্তক বিপণি, বইমেলা, ১৯৯৮

সূ চি প ত্র

গ্রন্থায়িত গল্প

অগ্রন্থায়িত গল্প

ছোটদের গল্প

ছেলেটা

হ্যাঁরে, তোর বাবা মা আছে?
না।
দুজনেই মারা গেছে?
হ্যাঁ।
বোনটোন?
না।
তুই একা?
হ্যাঁ।

নিস্তব্ধতা

কী করিস?
ভিক্ষা।
রোজ কত পাস?
কুড়ি পয়সা! তিরিশ পয়সা!
এতেই চলে যায়?
হ্যাঁ।
কী খাস?
মুড়িটুড়ি খাই।

নিস্তব্ধতা

আজ কত পেয়েছিস?
আজ ভিক্ষা করিনি!
কেন?
আজ ভাল লাগল না।
শরীর খারাপ?
না।

নিস্তব্ধতা

এই চেনটেন লাগানো জামাটা কিনেছিস?
না।
কেউ দিয়েছে?
না।
কোথায় পেলি?
কুড়িয়ে পেয়েছি।
কোথা থেকে?
নর্দমা থেকে।
ও।

নিস্তব্ধতা

ইজেরটা?
এটা মা দিয়েছিল।

নিস্তব্ধতা

তোর মাকে মরতে দেখেছিলি?
হ্যাঁ।
কী হয়েছিল?
অসুখ করেছিল।
কোথায় মরে গেল?
ওই যে। ওইখানটায়।
তোর মা-র নাম কি?
গৌরী।
বাবার নাম?
সর্যুপ্রসাদ সিং।
বাবাকে দেখেছিস?
না।
মা নাম বলে গিয়েছিল?
হ্যাঁ।
কতদিন আগে মারা গেছে?
অনেকদিন।
কত বছর?
অনেকদিন।
তোর বয়স কত? সাত?
অনেকদিন।

নিস্তব্ধতা

তোর কোনও অসুখ আছে?
না।
কোনও কষ্ট হয়?
না।
ঘুম হয়?
হ্যাঁ।

কোথায় শুস?
এইখানে।
ন্যাকড়াটা পেতে?
হ্যাঁ।
বৃষ্টি হলে?
হব্‌বে!
স্বপ্ন দেখিস?
হ্যাঁ।
মনে আছে?
না।
মাকে স্বপ্ন দেখিসনি?
একবার দেখেছিলুম।
মনে আছে?
না।
তোর পায়খানা কী-রকম হয়?
ন্যাড় হয়।

নিস্তব্ধতা

জ্যোতি বসুর নাম শুনেছিস?
না।
ইন্দিরা গান্ধী?
না।
শক্তি চট্টোপাধ্যায়?
না।
উত্তমকুমার?
উত্তমকুমারকে চিনি না।
কখনও সিনেমা দেখিসনি?
না।
সূর্য কোনদিকে ওঠে?
এইদিকে! ওই দিকে! সেইদিকে!
তোর দেশের নাম জানিস?
দেশ?
এই যে, যে দেশের মাটিতে এখন বসে আছিস?
বিটি রোড

নিস্তব্ধতা

তোর ভয় করে না?
না।
কাউকে ভয় করে না?
পুলিসকে ভয় করে।
আজ ভিক্ষে করিসনি, কী খেলি?
ওই দই-এর হাঁড়িটা।
দোকান থেকে ফেলে দিল?
হ্যাঁ।
গায়ে যা লেগে ছিল?
হ্যাঁ।

নিস্তব্ধতা

ওই কুকুরটাকে চিনিস?
হ্যাঁ। ও ত আমার কুকুর!
তোর কুকুর?
আমার মা ওকে মানুষ করেছে।
ওর নাম কী?
রোবি। এই রোবি...উস্‌স্‌। উস্‌স্‌।

নিস্তব্ধতা

তোকে প্রথমে কী কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম?
তোর বাপ-মা আছে?
তোর একটা চোখ লাল আর মস্ত বড়, তুই জানিস?
না ত।
আয়না দেখিস না?
অনেকদিন আগে দেখেছিলুম।
নিস্তব্ধতা
তোর নাম কী?
গণেশ।

রচনা : ১৯৭৫
চারজন টারজন : মিনিবুক-১১
১৯৮০

কালিম্পঙের স্মৃতি

কালিম্পঙের কথা এত শুনেছি, কিন্তু কেউ আমাকে কখনো কেন বলেনি যে এই একটা, একমাত্র শহর যেখানে যেতে গেলে ডান দিকে, শিলিগুড়ি থেকে ৩৫ মাইল জুড়ে, এবং ২০০, ৫০০ কখনো দুই কি চার হাজার ফিট নিচে, যখন যা, সারাটা পথ জুড়ে একটা গর্জনকারী নদী আমাদের বিপরীত দিকে একরোখা বয়ে যাবে, যার নাম তিস্তা? এবার টুরিস্ট অফিস থেকে যে সব চটি বইপত্র বাবা এনেছিলেন, তাতে দূরবীন পাহাড়, অর্কিড হাউস, লাভা, লোলেগাঁও, বৌদ্ধ গুম্ফা—সবই ছিল, শুধু এই নদীটির কথা ছিল না। মা বেঁচে থাকতে আমরা তিনজনে যথেষ্ট ঘুরেছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি যখন মার পেটে, মাত্র মাস তিনেকের, সবে প্লাসেন্টা ফর্ম করেছে আর কি, ঘোরাঘুরির তখন থেকেই শুরু। তখনই আমরা নাকি তাকদায়। তাকদা? কেউ কেউ বলতে পারেন, তাকদায় কেন, দার্জিলিং ত কাছেই। কেন দার্জিলিং নয়? যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন। আসলে, ট্যুরিস্ট ব্যুরোর কাগজে বিজ্ঞাপনে থাকে এমন জায়গায়, যেমন পুরীটুরি, বাবা আমাদের কখনো নিয়ে যায়নি। বাবা ছোট ছোট কাগজের ওপর সাইক্লো-করা যত রাজ্যের ম্যাপট্যাপ জোগাড় করে আনতেন, অধিকাংশই ছেঁড়াফোঁড়া। রানীক্ষেতে না থেকে আমরা তাই থেকেছি ৩০-৩৫ মাইল দূরে জনহীন বিনসরে, দেরাদুন থেকে যাবার কথা ছিল মুসৌরী, গেলাম চাকরাতায়। তখন সন্ধেবেলা। কেউ কোত্থাও নেই। ভাগ্যিস স্টেশন মাস্টার ছিলেন বাঙালি, উমেশবাবু, কী দুর্দশাই হত তা না হলে!

রানীক্ষেত্রে গিয়ে কচুপোড়া হোগা কেয়া? ফুটপাতে কেনা বই-এর ধুলো ঝেড়ে, হিন্দি ছেড়ে বীরভূমী ডায়ালেক্ট নকল করার চেষ্টা করে বাবা দেখাতেন, 'দ্যাখো ক্যানে, এই সাহেবটা কী বলছে। সাহেবটো বলছো কি, 'বিনসর ইজ দ্য কোয়ায়েটেস্ট প্লেস ইন দা ওয়ার্ল্ড—আই হ্যাভ সিন।'

'থাকব কোথায়?' মা জানতে চাইছেন প্রশ্রয়ের হাসি হেসে।

'থাক্যি ত ইখানে। থাকবই না বুলেই ত হুইখানডায় যাচ্ছি গ।'

তাই পুরী নয়, আমরা থেকেছি কাঁকিনাড়া থেকে অদূরে, গোদাবরি মোহনায়, কুমারী সমুদ্রবিচে। নাম নরসিংপুরম।

ডাক্তার হয়েও বাবা যে বরাবর হুড-খোলা পুরু সোলের চপ্পল পরেন এর মধ্যেও তাঁর একটি চরিত্র-সূত্র পাওয়া যাবে। চেয়ারে বসে কোমর ভেঙে ওই সব ফিতে-টিতে বাঁধার মধ্যে আমার বাপি কোনওদিন নেই। বাবা বলতেন, 'আধা মাঘে, কম্বল কাঁধে।' বেড়াবার জন্যে ওঁর ফেভারিট ঋতু ছিল বসন্ত। চপ্পল গলাও আর বেরিয়ে পড়ো। তা সে 'কল'-এই হোক বা ট্রেন ধরার জন্যেই হোক।

'যখন কলেজে ঢুকি তখন তো চপ্পলও ছিল না রে। পায়ের চেটোয় পুরু করে লাগানো থাকত সর্ষে, 'এই এমনি করে বেরিয়ে পড়তুম।' বলে বাবা যখন মেঝেয় দুবার পা ঘষে দেখাতেন, তখন মনে হত ঢালু বরফ-উপত্যাকার মাথায় বুঝি দাঁড়িয়ে একজন একা মানুষ, যার পায়ে স্কী। চুলে বরফ।

স্কুলে আমি কখনো ভাল রেজাল্ট করতে পারি নি, সে ওই বাপির জন্যে। বাঁ হাতে আমাকে, আর ডান হাতে মাকে ঝুলিয়ে ওই 'অমনি' করে বারবার বেরিয়ে পড়ার জন্যে। মাত্র সপ্তাহখানেকও বাকি নেই এমন অসময়ে, বেড়িয়ে ফিরে, কতবার পরীক্ষার দিকে

ছুঁড়ে দিয়ে আমাকে বলেছেন—'যাঃ!'

এদিক থেকে কালিম্পঙের মতো খোদ ট্যুরিস্ট শহরে বাবার সঙ্গে এই প্রথম। এই প্রথম মা সঙ্গে নেই। মা মারা যাবার পর একটানা আট বছর চুপচাপ। তারপর এই প্রথম এ রকম।

গত আট বছরে অবশ্য বাবা অনেক পালটে গেছেন। আমার সেই বাপি আর নেই যাকে ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় বাথরুম থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে হাসতে হাসতে আমি নাকি বলেছিলাম, 'বাপ্পি, আমার হিসির সঙ্গে রক্ত বেরুচ্ছে।' অত তাড়াতাড়ি হবে মা হয়ত ভাবতেও পারেননি, তাই তখনও ও বিষয়ে কিছু বলেননি। আর আমি যে কিছুই জানতাম না, সে ত বোঝাই যাচ্ছে, নইলে গলা জড়িয়ে ধরে ও কথা কেউ নিজের বাবাকে বলে, না কখনো বলেছে। এখানে 'নিজের' লিখে খুব ভাল লাগল। জীবনে ওই একটি জিনিস, যা ছিল আমার নিজের। আমার বাবা। বাপ্পি!

শুনে বাবা নাকি হো হো করে হেসে উঠেছিলেন। আমার বয়কাট চুল একটু নাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'ও কিছু না, যাও গিয়ে মাকে বলো।'

মা নয়, মাসি নয়, এ সবই আমার বাবার কাছে শোনা। আমি পরে ভেবেছি, কিছুই যদি জানতাম না, তবে হাসতে হাসতে ও কথা বাবাকেই বলেছিলাম কেন। কত প্রিকসাস চাইল্ড ছিলাম, অত ছোটবেলাতেই, আজ বুঝতে পারি।

মা মারা যাবার পর, পিরিয়ডের গড়িমসির ব্যাপারে যদিও বাবার সঙ্গে এখনো ডিসকাস করতে হয় নি, তবে ওই সময় অ্যানাসিন না থাকলে বাবার কাছেই আজও চেয়ে নিয়ে থাকি, বা চাইতে লজ্জা হয় না। 'আজ পায়খানা কেমন হয়েছে'—এর উত্তর এই ধেড়ে বয়সেও বাবাকে দিতে হয়।

এখানে 'পায়খানা' শব্দটি ব্যবহার করতে একটু লজ্জাই হল আমার। যদিও আমার বাবামায়ের প্রণয়পর্বের সূচনায় এই শব্দটির ছিল অত্যন্ত প্রধান ভূমিকা, প্রায় ম্যাচমেকার-এর। হয়েছিল কি, এম-ডি হয়ে বেরুবার পরে-পরেই, একদিন আউট-ডোরে বাবা মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। স্ট্রোকই, কিন্তু মাথায় আর অত অল্প বয়সে। জ্ঞান হল নিজেরই হাসপাতালে, লিউকিস ওয়ার্ডের কেবিনে। বাঁ হাত আর বাঁ পায়ে পার্শিয়াল প্যারালিসিস। একজন ট্রেনি নার্স গায়ত্রী চক্রবর্তী প্রথম দিন সকালে বাবার বেডের সামনে এসে দাঁড়ায় আর বেড থেকে টিকিটটা খুলে কলম হাতে রুটিন মাফিক জানতে চায়, 'ডাঃ সোম, রাতে ঘুম হয়েছিল?'

বাবা (মুখে থার্মোমিটার)—'আঁ।'

তারপর অনেকগুলো রুটিন প্রশ্ন। এবং সবশেষে....

'ডাঃ সোম?'

'আঁ।'

'পায়খানা হয়েছিল?'

উত্তর নেই।

'ডাঃ সোম?'

'আঁ।'

'পায়খানা হয়েছিল?'

তিন-তিনবার আমার বাবা এই প্রশ্নের উত্তর দেননি। তিনদিন দেননি। তারপর আর মা কোনদিন ওই প্রশ্ন করেননি। বাবার মতে কোনও সুন্দরী যুবতীর মুখে ওই প্রশ্ন মানায় না। কোন নারীকে ও রকম প্রশ্নের উত্তর জানানো পুরুষোচিত নয়।

বাবা-মায়ের বিয়ের গল্পটাও এখানেই বলে নিই। আমার বাবা-মার আসল বিয়ে হয়েছিল লিউকিস ওয়ার্ডে ওই ২১৬ নম্বর কেবিনে। হয়েছিল কী, সন্ধেবেলা মা আর একদিন এসেছেন বাবাকে ইনজেকশন দিতে, তখন মায়ের ট্রেনিং পিরিয়ড চলছে আগেই বলেছি, বয়স বছর ২০, আর বাবার কতই বা ৩০-৩১ হবে। দুজনেরই কম বয়স হলেও অবশ্য ব্যবধান অনেকটাই।

ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন, কিন্তু কী কাণ্ড! মা ঢুকিয়ে দিয়েছেন সিধে বাবার মাস্‌ল-এ। হেন অবিমৃশ্যকারিতা একজন এম-ডি'র পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়নি। নিড্‌ল-এ রক্ত দেখে মা তাড়াতাড়ি 'ওমমা' বলে সিরিঞ্জ তুলে নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে 'ইউ বিচ, ইউ ডু নট নো হাউ টু পুস এ নিড্‌ল ইনটু দা ভেইন?' এই বলে বাবা নার্স গায়ত্রী চক্রবর্তীর গালে সপাটে একটি থাপ্পড় মারেন।

এই গল্পটা কিন্তু মা-ই আমাকে বলেছিলেন। অত স্বামী-গরবিনী তাঁকে আর কখনো দেখিনি যখন মুসৌরির পথে, ট্রেনে, মা তাঁর এই 'আসল' বিয়ের গল্পটি আমাকে বলেন। না না, মুসৌরি তো নয়, চাকরাতা। মুসৌরি আমরা কখনো যাইনি।

বেডের পাশে দাঁড়িয়ে মা কাঁপছেন থরথর করে, থাপ্পড়ে লাল গাল বেয়ে গড়িয়ে আসছে অশ্রু, কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে মুখময় ফুটে রয়েছে একরাশ বিস্ময়—এই দৃশ্য কল্পনা করতে আমার কখনো অসুবিধা হয় না। অবিশ্বাস্যকে স্বচক্ষে দেখে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়ে ঠিক যেমনটা হবার কথা আর কি।

অবাক কেন, হতবুদ্ধিকর ব্যাপারই তো। আসলে বাবা চড় মেরেছেন বাঁ হাত দিয়ে আর বাঁ-দিকটাতেই তো হয়েছিল প্যারালিসিস। বিজ্ঞানে যার ব্যাখ্যা নেই, সেই অবিশ্বাস্যকে চোখের সামনে ঘটতে দেখে মানুষ অবাক হবে না? মা তাই কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, 'ডাঃ সোম, এবার আপনি বাঁ পা তুলে আমাকে একটা লাথি মারুন।'

বলা বাহুল্য, লাথি আর মারতে হয়নি। সাতদিন ধরে ওষুধ ইনজেকশনের গুণেই হোক বা মার ওপর এই ফেটে-পড়া রাগের চোটেই হোক, বাবার বাঁ পা-টিও তখন রোগমুক্ত।

২ মার্চ ১৯৬২। ১৮ ফাল্গুন। তখন সন্ধেবেলা। মাসল থেকে ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আসা বাবার রক্তে মা-র অ্যাপ্রন বেশ খানিকটা ভিজে গেছে। মেডিকেল কলেজের লিউকিস ওয়ার্ডের ২১৬ নং কেবিনে সেদিন গোধূলি লগ্নে বাবার নগ্ন হাতে মায়ের নগ্ন হাত। যেন একটা নগ্ন হাতের ওপর আর একটা নগ্ন হাত—তাই না? আর...সত্যিই যেন রবি ঠাকুরের পদ্যের সেই 'রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা'-তাই না? একে বিয়ে বলব না ত কাকে বলব। অবশ্য পরে রেজিষ্ট্রি হয়। নইলে আর আমি বৈধ হলাম কী করে।

বাবার হেলথ ডিপার্টমেন্টের সূত্রে কালিম্পঙের বাংলোটি পাওয়া গেছে। রিংপিংটন রোড ধরে শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে আর উঁচুতে ছোট্ট বাংলোটি, দূরবীনদারা হিলের একাংশ। বাংলো না বলে রেস্ট শেড বলাই উচিত।

ওপরে দুটো এক-কামরা সুইট, নিচে ডিপার্টমেন্টের শাখা অফিস। সুইটে ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ডরোব, বাথরুমে গিজার, দেওয়াল জোড়া কাচের জানালা, পেলমেটে ভারি পরদা। পরদা সরাতেই অনেকটা নিচে রেলি নদী। জুন মাসের প্রথম। সবে বৃষ্টি নেমেছে। দূরে কোথাও। দুধ সাদা জলে রেলি ভরে উঠছে। ২-১ দিনের মধ্যেই বর্ষা নেমে যেতে পারে। যদি যায়, কুক নরবাহাদুর ছেত্রি আমাকে বলল, নদীর আওয়াজে সারা কালিম্পঙে শুধু এই ছোট্ট উপত্যকাটুকু নাকি সারারাত গমগম করবে। এই বাংলোটা নাকি থরথর করে কাঁপবে। আর জানালা দরজার সব কাচ বাজবে ঝনঝন ঝনাৎ করে।

ঘর জোড়া ডাবল বেড। খাটে ডানলোপিলো। ওয়ার্ডবোর থেকে বের করে বেড কভার পাততে পাততে হঠাৎ আবার আমি শুনতে পাই। নিচে কেয়ারটেকারের সঙ্গে ঝগড়ার সুরে বাবা কথা বলছেন। আজকাল এত সহজে বাবার ধৈর্যচ্যুতি হয়! কেন যে মা নেই? তা আমি কি মরে গেছি! ২৬ পেরিয়ে ২৭, এখনো কি তুমি ছাড়া আমি আর কারও দিকে তাকিয়েছি। কেউ কখনো আমাকে দেখেছে কারও সঙ্গে মেলামেশা করতে? সিনেমায় যেতে? রেস্তোরাঁ থেকে বেরুতে? মার কাছে যা পেতে, স-ব, সব কি তুমি আমার কাছে পাও না বাবা? পিলো কাভার পরাতে গিয়ে, না পরিয়ে, আমি বাবার তিক্ত, রূঢ়, বীতশ্রদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে থাকি।

কী? না, গিজারের পানি কিঁউ ঠাণ্ডি হ্যায়। আরে বাবা লোডশেডিং ত এখানেও হয়। হয়েছে। কেয়ারটেকার করবেটা কী।

ধূসর পাপড়ি-ছড়ানো শার্টিনের সাদা চাদরে একটা ভাঁজ। আঙুল দিয়ে ঘষে সেটা মিলিয়ে দিতে গিয়ে অকারণে আমার চোখে জল এসে যায়। ওগো আমার নিজের বাবা, মা-র কাছে কী তুমি পেতে, যা আমার কাছে পাও না?

দুপুরে টানা ঘুম। দরজা খোলাই ছিল, কিন্তু বাবা ঘরে নেই। টানা বারান্দা দিয়ে হেঁটে গিয়ে দেখি, অনেক নিচে নদীর ওপর কাচে-মোড়া 'রেলি ভিউ রুমে' বাবা একটা সোফায় তখনও ঘুমিয়ে। মুখের ওপর খবরের কাগজ। এত দূর থেকে স্কুল পালানো ছেলের মতো দেখাচ্ছে, আহা, পার্কে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমাদের বাংলোর মাথার ওপর দিয়ে রিংপিংটন রোড দূরবীন পাহাড়ের দিকে উঠে ও শহরের দিকে নেমে গেছে। বিকেলবেলা আমরা শহরে নেমে গেলাম।

যতটুকু দেখলাম কালিম্পঙ খুব তৃপ্তি দিল। লোকজন কম, ছাড়া ছাড়া বাড়ি সব, রাস্তায় একটাও কুকুর নেই। এখানে কেউ মাইকে 'শুন সাবা শুন' বাজায় না। স্থানীয় লোক সকলেই নত মাথায় চলছে, কেউ উঠছে, নামছে কেউ, কেউ কারো সঙ্গে নিষ্প্রয়োজনে কথা বলে না। চক-এ নেমেই প্রথম মানুষের গুঞ্জন শোনা গেল।

সবুজ সাইনবোর্ডের ওপর লাল রঙে লেখা 'লি'। দূর থেকে দেখেই কাঠের দোতলা রেস্তোরাঁটি ভাল লেগেছিল। আমার পছন্দের রেস্তোরাঁয় বসে, আমার পছন্দ মতো খাবার অর্ডার দেওয়া হল। বাবা অ্যাসপারাগাস স্যুপ খুব পছন্দ করেন। আমি করি না। কিছুতেই সেটা অর্ডার করতে দিলেন না।

বাবা হঠাৎ বললেন, 'হ্যাঁরে, বুবলি, বিছানা তো একটা। তোর ঘুম হবে তো।' প্লেট থেকে মুখ না তুলে আমি বললাম, 'কেন হবে না?'

তালতলায় আমাদের আড়াই কামরার ফ্ল্যাটে বেডরুমের বিছানাটিও ছিল খুবই প্রশস্ত। জানালায় নেটের পরদা। ফ্রিজ, রেডিওগ্রাম, ড্রেসিং টেবিল—সবই সেখানে। জ্ঞান হবার পর থেকেই আমি আর মা ওই ঘরেই শুতাম। বাবা শুতেন পশ্চিমের আধখানা ঘরটিতে। মাঝেরটিকে লিভিং রুম বললে বলা যেতে পারে। দাম্পত্য প্রয়োজনে মা যে আমাকে একা রেখে মাঝের ঘর পেরিয়ে পশ্চিমের ঘরে যাতায়াত করতেন এটা আমি বহুকাল টের পাই নি। সেক্স ব্যাপারে তখন যা বিশ্বাস করতাম তা হল বাচ্চা হবার পরে ওই প্রয়োজনটি নারীর আর থাকে না। অর্থাৎ মা হবার পর।

ক্লাস সেভেন কি এইটেই তখন, একদিন প্রথম রাতেই খুব ভয়েই স্বপ্ন দেখে চিৎকার করে উঠি, তারপর মাকে পাশে না পেয়ে মাঝের ঘরে চলে যাই এবং 'মা' 'মা' ডাকতে থাকি। প্রথমে বাবার ঘরের ছিটকিনি ধরে ভেতর থেকে টানাটানি, তারপর দরজা দু'হাট করে খুলে মা চৌকাঠে এসে দাঁড়াল এবং বাবাও ঘাবড়ে গিয়ে, বেড সুইচ টিপে দিয়েছেন।

একটিও বোতাম লাগাবার সময় হয় নি এমন ব্লাউজ বুকে লটকানো, পরনে শুধু কালো সিল্কের পেটিকোট—আই স্যাডো, আই লাইনার, লিপস্টিক—সব সারা মুখে মাখামাখি—চুল খোলা—পিছনে বাবার ঘরের ফ্লুরোসেন্ট আলোর ব্যাকগ্রাউণ্ডে মা-র সিলুয়েট মূর্তি, ওহো, সে যে কী বীভৎস দেখিয়েছিল! সেই ঘেন্না আমার মন থেকে কখনো যায় নি। মা-র মৃত্যুর পর আট বছর হয়ে গেল, মার প্রেতিনী মূর্তি আমি মুহূর্তের জন্যেও আজও মনে আনতে পারি না।

'না মানে তোর তো আবার একা শোওয়া অভ্যেস।' বাবা বললেন।

তালতলায় থাকতে খুব ছোটবেলায় এক মেমের কাছে প্রতি রবিবার সকালে পিয়ানো শিখতে যেতাম। বাবা আগাগোড়া চেয়ারে বসে থাকতেন। প্রথমদিন পিয়ানোর রিডে আমি তো কিছুতেই আঙুল ছোঁয়াব না। অনেক সাধ্য সাধনার পর নকি তর্জনী দিয়ে একটা রিড ছুঁয়েছিলাম। প্রথম দিনে তাই কোনও লেসন্ই হয় নি।

পিয়ানোর রিডে প্রথম আঙুল রাখার সেই অসম্ভব, কঠিন, অনতিক্রমণীয় বাধা যেন বাবার গলায়। কেন?

মা-র মৃত্যুর পর কিছুদিন ঝাড়গ্রামে মামার বাড়িতে, তারপর দীর্ঘ আট বছর ধরে সত্যিই আমি মা-র ঘরে একা শুই। ছিটকিনি দিয়ে শুতে আমি তো কোনওদিন ভুলিনি। কেন?

রেস্তোরাঁয় জানালার পাশেই বিশাল গিরিখাত। প্রায় ২০০০ ফিট নিচে উপত্যকা দিয়ে ফেলে-আসা তিস্তা নদী বয়ে চলেছে। এত উঁচুতে তার গর্জন একটুও শোনা যায় না।

'কেন, খুব তো চওড়া দেখলাম বিছানাটা'—সে দিকে তাকিয়ে আমি বলি। কয়েক হাজার ফিট নিচে তিস্তা বাজারের কাছে নদী পেরবার জন্য পুরনো ব্রিজটা ভেঙে পড়ে আছে। ১৯৬৮ সালের একমাস জুড়ে টানা বর্ষায় সেই একবারই তিস্তা শত শত ফিট ফেঁপে উঠে ব্রিজটি ভেঙে দেয়। আমার বয়স তখন চার-পাঁচ হবে।

বিকেল থেকেই মেঘ করেছিল। বাংলোর কাছাকাছি আসতে ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি! বাংলোয় ফিরে একটা মোটা পুলোভার গায়ে চড়িয়ে, ছাতা মাথায় আমি একবারটি নিচে ডাঃ রায়ের কোয়ার্টার থেকে ঘুরে আসতে গেলাম। রায়গিন্নির আজ লক্ষ্মীনারায়ণ পুজো। অনেক করে যেতে বলেছিলেন। রাত ৯টা হবে। তবে এখন লোডশেডিং নেই। বাংলোয় বারান্দায়, রেলি-ভিউ রুমে, সর্বত্র আলো জ্বলছে।

বৃষ্টি জোরে নামতে পারে বলে ওঁরা তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিলেন। মাঝখানে মিনিট কুড়িও যায় নি। নিচে কোর্টইয়ার্ড থেকে দেখলাম আমাদের দোতলার ঘর অন্ধকার। বাবা কি শুয়ে পড়লেন? উঃ, কি কনকনে হাওয়া রে বাবা।

আলো জ্বালতেই, ওম্‌মা একি কাণ্ড। বাবা সত্যিই কম্পল গলা পর্যন্ত টেনে পাশ ফিরে শুয়ে। তবে সেই ডাবল বেড আর নেই। পাশাপাশি দুটি সিঙ্গল বেড। পরিপাটি বিছানা।

'আরে-এ, এটা টুইন বেড ছিল নাকি?'

'হ্যাঁ'; সত্যিই ঘুমে জড়িয়ে এসেছে বাবার গলা, 'আমি ভেবেছিলাম ডাবল। নরবাহাদুর বলতে...তখন দুজনে টানাটানি করে...আ-হাআ' বাবা হাই তুললেন।

বাথরুম বাবার বিছানার ওপারে। বাথরুম সেরে সোজা আমার বিছানার দিকে যাচ্ছি, বাবা হাঁ হাঁ করে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন, বিছানায়, 'আর-এ নান্ না, মাঝখান দিয়ে না, ওদিক দিয়ে ঘুরে যা। মাঝখানে আধ ইঞ্চিটাক পুরু ধুলো। অনেককাল জোড়া ছিল তো

খাটদুটো।' দেখলাম ভল্লুকের বিস্ফারিত অসহায় চোখে বাবা আমার দিকে তাকিয়ে।

বেড সুইচ অফ করে আমরা শুয়ে পড়লাম।

পাশাপাশি আলাদা খাটে, তবু বহু রাত পর্যন্ত আমার ঘুম এল না। মাঝ রাতে ভীষণ মেঘ ডাকাডাকি শুরু হল। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। জানালা শার্সি। ঝনঝন-ঝনাৎ করে বাজতে লাগল। রেলি নদীতে ঢল নেমেছে। সারা উপত্যকা গমগম করছে রেলির গাঁ-গাঁ ডাকে।

বাবা অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। মাঝে মাঝে নাকও ডাকছে। কিন্তু, আমার ঘুম আসছে না। পরদা সরিয়ে খুব ইচ্ছে হল রেলিকে, গর্জনকারিনীকে একবার দেখি। কিন্তু, না, বাবার বিস্ফারিত, অসহায় ভল্লুক চক্ষুদুটি অন্ধকারে আবার ভেঙে উঠল। বাবা নামতে বারণ করেছেন। মাঝখানে যা ধুলো।

মনোরমা, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৯৮৬

স্মৃতি, শূকরনন্দিনী, কথা বলো....

তার ছোটবেলার কথা কিন্তু আমিও কিছুই জানি না। শুনেছি, তার বাবা বীরভূম সীমান্ত পেরিয়ে, বিহারে, দুমকা রোড থেকে মাইলতিনেক ভেতরে হরিপুরা মিশন হাইস্কুলের ভূগোল-স্যার ছিলেন। মায়ের নাম ছিল সুচিত্রা।

নিখিলেশের ছোটবেলায় জীবনটা এইরকম হতে পারে :

নিখিলেশের বাবা বিয়ে করেন ত্রিপুরা থেকে শান্তিনিকেতনে বি টি পড়তে আসা সুচিত্রা নন্দীকে। এসব ১০৪০-৪১-এর কথা। নিখিলেশের জন্মসাল হল ১৯৪৩।

সুচিত্রা ত্রিপুরার কোনও এক চা-বাগানের ম্যানেজারের মেয়ে। তারা সাত বোন। সাত না। পাঁচই যথেষ্ট। এতে কিছু ফারাক পড়বে না। নিখিলেশ ছোটবেলায় শুনেছে ওর দাদুর একটা হাতি ছিল। চা-বাগানের ম্যানেজারের অবশ্য একটা কেন, পাঁচটা হাতি থাকতে পারে। বা, দুটো। সুচিত্রার বোনেরা, বিবাহসূত্রে সবাই বড়লোক। কেউ টাটা, কেউ বোম্বেতে। সেজ বোন থেকে বেলঘরিয়ায়। তারা একবার গাড়ি চেপে এখানে বেড়াতে এসেছিল। শুধু নিখিলেশের মা হরিপুরায়। অথচ, বোনদের মধ্যে শুধু সুচিত্রাই শান্তিনিকেতনের। বি এ-বিটি। কেন? উত্তরের জন্যে সুচিত্রার ওষ্ঠের দিকে তাকানো ছাড়া উপায় নেই। সুচিত্রা জন্মেছিল ঠোঁট কাটা হয়ে। ছোটবেলায় কৈলাশহর সরকারি হাসপাতালে করানো অপারেশটি উৎকৃষ্ট হয়নি। জোড়ার দাগ দিনে দিনে, মেলানো দূরে থাক, স্পষ্টই হয়ে উঠল। এমনিতে ভাল রবীন্দ্রসংগীত গাইত। শৈলজারঞ্জনের কাছে শিখেছিল। কিন্তু, নাকের নিচে, ওপরের ঠোঁটে একটি মাংসপিণ্ড। তাই হরিপুরা। তাই যামিনীকান্ত। কুশারি।

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনে ভরতি হবার আগে পর্যন্ত কম দিন তো হরিপুরায় কাটেনি। টানা ষোল বছর। অথচ, স্মৃতি বলতে কীই-বা। কটা-বা। আর তার সবই বিরক্তিকর। বা, ক্লান্তিকর।

নিখিলেশের কী বা মনে পড়তে পারে। ছোটবেলায় হরিপুরার? শালবনের ধারে ছোট্ট কোয়ার্টারে দিনের পর দিন জেগে ওঠা। বড় হওয়া। শুধু খাওয়া আর পায়খানা যাওয়া। পায়খানা যাওয়া আর খাওয়া। এছাড়া স্কুল। এছাড়া সন্ধ্যার পর সেই ঘনঘোর অন্ধকার।

তার চেয়েও অন্ধ-কার সেই জ্যোৎস্না, এত আলো যে পথ চেনা দায়।

ওহ্, ক্লান্তিকর।

রেডিও একটা। মা-র সেলাই মেশিন। সেলাই মেশিনে একদিন সাপ। আর রোজ রাতে ডাকাতির ভয়, যদিও দু-একবার ছিঁচকে চোর ছাড়া কেউ আসেনি। বাবা গেছেন দুমকা। লাঠি বাড়িয়ে জানালা দিয়ে কম্বল টেনে নিচ্ছে তার আর মার গা থেকে। খুব ছোট তখন। মাকে ফিসফিস করে বলেছিল, 'মা, হুপা'। হুপা ফরেস্ট গার্ড। মা মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল, 'চুপ'। সারারাত হি-হি। মাকে জড়িয়ে। ওই একটা। এ-ছাড়া কী। কোনও-এক বসন্তকালে পক্স। মনে নেই। শুধু মুখে দাগ থেকে গেছে। চার-পাঁচটা। তাদের কোনও স্মৃতি নেই, তবু সেগুলি মেলায়নি। তাই অস্বীকার করার উপায় নেই যে হয়েছিল। নতুন মাস্টারমশাই এলেন, পুরুলিয়া থেকে। প্রতুল চৌধুরী। গেট আউট ফ্রম মাই ক্লাস। ক্লাস টেন। না যাব না। কী করতে পারেন আপনি। বাবা বেত মেরেছিলেন। ছিনিয়ে নিয়ে দোতলার বারান্দা থেকে ছুঁড়ে দিয়েছিল বাইরে। ঝোড়ো হাওয়ার জন্যই সেটা হয়ত উড়ে গিয়ে অত দূরে পড়েছিল। গেট পেরিয়ে জঙ্গলের ভেতর। হাতে কী আর অত জোর। একদিন স্কুল-বিল্ডিংয়ে একা। গ্রীষ্মের ছুটি। একটা মস্ত বোড়া সাপ। ফোঁস! গর্তে ঢুকে পড়ল। মার, মার, শালাকে। একা পিটিয়ে মেরে গাছে টাঙিয়ে দিয়েছিল। হত্যাকারী কে, সে ছাড়া আজও কেউ জানে না। সেই একবার প্রতিবাদ। একবার হত্যা। একবার ক্রোধ।

এছাড়া ছবির মতো বাঁধা-ফ্রেমের কিছু নেই। ছোটবেলার কিছু আর পড়ে নেই ওই অস্থিগুলি ছাড়া। শুধু চলাফেরা হাঁটা। হাঁটছে তো হাঁটছেই। এক এক সময় আমার মনে হয় মৃত্যু পর্যন্ত নিখিল স্রেফ হাঁটাহাঁটির করে গেল, হেঁটেই মরেছে শুধু। এ-ছাড়া খাওয়া। আর পায়খানা। এ-ছাড়া পায়খানা। আর খাওয়া। খেতে-খেতে আর হাগতে-হাগতে বড় হয়ে ওঠা। বাইরে মাঠ পেরিয়ে টিলার ওপাশে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত। রণ-পায়ে ছুটে আসা ঝড়।

ওহ্, বিরক্তিকর।

অন্তত, একবার তারা দেওঘরে বেড়াতে গিয়েছিল এমনটা কি হতে পারে না? না, মাসাঞ্জোর হতে পারে না। তখনও হয়নি। ও হ্যাঁ, বাসে জানালার ধারে লম্বা সিটে শুইয়ে তুমুল বৃষ্টিধারা চিরে, হাসপাতালে মাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সে কি ইন্দু হবার সময়? নাকি সুচিত্রাকে, ববিনে সুতো পরাবার সময় যখন সাপে কামড়াল তখনই? শাঁখামুটি নাকি। শুনেছিল। পরে চিড়িয়াখানায় গিয়ে শাঁখামুটির খাঁচার সামনে কতদিন দাঁড়িয়ে থেকেছে। অথচ মা-র মুখ মনে পড়েনি। বাসে করে যাবার সময় দু-দিকে প্রবল তোড়-বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হু-হু করে টিলার পর টিলা, শালজঙ্গল, প্রান্তরের পর প্রান্তর উড়ে যাবার কথা। নিশ্চিত গিয়েছিল।

এছাড়া সুদীর্ঘ ষোল বছর ধরে ঝড়বৃষ্টি বারবার যা-যা হবার তথা শীত-বসন্ত যা-যা আসবার, এসেছিল। কুয়োর ধারে রাধাচূড়ার ফুল ফুটেছিল ষোলবার। ষোলবার ঝরে গিয়েছিল। ওটা নাকি নিখিলেশের মায়ের নিজের হাতে বসানো? তা হবে। সাঁওতালি মেয়ে কোমর ভেঙে মাটি থেকে কুড়িয়ে কালো কেশে গুঁজেছিল রাঙা কুসুম। হবে! একবার এক ঘূর্ণিঝড়ের মাথায় দেখেছিল বনবন করে ঘুরন্ত, সাপের খোলস। মুকুট মনে হয়েছিল। কেন যে, খামোকা।

ওহ্, ক্লান্তিকর।

তবে এটা মনে পড়ে, যে রাতে ভাত খেয়ে একটু আগেই শুতে যেত সে। নইলে, ইন্দুর পাশে শুয়ে মাস্টার্বেট করতে অসুবিধা! সত্যি কথা বলতে কি, ক্লাস নাইনের ফার্স্ট বয় তখন রোজ মাস্টার্বেট করত। কেন যে, খামোকা! ইন পয়েন্ট অফ ফ্যাক্ট, সাপের কামড়ে

সুচিত্রার মৃত্যুর সাতদিন পরে, না কেন মিথ্যে কথা বলবে, সুচিত্রাকে দাহ করে এসে, বাবা যামিনীকান্ত, তখন ৫২, পাশবালিশটিকে সুচিত্রার নামে বাঁচিয়ে তুলে, সে রাতেই মাস্টারবেট করেছিল। নিখিলের ছোটভাই পল্টু তখন ছ-মাসের। বাবা বেঁচে থেকে একথা স্বীকার করে গেছেন। ডায়েরিতে। আসলে, মানুষ এমনটা করে থাকে আর তাই বাবা এটা করেছিলেন। পাপ-পুণ্যের সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

ওহ্, বিরক্তিকর।

আসলে নিখিলের হরিপুরা-স্মৃতি বা ছেলেবেলা বড় ক্লান্তিকর। বড় বিরক্তিকর। বড় একঘেঁয়ে। এবং তাই, ভীষণ, বড় একঘেয়ে, বড় বিরক্তিকর। বড় ক্লান্তিকর। জ্ঞানগম্যি হবার পর, সেই প্রথম থেকে সে যা শুনে এসেছে—

বাবা : দুমকায় একটা কাজ পেয়েছি, মাড়োয়ারির গদিতে হিসেব লেখার। শনিবার যাব, রবিবার ফিরব। মা : না-না, তোমার শরীর টিকবে না গো। কেন টিকবে না, শরীরটা তো যামিনীর ভালই। ছাই ভাল, গেল বছরই তো নিমোনিয়া হল। আরে, নিমোনিয়া একবার কার না হয়। তখন তো কোনও অসুখ নেই। পঞ্চাশ পার হচ্ছি, এমন শরীর কজনের থাকে। তা সত্যি বাপু সবই মা আদ্যাকালীর কৃপায়। না-না, সামনের শনিবার থেকে যামিনী যাবেই, রোজগার বাড়াতে হবে। গোটা টাকাটা পোস্টপিসে রাখব। মাসে পঁচাত্তর। নিখিল বড় হচ্ছে। রেজাল্ট ভাল হলে বেলুড়ে রেখে পড়াব। না, না, সুচিত্রা বরং খরচ কমাবে। লক্ষ্মী বিয়োবে এই শ্রাবণে। গয়লা ছাড়িয়ে দিয়ে নিজে দুইব। মুংলিকে ছাড়িয়ে দিয়ে নিজে জাবনা দেব। দুধ চার্চে বিক্রি করব। না-না, যামিনী সামনের মাসেই রামপুরহাটে জমিটার বায়না করবে। টাকার দরকার। বেশ, তাহলে যা ভাল বোঝ করো বাপু। কথা তো শুনবে না। আচ্ছা, কাল সকালে লালডি থেকে কি মেছুনি আসবে? না এলে সাদা মুরগিটা কাটব। না-না, লালটা। না সাদাটা। না, লালটা। আচ্ছা, লালটা। কাল হাটেও যেতে হবে। মুর্গাডাঙ্গা। কেন চাল নেই? আর কতদিন থাকবে। চারটে পেট। আর একটা আসছে। বুড়ো বয়সে, উঃ, কী লজ্জায় ফেললে। এবার এসব ছাড়ার বয়স হয়েছে। উঁ। ঠিক আছে, এই এখুনি ছাড়লাম। (মায়ের হাসি) থাক, ঢের ঢঙ হয়েছে। এসো। উঁ। আমি কি তাই বলেছি। উঁ। বুড়ো বয়সে, উঁ, আমার লজ্জা করে না! আর কমাস পরে মুখ দেখাব কী করে, খোকাকে। উঁ। ইন্দুও বুঝতে পারবে। তোমার হল? অপারেশন করিয়ে দাও না আমাকে।

উঁ। উঁ। উঁ। উঁ। উঁ....

ওহ্, বিরক্তিকর।

চলো না একবার দেওঘরে যাই। হ্যাঁগো। বাবাকে দেখে আসি। আজ এঁচড় রাঁধলে কোত্থেকে। তোমার ছাত্রর বাবা সোমরা মাঝি দিল। অ। দাঁত-চারটে বাঁধাবে কবে। একেবারে সামনে। কেন অসুবিধে হয়। আমার কী। হলে তোমার হয়। পড়াতেও সুবিধে হবে। আগে তোমার প্রেগন্যান্সি টেস্ট হোক, তারপর। থাক, আর বাতাস করতে হবে না। উঠে, এক গ্লাস জল গড়িয়ে দাও।

ওহ্, ক্লান্তিকর।

ওগো, দুটি কয়লা ভেঙে দিয়ে যাও না। ওগো, হরলিকসের শিশি থেকে চাট্টি তেজপাতা দিয়ে যাও। ওগো, দুটো আলু কেটে দিয়ে যাও না, ঝোলের আলু কিন্তু। ওগো, দুটো পেঁপে পেড়ে আন না বাগান থেকে। কচি-কচি দেখে আনবে। শোনামাত্র বাবার তড়াক। যেন পোষা কুকুর। যেন আঙুল চলছে, কিন্তু আঙুলের ডগায় হার্মোনিয়মের রিড নেই। ক্যামেরার শাটার টেপা হচ্ছে, ফিল্‌স পোরা নেই। লণ্ঠন দোলাচ্ছে ট্রেনের গার্ড আর

দূর ড্রাইভার প্ল্যাটফর্মের শত শত মানুষের ফাঁক দিয়ে তার সঙ্কেত খুঁজছে। সমঝোতা।

ওহ্‌, বিরক্তিকর।

পাশের ঘরে সে আর ইন্দু, এক বিছানায় পাশাপাশি। ইন্দুর মেন্স হবার পর থেকে মা-রে সে কী দুশ্চিন্তা। ইনসেস্টের গন্ধে সারারাত ম-ম করত নিচু-সিলিং ছোট ঘরটা। অবশ্য হয়নি কিছু। তবে, কিছুই হয়নি এটা ঠিক নয়। বেশ ভুলই। স্বপ্নে একদিন হয়েছিল। ইন্দুর সঙ্গে। সে কি হওয়া নয়? অথচ, এদিকে যামিনীকে আলাদা করবে কী উলটে পেটে শত্তুর পুরে দিয়েছে। এবং যা আগেই বলেছি এবং যামিনী বেঁচে থাকলে সত্য বলে যার সাক্ষ্য দিত, জননীর মৃত্যু তাঁর প্রতি নিখিলেশের জনকের যৌনতাকে বিছিন্ন করতে পারেনি। শ্মশানে পুড়িয়ে এসে সে রাতেই....ওহ্‌, হোক মানবিক, তবু কী অমানবেয়।

এ-ছাড়া নিখিলেশের সেই প্রবাস জীবনের আর কী। কাঁদড়ে কালীপ্রতিমা বিসর্জন। হাঁটুজলে। ছেলেরা হুড়মুড় করে। কারও হাতে খাঁড়া। কেউ চাঁদমালা কেউ-বা নরমুণ্ড ছিঁড়ে নিয়েছে। হ্যাজাকের আলোয় যুবতী মাতৃমূর্তির গা থেকে হুপা লাল সার্টিনের শাড়ি খুলে নিচ্ছে। প্রতিমার স্তনে নিখিলেশের ডান হাতের তালু। একদম তালুর মাপে। কাদা। হরিপুরা মিশন চার্চের ফাদার খুব পছন্দ করতেন নিখিলকে। ডেনিস টফি খাওয়াতেন। কোলে বসিয়ে আদর করতেন খুব। সে আরও ছোটবেলার কথা। তাঁর ইক্ষুদণ্ড।

এ-ছাড়া....এ-ছাড়া পাহাড়, শাল-মহুয়ার জঙ্গল... অর্জুন, সেগুন, পিপুল-এ-সবের নামই শুধু শুনে গেছে, একটিকেও চেনবার চেষ্টা করেনি। ঝরনার উপযোগিতা ছিল শৌচকার্যে। তখন টিলার পিছনে সূর্য। অথচ প্রকৃতি তাকে টানেনি, এমন তো নয়। ডেকেছিল। কিন্তু যে-ভাবে দেখলে পাহাড়-নদী দিগন্ত-সূর্যাস্ত পশুপাখি এসব ভাল লাগে, সেই দৃষ্টিভঙ্গিটাই তার ছিল না। ছোটবেলা থেকে তার দূরদৃষ্টিটা ছিল কম। এবং, বড় হবার আগে তো তা আদৌ ধরা পড়েনি! চল্লিশে চশমা। কিন্তু তখন কোথায় পাহাড়। শাল-মহুয়া আর ঝরনা। শুধু গ্রে-স্ট্রিটের বারান্দা...।

তবে মজার ব্যাপারও একটা হয়েছিল বটে একবার। তখন সবে ইন্দু হয়েছে। একদিন মাথায় হ্যাট, পাফ প্যান্ট আর লম্বা নীল স্ট্রাইপ সাদা শার্ট পরা এক সাহেব ঘুরতে ঘুরতে হরিপুরায় এসে হাজির। বাবার বয়সী। চার্চ দেখতে এসেছে। মুখে বেশ যিশু-যিশু ভাব। তোমরা আমার কাছে আইস, আমি তোমাদের শান্তি দিব।

দিন দুই গেস্ট হাউসে থেকে গেল। তৃতীয় দিনে দেখা গেল ফাদার ম্যাথু চারজন প্যান্ট-শার্ট পরা ষণ্ডামার্কা সাঁওতালের সঙ্গে এদিকে আসছেন। সাহেব তখন টিলার ওপর। সূর্যাস্ত দেখছে। ওদের দেখেই দে-ছুট। একটা কালভার্টের নিচে থেকে বের করা হল তাকে।

জানা গেল, সাহেব ফিনল্যাণ্ডের লোকহলেও সে আসলে এ মানুষ-পৃথিবীর লোকই ন[illegible] সে পাগল। মহুলপাহাড়ি উন্মাদাগার থেকে পালিয়ে এসেছে।

গেস্ট হাউসে লোক ভেঙে পড়ল। সাহেব বললেন, 'ঠিক আছে। ফিরে যাব। একবার বাথরুম থেকে ঘুরে আসছি।'

গেল। বাথরুমে 'ফ্ল্যাশ'টানার শব্দ। তারপর শাওয়ার। সাহেব স্নান করছে। তারপর আর টু শব্দটি নেই। অনেকক্ষণ। ব্যাপার কী। ধাক্কাধাক্কির পর সাহেব অবশেষে বেরয়।

এখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। সে কী হাসি সাহেবের। বাবার ধুতি-পাঞ্জাবি পরে সাহেব উঠল জিপে। হাসতে হাসতে জিপের মিলিয়ে যাবার পরেও সাহেবের বিশুষ্ক বাদামি হাসি খানিকক্ষণ সন্ধ্যার আকাশে লেগেছিল।

১৯৬২ সালে একবার একটা ডাকোটা ভেঙে পড়েছিল। চিন-ভারত যুদ্ধের সময়। পাহাড় থেকে পিঁপড়ের সার দিয়ে নেমে এসেছিল আদিবাসীরা। ক্রমে মেলা বসে গিয়েছিল ওই প্লেনটিকে ঘিরে। টানা সাতদিন। লোকে লোকারণ্য। পান-বিড়ি, বেলুন, শুকনো মিষ্টি, পাঁপড়ভাজা, মায় নাগরদোলা, আনাজপাতি। শুখা মহুয়া হরিপুরায় 'এরোপ্লেন মেলা' সেই একবারই। দিন পনের ধরে চলে। নির্বাক এরোপ্লেন মেলায় একটা মস্ত কুমড়ো। কুমড়োর সামনে দাঁড়িয়ে সান্তাল রমণী। বুকে বিবেকানন্দ ধাঁচে দু-হাত জড়ো। ই কুমড়োটো কত লিবি রে। দু-টাকা। দু-টাকা কী রে। চার আনা লে। নাই হোবেক। আঁচ্ছা, লে, পাঁচ আনা দুব। হোবেক নাই। দিয়ে দে ক্যানে। নাই হোবেক। তখন চালের সের দু-টাকা। তাই কুমড়োও দু-টাকা।

ওহ্, ক্লান্তি-বিরক্তিকর।

শারদীয় আজকাল, ১৯৮৬

বাসাবদল

বাসাবদল করার ব্যাপারে বলা যায়, কে যে কোথা থেকে কোথায়, এবং কখন, উঠে যাবে তা আগে থেকে জানার উপায় নেই। পাথুরেঘাটায় থাকত বিপিনরা। চলে গেল কোথায়? না, সেই লেকের ধারে, সাউথ এণ্ড পার্কে। চালতাবাগান থেকে অমলরা, পাইকপাড়া থেকে ছোট জামাইবাবু, মায় বাগবাজারের পুন্টেদারাও তিন পুরুষের ভিটে ছেড়ে একদিন বাসাবদল করলেন, আগে অথবা পরে; কেউ গেল সেই যার নাম কইখালি, কেউ কাছাকাছি পাতিপুকুরে। ছোট জামাইবাবুরা তো লিটারলি ধাপধাড়া গোবিন্দপুরেই উঠে গেলেন।

প্রায় সতের বছর, সেই ১৯৭০-৭১ থেকে বাগবাজারের বোসপাড়ায় দোতলার ফ্ল্যাটে একটানা থাকার পর রমেনদেরও একদিন বাসাবদল করার সময় এল। বাসাবদলের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল ৯ মাস ধরে হাঁফ-ধরা মামলা চলার পর, নতুন বাড়িঅলার উকিলের সঙ্গে রমেনের পক্ষের উকিল ঐকমত্যে এলে, তবেই। নতুন বাড়িঅলা জগদীশবাবু, 'ভেরি ওয়েল-কানেক্টেড', এতদিন থাকতেন দিল্লির হৌস খাশ অঞ্চলে, সরকারি ফ্ল্যাটে। চাকরি ছিল প্রধানমন্ত্রীর নিজের পলিটিক্যাল উয়িঙ 'র'-তে। রিটায়ার করার পর তাকে দিল্লির ফ্ল্যাটটি ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে এবং বাগবাজারের সদ্য-কেনা নিজের বাড়িটির ব্যাপারে মামলার ফল যে তাঁর নিরাশ্রয়তার পক্ষে যাবে একটা এরকম ধরে নেওয়া যেতে পারে। অন্তত, রমেনের উকিল তাকে সেই কথাই জানিয়েছিলেন। 'তা ছাড়া', তকলি-ঘোরানোর ঢঙে গুম্ফ-প্রান্তের ডগায় দু-আঙুলে একটা দ্রুত পাক লাগিয়ে পরেশবাবু বলেছিলেন, 'নতুন বাসার জন্যে সেলামির একুশ হাজার টাকাটাও বাদীপক্ষ দিয়ে দিচ্ছে।'

একেবারে মারুতি হাঁকিয়ে উকিল নিয়ে জগদীশবাবু সোজা দিল্লি থেকে এসেছিলেনও একবার। ঝকঝকে গ্লেসিয়ারের মতো ভদ্রলোককে কেমন দেবতা-দেবতা দেখতে, দেখলে শয়তানের চেয়েও ভয় করে। রমেন রাজি হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে চেতলার ছোট্ট একহারা ফ্ল্যাটটি রমেন, বউ শিউলি এবং মেয়ে ঝুনু—তিনজনে দেখেও এসেছে। রমেন তো ক-বারই গেছে। ঘর চুনকাম হয়ে গেছে,

এমনকি জানালা-দরজাতে মেয়ের পছন্দসই অফ্-হোয়াইট রঙ লেগে গেছে। টেকনিকালি সেলামিসহ এক মাসের ভাড়া দিয়ে বাড়ির পজেশন নেওয়া হয়ে গেছে।

সত্যি, এটা কে কবে ভাবতে পেরেছিল যে, তাদেরও একদিন সতের বছরের জিনিসপত্রে ঠাসা এই স্মৃতিবিধুর মালগুদামটি ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং যেতে হবে যার নাম নেই চেতলায়! কলকাতায় এবং শহরতলিতে প্রায় সর্বত্র যাতায়াত থাকলেও, এমন অলিগলি অন্তত উত্তর বা মধ্য কলকাতায় আর নেই বলা চলে, কোনও-না-কোনও প্রয়োজনের দিকে যেতে গিয়ে, যেখান দিয়ে রমেন একবারও হেঁটে যায়নি। বেলেঘাটা, মায় তিলজলাতেও গেছে একবার। এই তো কদিন আগে, নতুন ফ্ল্যাটের বন্দোবস্ত হতেই, অফিস থেকে খবর পেয়ে সে চলে গিয়েছিল চাঁদনির পিছনদিকে গুমখানা লেনে, আফতাব আলি নামে রাজমিস্ত্রির খোঁজ সেখানেই পেয়েছিল। নতুন ফ্ল্যাটে জমানো স্ল্যাবের কিচেন-টেবিলটি আফতাবই করে দিয়েছে।

হ্যাঁ চেতলার কাছাকাছি, খালের এপার-ওপারেই একরকম, কালীঘাটে তো গেছেই। নিছক রেজিস্ট্রি বিয়েতে নিশ্চিন্ত হননি শিউলির দাদা, বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজন যারা এসেছিল, সব্বাইকে পাকড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন কালীঘাটে, ওঁর গাড়িতে শিউলি, রমেন আর দাদা বউদি—অ্যাণ্ড ফাইভ ট্যাক্সিজ নি আ রো—মন্ত্রতন্ত্র পড়িয়ে তবে ছেড়েছিলেন। বউদি শিউলির সিঁথিতে পরাতে বাধ্য করেছিলেন সিঁদুর, প্রথম উলু দেয় বোধহয় বেনেঝি বকু—তারপর সবাই একসঙ্গে—বেশ কিছু অপরিচিতাও নিশ্চিত সে সমবেত সংগীতে গলা দিয়ে থাকবে—কারণ, অত মেয়ে তো বরযাত্রায় ছিল না। শিউলি একগাছি গোড়ের মালাও পরিয়ে দিয়েছিল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার কলকাতা শাখার কার্যকরী সমিতির সভ্য কমরেড কাঞ্জিলালের গলায়। আর কমরেডের তো শুধু মালাটি তুলে ধরার ওয়াস্তা, জল ছেড়ে তীরে ওঠার আগে হাঁসের মতো লম্বা করে যে জান্তব আগ্রহে শিউলি বাড়িয়ে দিয়েছিল তার গলাটা, সবাই হো-হো করে হেসে উঠেছিল। বাস্তবিক, রেজিস্ট্রি অফিস থেকে কালীঘাটে শাঁখা-সিঁদুর-নেওয়া পর্যন্ত গোটা এপিসোডটা ছিল অবিকল নেই, 'সেই তো মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি' ছড়াটির বৃত্তান্ত।

কিন্তু চেতলা?

নামই শুনে গেছে। যেমন, পূর্ব পুটিয়ারি। কেউ কি জানে, সে কোথায়? কালীঘাট ব্রিজের ওপারে, মন্দির-চত্বর থেকে, আদিগঙ্গার ধারে, প্রেডিসেন্সি জেলের খুন-খয়েরি রঙের প্রকাণ্ড পাঁটিলটাও চোখে পড়েছে বারবার, গম্বুজে প্রহরী। জেলের মধ্যে থেকে অলঙ্ঘ্য পাঁচিল টপকে ভেসে এসেছে গম্ভীর ঘন্টাধ্বনি।

'আর-খানিক এগুলেই আপনার গোপালনগর মোড়। তারপর বাঁদিকে টাআনা ঘুসে গেলই আপনার চেতলা।' বাড়ির খবর নিয়ে প্রথম দিন এসে দালাল কানাইলাল তাকে বলেছিল, 'বাড়ি আপনার, সার, নালির ধারেই। জোয়ারের টাইমে মন্দির-ধোয়া জল আপনার রাস্তায় উঠে আসে। মায়ের মন্দির একদম ওপারেই কিনা!' তারপর কী না-ভেবে যে সে যোগ করেছিল, 'কেওড়াতলাও পাশেই।'

কোথা থেকে যে কী, বোধ হয়ত জলের কথা শুনেই ডাঙার মানুষ রমেনের হঠাৎ এক যুগ পরে সুলতার কথা মনে পড়ে গেল। সুলতাদের দরজিপাড়ার বাড়িতে, বিশেষত রবিবার, সারা সকাল ধরে, সেই ঘোর নকশাল আমলে, সেই মার্কস-মাও-লেলিনের গোল্ড-রাশের যুগে, বিপ্লব নিয়ে সে কত-না সূচীশিল্প, সে কী তুমুল তর্ক, এমনকি হাতাহাতিও—বলা বাহুল্য, তর্ক সেই ব্যাপারেই যে-ব্যাপারে কোনও মানুষ কোনওকালেই কিস্‌সু জানে না, অর্থাৎ 'দেশের বর্তমান পরিস্থিতি।' সেই সুলতা যার গলায় ছিল মালকা

জান-এর গ্রেন ও বন্দিশ, আর যে দোতলায় ঘরে সারা সকাল জুড়ে সাধত তারাপদ চক্রবর্তীর গায়কিতে 'খোল খোল মন্দির-দ্বার, পূজারিণী'—একি কল্পনা করা গিয়েছিল, সেই সুলতারা একদিন, একে একে, দরজিপাড়ার 'বসু-নিকেতন' নামের সস্নেহ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বাসাবদল করবে সেই সুদূর অতলান্তিকের পূর্ব উপকূল, উপসাগর-তীরে, সানহোসে নামে ম্যাপে নেই, তবু আছে এক ছোট্ট শহরে। 'স্যান হোসে শহরটি সমুদ্রের ধারেই। জোয়ারের সময় জল উঠে আসে রাস্তায় জানো? মনে করিয়ে দিয়ে যায়, পৃথিবীর তিনভাগের একভাগ জলের কথা। 'বিদেশ থেকে পাওয়া রমেনের সেই প্রথম চিঠিতে সে লিখেছিল, 'এখানে শহরে তিনভাগের একভাগ মানুষ সন্ধ্যার পর সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসে থাকে, জানো? আমিও তাই করি, জানো? ঢেউ-মরা অন্ধকার জলরাশির দিকে তাকিয়ে ভাবি, তোমার আর আমার মতো মানুষকে পৃথিবীর দুইপ্রান্তে রাখার অধিকার এ জলরাশির নেই।'

ডোয়ার্কিন কোম্পানির পাঠানো একটা ছোট্ট হার্মোনিয়াম সানফ্রানসিসকো এয়ারপোর্ট থেকে আনার সময়—সানহোসে থেকে মাত্র ১০ মাইল দূরে সে তখন—তার গাড়িকে পিছন থেকে ধাক্কা মারল এক মাতাল ড্রাইভার—'অ্যান্ড দা কার বাস্ট ইন্টু ফ্লেমস্'—কলকাতার ইংরেজি কাগজে 'বিদেশ বার্তা' বিভাগে খবরটি লাইন পাঁচেক বেরিয়েছিল। অবশ্য, হার্মোনিয়ামটির কথা খবরে ছিল না। এ-কথা জানত শুধু ডোয়ার্কিন আর রমেন। রমেন পাঠিয়েছিল। খবরটা শিউলির প্রথম চোখে পড়ে। সন্ধ্যাবেলা, অফিস থেকে ফিরলে, যার বাংলা হতে পারত 'শোচনীয়' বা 'মর্মান্তিক' এমন এক-শব্দের শিরোনামটি দেখিয়ে সে বেশ একটু-বা তৃপ্ত স্বরেই বলেছিল, 'দেখো তো তোমাদের সুলতা চৌধুরী কিনা? আমি কফি করে আনছি।'

এত বলে, সে চলে গিয়েছিল কিচেনে। শিরোনামে যদি অন্তর্গত সংবাদের কিছুটাও অন্তত ভেসে উঠত, যেমন 'বিদেশে মৃত্যু', তাহলে সকালেই চোখে পড়ত—কেননা, 'মৃত্যু' বিষয়টির সংবাদযোগ্যতা এমনিতেই যথেষ্ট আর 'বিদেশ' শব্দটির 'কাছে-আয়' ডাকের আন্তরিকতা তো কোনওদিনই মলিন হবার নয়। কিন্তু, ওই সংবাদ-শিয়রে 'বিদেশ' অথবা 'মৃত্যু' কিছুই ছিল না। সারাদিনটা রমেনের কেটেছিল আসন্ন ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুতি কমিটির মিটিঙে-মিটিঙে।

বোসপাড়ায় টানা সতের বছরের পাট তুলে দিয়ে এখন রমেনদের উঠে যেতে হবে চেতলায়। সত্যি, কে যে কখন এবং কোথা থেকে কোথায় উঠে যাবে তা আগে থেকে জানার উপায় নেই।

পুজোর ছুটিতে রমেনরা কাছাকাছি কোথাও যায়, বরাবরই, এই ঘাটশিলা কি মিহিজাম—বড়জোর দীঘা—কাশ্মীর কি কুলু-মানালির খোঁটা দিয়ে শিউলি যেটাকে বলে থাকে 'ছোট-বাইরে', বাসাবদলের কারণে বহু বছরের মধ্যে এই প্রথম পুজোটা কলকাতায় কাটাতে হবে। রমেন ভেবেছিল, মহালয়ার দিনেই 'গুদাম সাফ' করে দেবে। গুদাম ছাড়া কী, এই সতের বছর ধরে দিনে দিনে মালপত্তর যা জমেছে একটা ইনভেনটরি করলে সংখ্যায় তো হাজার দশেকে ত দাঁড়াবেই। ক'ট্রিপ লাগবে কে জানে।

কিন্তু মহালয়ার কথা শুনে শিউলি বলে উঠেছিল, 'ছিঃ। ওদিন তো তর্পণ, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ। জানা নেই? তাছাড়া অমাবস্যা-মহালয়ার দিন কেউ বাড়ি বদল করে।'

মহালয়ার দিন রমেন বাড়ি ফিরল গালুডির টিকিট বিক্রি করে। সারা সন্ধে সে গুম হয়ে থাকে। আসলে সে এবার টিকিট কেটেছিল এক বিধুর নস্টালজিয়ার কারণে। প্রায় পনের বছর আগে, বিয়ের বছর দুয়েকের মাথায় সে আর শিউলি গিয়েছিল গালুডিতে।

তখনও ঝুনু হয়নি। 'ছোট-বাইরে' বলে যতই কেন হ্যাটা করুক শিউলি, গালুডির উঁচু-নিচু মেঠো রাস্তা দিয়ে ডুলুং নদীর ধারে পাথরের ওপর বসে থাকা, গোড়ালিও ডোবে না এমন বহতা জলের ওপর বিকেলের আলো, ছোট ছোট ঢেউ-এর মাথায় সদাচঞ্চল অজস্র আলোর হাইফেন—এ সব, অন্তত রমেনের বেঁচে থাকায়, বারবার একটা নতুন ডায়ামেনশন এনে দিয়েছে বৈকি। একদিন তো দূর হরদিঝারি দেখতে যাবে বলে দুজনে ডুলুং পেরুচ্ছে। এমন সময় মাঝ-বরাবর শিউলির ব্লাউজ থেকে বোতাম ছিঁড়ে পড়বি-তো-পড় একদম জলের মধ্যে। সামান্য একটা বোতাম, তাই নিয়েই সে কি হুলুস্থুল কাণ্ড, জলে দাঁড়িয়ে সে কি আতিপাতি খোঁজা দুজনের। শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেল সেই রমেনই। শিউলি পাবেটা কী করে, নিচু হলেই খসে পড়ছে আঁচল। খোলা বুক সামলাবে, না, বোতাম খুঁজবে।

তো, খুঁজে পেয়েছে রমেন, এবং সে কিছুতেই মালিককে বিনা-পারিশ্রমিকে তা দেবে না। পারিশ্রমিক বলতে চুম্বন একটি। তাকে ঘিরে জলের ওপর 'দাও বলছি', ভাল হবে না বলছি' বলে শিউলির সে কী নাচানাচি। 'কিছুতেই না' এই বলে জলসিক্ত, চুনীলাল বোতামটি মধ্যমা ও তর্জনীতে ধরে রেখে ডান হাত তুলে সেদিনের সেই, ওর-নাম-কি, সোনা-ঝরা সন্ধ্যায়, যেভাবে স্বাধিকারপ্রমত্ত, খাড়া দাঁড়িয়েছিল সে, তার সঙ্গে গুমগতভাবে আমেরিকার স্ট্যাচু অফ লিবার্টির একটুও মিল কি ছিল না? শিউলি যতই ঠাট্টা করুক, এই সব কাছেপিছে ঘুরে-আসা নিঃসন্দেহে তাদের বেঁচে-থাকাকে এক-এটা সাফল্য দিয়ে গেছে। কিন্তু শিউলি এ-সব বোঝে না। সে বোঝে কুলু। সে বোঝে মানালি। প্রাক-বিবাহ যুগে সাধে রমেন শিউলিকে বলত, 'তুমি পাতি। আমি বুর্জোয়া'।

এবার পুজোয় অনেক বছরের মধ্যে বোধহয় তো এই প্রথম কোথাও যাওয়া হবে না। নিঃসন্দেহে এটা একটা ব্যর্থতা। সত্যি, বাসাবদলের সঙ্গে মহালয়ার তথা অমাবস্যা-পুর্ণিমারও যে একটা সম্পর্ক আছে, তা কে জানবে। মহালয়ার দিন সারা সন্ধেটা বাড়িতে বসে নিজেকে আগাগোড়া কেমন হোরো-হেরো লাগল রমেনের।

যাই হোক, ব্যর্থতা নিঃসন্দেহে। কিন্তু, এটা তাদের আসল সমস্যা নয়। আসল সমস্যা হল, নতুন ফ্ল্যাটে কী জিনিস যাবে আর কী কী যাবে না, তাই নিয়ে। মোটামুটিভাবে একাদশী এবং দ্বাদশী এই দুটি তারিখ বাসাবদলের দিন হিসেবে ঠিক হয়েছে। তারপর শুভদিন বলতে সেই ২০ তারিখ। কিন্তু, সেদিন তো স্বয়ং বাড়িঅলাই গৃহপ্রবেশ করেছেন!

আর দিনপনেরও বাকি নেই, কিন্তু এখনো কী যাবে, আর কী যাবে না, ঠিক হয়নি। রমেনের সাফ কথা : নতুন ফ্ল্যাট ৭০০ স্কোয়ার ফিটের, বাগবাজারের ফ্ল্যাটের প্রায় অর্ধেক। অতএব, অর্ধেক জিনিস যাবে এবং প্রায় অর্ধেক যাবে না। এ-কথা সে নতুন ফ্ল্যাট দেখে আসার দিন থেকে বলে আসছে যে, বেশ কিছু জিনিস বিক্রি করে দাও। গত দু মাস ধরে মা-মেয়ের সঙ্গে রমেনের এই নিয়ে চলছে ধ্বস্তাধ্বস্তি। যে, ওই প্রায় অর্ধেক জিনিসগুলো কী কী এবং সেগুলি কার এবং কতটা।

বস্তুত এটা রমেন কেন, এ-বাড়ির কারোরই আগে জানা ছিল না যে, বাথরুমের মগ বা পেস্ট-জাতীয় যৎকিঞ্চিৎ জিনিস এজমালি হলেও এ-বাড়িতে প্রত্যেকের পছন্দসই একটা আলাদা বস্তু জগৎ এত বছরে তৈরি হয়ে গেছে এবং তাদের ভিত্তি বেশ রীতিমতোই অনুৎপাটনীয়।

যেমন, টিভি-র কথাই ধরা যাক। নেওয়া হবে, না, হবে না। ঝুনু: এ ম্যাগো। সাদাকালো টিভি? চেতলার বাড়িতে আটটা ফ্ল্যাট। সাতটাই রঙিন টিভি।

বস্তুত, স্কুল-বাসের ড্রাইভার রাজার সঙ্গে ঝুনুর এ নিয়ে কথাও হয়ে গেছে। দাম শ-পাঁচেক দেবে বলেছে। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, আর কত? এখন বাবা যদি দু-একশ বাড়াতে পারে। সাদা-কালো টিভি ড্রাইভার-ট্রাইভার ছাড়া আর নেবেটা কে। তবু, যা হোক, একটা ব্যবস্থা করেছে ঝুনু। পাঁচশ হোক, সাতশ হোক, রাজা টিভিটা, তারা দামে রাজি হলেই, নিয়ে যাবে। এ-ছাড়া সে রঙিন টিভি-র ক্ষেত্রে আঠার ইঞ্চিতে রাজি হয়েছে। সেদিক থেকে হিসেবমতো চার ইঞ্চি স্থান-সংকুলান হয়েছে।

কিন্তু, শিউলি কী ছাড়বে আর কী ছাড়বে না, এ বিষয়ে এখনো মনস্থির করে উঠতে পারে নি। সে খাটটা তো নেবেই, দুটি আলমারিই নেবে, সোফা-কাম-বেডটার তো শুধু পায়া ভেঙেছে, ওটা চাই। গ্যাস-সিলিন্ডার, উনুন? সে তো যাচ্ছেই। ডাইনিং টেবিল? ওমা, অমন সুন্দর টেবিলটা, নীল ডেকোলাম-টপ....

'বইগুলো তো আমার। এগুলো আমি নেব না।'

'ওমা, সে কী!'

'সে কী মানে? গত চারবছের আমি এগুলোর একটাও নামাইনি র‍্যাক থেকে।'

'বাঃ, ঝুনু বড় হয়ে পড়বে না!'

'আচ্ছা ওই স্তূপাকার পত্রপত্রিকাগুলো...ওগুলো অন্তত বেচে দাও? আর দেওয়ালে এই সব পুরনো ছবি.... ক্যালেন্ডার...রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সুভাষ বোস, মায় লেনিন....এসব আমাদের আর কী কাজে লাগবে বলতে পারো?' স্টোররুম থেকে এনে ঝুনুর ছোটবেলায় ওয়াকারটা মাটির ওপর ঠক করে নামিয়ে রাখে রমেন, 'তুমি কি এটাও নিয়ে যাবে?'

ঠোঁটে এক লীলাময় পাউটিং করে শিউলি বুক চিতিয়ে বলে, 'হোয়াই নট?' এক টানে সে এই ভাটা বসেয়েও তাকে টেনে নিয়ে যায় ডুলুং নদীর জোয়ারে। গোড়ালি-জলে দাঁড়িয়ে সে-দিনের সেই না-দেওয়া পারিশ্রমিকের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

রাতে সে আসে মুগা-ডুরে পরে। ঠোঁটে ল্যাকমে। সত্যি তো, আশ্চর্য এই কাঞ্জিলাল দম্পতি! কলকাতায় যদি একটি দম্পতিরও ডিভোর্স হওয়া অনিবার্য ছিল তবে তা এদের, এই মিঃ অ্যান্ড মিসেস কাঞ্জিলালের।

রাগে, ঘৃণায়, অনাসক্তিতে, নিষ্ঠুরতা ও উদাসীনতায় পরস্পরের প্রতি অশ্লীলতম মন্তব্যে—এমনকি মারামারিতে—এ সুকঠিন ভূমিকায় তাদের চেয়ে উপযুক্ত নায়ক-নায়িকা এ ধূসর শহরে আরও দুটি নেই। তবু তারা একসঙ্গে। এক ছাদের নীচে। নকল স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায়।

সে রাতে সাদা বলশালী-নারীশরীর রমেনের বিছানায় উঠে আসে শুধু ব্রেসিয়ার আর কালো সায়া পরে।

স্ত্রীকে বুকে টেনে নিয়ে রমেন শুরু করে বেশ হালকাভাবেই, 'আচ্ছা শিউলি, এই যে আজকাল মালদার ফ্লাডের ছবিটবি বেরুচ্ছে রোজ, দেখছ তো, অ্যাঁ! এই তো আজই বেরিয়েছে, একটা আরামবাগ-তারকেশ্বর রোডের ওপর দিয়ে বুকজল ঠেলে এগিয়ে আসছে মানুষ। সকলেরই মাথায় তো দেখি শুধু একটা করে বোঁচকা। আচ্ছা, ওরাও তো তিনপুরুষের ভিটে ছেড়ে আসছে?'

'কী বলতে চাও তুমি?' উদ্ধত স্তনবৃন্ত থেকে রমেনের হাত সরিয়ে দিয়ে শিউলি পিছিয়ে যায়।

রমেন ততক্ষণে তার মেরুদাঁড়ায় প্রারম্ভ খোঁজা শুরু করেছে।

'না, মানে, একজনের তো দেখলাম তাও নেই। কাঁধে স্রেফ একটা বাচ্চা নিয়ে চলেছে।

জল গলা পর্যন্ত।'

এক ঝটকায় কটিদেশ থেকে রমেনের হাত সরিয়ে শিউলি এবার উঠে বসে। বেশ বড় করে সিঁদুরের টিপ পরে এসেছিল—কপালের গোটা ডানদিকটা জুড়ে কেউ যেন একটা লাল-ডোবানো ব্রাশ টেনে দিয়েছে। নীল রাতের আলোয় তাকে ষাঁড়ের মড়ি থেকে মুখ তোলা বাঘিনীর মতো দেখায়।

'আবার শুরু করলে তুমি ভ্যানভাড়া? সেই পুরনো কাসুন্দি!'

বাঘিনীর বুকে শুয়ে, দক্ষিণ স্তনে গাল রেখে রমেন শেষবারের মতো বলে যায়, 'মনে করো, একটা এমারজেন্সি। ফ্লাড, আর্থকোয়েক, ইরাপশান অফ এ ভলকানো—বা, ওয়ার্ল্ড-ওয়ার! তখন, তখন তুমি সঙ্গে কী নিয়ে যাবে শিউলি, কাকে নিয়ে যাবে? বলে সে উজ্জ্বল বলশালী নারীশরীরের মেরুদাঁড়ায় প্রারম্ভে ফের হাত রাখে।

না, আমি ফ্রিজ নিয়ে যাব। না, আমি টিভি নিয়ে যাব। না, আমি আলমারি নিয়ে যাব। না, আমি আলনা নিয়ে। না, আমি গ্যাস নিয়ে। না, আমি আয়না নিয়ে। না, আমি ড্রেসিং টেবিল নিয়ে। না, আমি ইনফ্রা-রে আলোটা নেবই। না, আমার কোমরে ব্যথা। না, আমি কয়লা রাখার টিনটা নিয়ে যাব। না, আমি শ্যু-কেসটা নিয়ে যাব। গালুডির হাটে কিনেছিলাম দেওয়ালি-পুতুলগুলো, না আমি নিয়ে যাব। না, মিহিজাম স্টেশনে কেনা বেতের ওই সুন্দর ঝুড়িটা, না, ওয়াকারটা, হ্যাঁ দরকার হবে, না, আমি.... হ্যাঁ হবে, না, আমি নেব, হ্যাঁ, নেব, নেব, না, আমি.... না নেব... হ্যাঁ আমি...আমি তোমার বইগুলো...আমি প্রত্যেকটা ম্যাগাজিন....হ্যাঁ, না, হ্যাঁ, না, না, না, না...

দুই পাগলা রাজার আদেশে যুযুধান নির্বাক রক্তাক্ত দুটি সৈন্যশ্রেণী এখন অস্ত্র ত্যাগ করে কোনও অলৌকিক উপায়ে পরস্পরের মধ্যে মিশে হারিয়ে যাচ্ছে। শত্রু-মিত্র এখন আর চেনার উপায় নেই। আরও দূরে, ওই চলে যাচ্ছে কোথাও বুক জল, কোথাও গলা জল ভেঙে, নতুন বাসার সন্ধানে, সর্বহারা মানুষের সারি। তাদের কারও মাথায় শুধুই বোঁচকা। কারও মাথায় ভয়ার্ত শিশু এক।

আর আশ্চর্য, তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, জলে হাঁটু ডুবিয়ে, হাঁটুজল ভেঙে, একটি সবুজ বনবীথিকাও। শুধু তার মাথার ওপর এক নবীন জলভরাতুর চলমান মেঘমালা। এখন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। শুধু এই বনবীথিকাকে ঘিরে।

শারদীয় প্রতিক্ষণ, ১৯৮৭

বেঁটে লোকের ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে ; এর মানে সূর্যাস্ত আসন্ন

১

স্থান মুম্বাই। সমুদ্রতীরে হোটেল 'ময়ূরপুচ্ছ'-এর তিনতলার ৩৩৩নং কামরায় 'মাই ইণ্ডিয়া' দৈনিক পত্রের নবনিযুক্ত বাঙালি সম্পাদক পিনাকী ভাদুড়ি সাব-এডিটার মানালি মুখার্জির সঙ্গে নাইট-ডিউটি দিচ্ছিলেন। রাত বারটার পর নিউজ ডেস্কের কাজ শেষ হলে অফিসের গাড়ি মিস মুখার্জিকে এখানে পৌঁছে দিয়ে যায়। অত্যধিক মদ্যপানের ফলে এডিটর তখন চলে গেছিলেন কামনা-বাসনার বাইরে। শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেল ভাগ্যিস। শেষ রাতের কম্বল সমেত খাট থেকে পড়ে গিয়ে উনি তখন মেঝের ওপর, কিন্তু তখন আর ওঠা নেই,

এই শীতের কম্বল টানা নেই, সস্তা জুট কার্পেট ছেঁচে দিচ্ছে হাঁটুর চামড়া, বোধহয় রক্তও ঝরছে—

হেন সময় রুম টেলিফোনে—

ক্রিং-ক্রিং। ক্রিং-ক্রিং।

কে রে বাবা। ওই শালা প্রেস সুপারিনটেনডেন্ট নায়ার, আর কে। সার, আজ কত কপি প্রিন্ট করব। আরে বাঞ্চোৎ, কর না বিশ কি পঁচিশ। বলাই তো আছে বৃষ্টি হলে বিশ আর ফেয়ার ওয়েদার পঁচিশ। অডিট রিপোর্ট বছর ঘুরলে, আশির ওপর থাকার কথা। সে তো বরাবর আমি দেখছি। দেখব। ধ্যুৎ, ধরব না। বাজছে, বাজুক।

রিং থেমে গেল।

মানালিকে আচ্ছাসে বাগিয়ে আজ এর শেষ দেখবেন বলে এডিটর সবে তাকে উলটে উঠে বসেছেন, এমন সময় ওই আবার....

ক্রিং-ক্রিং। ক্রিং-ক্রিং।

নায়ার ছাড়া আর কে হতে পারে। জি-এম এস-পি সিং নয় তো? ওরা দুজন ছাড়া এখানকার পাত্তা তো কেউ জানে না।

মানালিকে না ছেড়ে ওকে জড়িয়ে গড়াতে গড়াতে টেলিফোনের কাছে পৌঁছে ভাদুড়ি রিসিভার তুললেন। চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে মানালিকে ইশারায় বললেন, থেমো না। যা করছ করে যাও।

'সার। সরি টু ডিসটার্ব ইউ। এ ফোন ফ্রম ইওর পেপার। সেজ ভেরি আর্জেন্ট।'

'ওক্-কে লেট মি সি।' মানালির সঙ্গে যুগলবন্ধী অবস্থায় এডিটর বললেন। নায়ার হলে একটাই কথা। ইউ বাস্টার্ড। ফাক ইওরসেলফ।

কিন্তু নায়ার নয়। যা ভাবতে চাননি। দ্যাট পাঁইয়া। এস পি সিং। জেনারেল ম্যানেজার।

'হোয়াট দে হেল সিং?'

'সার। ইওর রেজিগনেশন হ্যাজ বিন অ্যাকসেপ্টেড বায় এম ডি।'

নীরবতা।

'কী হল?' মানালি জানতে চাইল।

এমনিতে মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। তবে মানালির স-প্রশ্ন হবার প্রসঙ্গটি ছিল একান্ত যৌন।

এডিটর ভাদুড়ি মানালিকে বললেন, 'না-না। কিছু না।'

এস-পি : সার?

ভাদুড়ি : হ্যাজ সামবডি বিন অ্যানাউন্সড অ্যাজ দা নেকস্ট?

এস-পি : নো সার। নট অ্যাজ ইয়েট।

মানালি : এনিথিং রঙ? উইথ মি?

ভাদুড়ি : ডোন্ট সার্কুলেট দা অর্ডার টিল আই গেট ইন চাট উইথ এম-ডি।

এস-পি : বাট সার, দ্যাটস অ্যান অর্ডার ফ্রম দা এম-ডি হিমসেলফ।

ভাদুড়ি : হাঁ-হাঁ। বাট ইউ কান্ট সার্কুলেট বিফোর আই সি দাট অ্যান্ড সাইন। আই শ্যাল গেট ইন টাচ উইথ এম-ডি আলি টো মোরো। ইউ ওয়েট ফর মি ইন দা অফিস টিল আই রিচে দেয়ার। কান্ট ইউ ডু দ্যাট ফর ভাদুড়িদা সিং, ফর হোয়াটএভার আই হ্যাভ ডান ফর ইউ?

সিং এগারটা পর্যন্ত দেখবে বলল। এম-ডি উঠেছেন 'ময়ূরপুছ'-এই ৫০১নং ঘরে। সে মনে করিয়ে দিল।

'ও কিছু না। তোমাদের নিউজ ডেস্কের জন্যে একটা সার্কুলার দিয়েছিলেন। সাইন করে আসিনি। দেরিতে ছাড়তে বললাম।' এডিটর মানালিকে বললেন, 'হাঁটু-ফাটু ছড়ে গেছে, এঃ।'

আদি গুহামানবের মতো হামাগুড়ি দিয়ে ওরা আবার বিছানায় উঠল।

২

শীতের সকাল। হোটেল 'ময়ূরপুচ্ছ'-এর এয়ার কণ্ডিশান ব্রেকফাস্ট রুমের ভারি দরজা ঠেলে পিনাকী ভাদুড়ি যখন ভেতরে ঢুকলেন, তখন ঢং-ঢং করে আটটা বাজছে। হল ফাঁকা। ওপাশে অ্যান্টিরুমে একটি পার্শি পরিবার এসে বসেছে। এ-ছাড়া কেউ এখনো নামেনি।

'গুড মর্নিং সার।'

বাটলার লি ইয়ং পিনাকীকে খুব ভাল চেনে। অন্তত তার বান্ধবীদের তো বটেই। প্রত্যেককে নিয়ে পিনাকী কখনো না-কখনো এখানে এসেছে। ভোরে ব্রেকফাস্ট খাইয়ে বিদায় দিয়েছে।

পিনাকী জানতে চাইলে, মিঃ ভারতন কি ঘরে ব্রেকফাস্ট দিতে বলেছেন।

'নো সার।' বাও করে লি বলল, 'হি উইল কাম ডাউন এনি মোমেন্ট। শুড আই সেন্ড হিম আ মেসেজ সার?'

লি জানে 'আমি এসেছি, আপনি নিচে আসুন' এম-ডি-কে এহেন মেসেজ দেবার হিম্মত মিঃ ভাদুড়ির নেই। হোক না সে এডিটর। আর সে বাটলার। ওঃ, শালা এই লি ইয়ং যে কত কী জানে তার সম্পর্কে! তার প্রত্যেকটি বান্ধবীকে সে আসলে তার মিস্ট্রেস বলে জানে। তাদের প্রত্যেকের পদবি জানে। 'হাউ ইজ মিস বা মিসেস অমুক সার' বলে তাদের পদবি ধরে কুশল জানতে চায়, যে যা। একবার তো দরজা নক না করে ঘরে ঢুকে পড়েছিল। কে যেন ছিল সেদিন? ও-হ্যাঁ, রোহিনী। সেই রিকেটি মেয়েটা। যে রিসেপসনিস্ট হতে চেয়েছিল আর তাই এসেছিল রিট্‌ন টেস্ট দিতে। (বলা বাহুল্য, ব্রেল পদ্ধতিতে)। ওরা তখন বাথরুমে। দরজা আধ-খোলা। পিনাকী আর রোহিনী টাবে শুয়ে। ওঃ, অত রোগা মেয়ে আর কখনো... বেশ, মজা এসেছিল।

'আধঘন্টা পরে ব্রেকফাস্ট পাঠাবে' গলা ঝেড়ে সে লি-কে বলেছিল।

'ইউ লুক নাইস সার।'

নাইস? কিন্তু, সত্যিই কি তাই? ডানদিকের আয়নায় বাঁ-দিক ঘুরে সে একবার নিজেকে দেখে নেয়। ডাভ গ্রে স্যুটটি কি আজকের আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যায়নি? সক্কালবেলা। চাকরি গেছে। অনেক ক্যাজুয়ালি আসাই কি সিচুয়েশনের পক্ষে মানানসই হত না? শিট-শাওয়ার-শেভ এই তিনটি প্রাতঃকৃত্য নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন হলেও, সে দেখল, তাকে দেখাচ্ছে জল ঝেড়ে ডাঙায় ওঠা একটা হিপোপটেমাসের মতো। সত্যি, কী বেঢপ রকমের বিশাল চেহারা তার! অতটা চওড়া কাঁধ কি তার খর্বকায় শরীরের পক্ষে সত্যিই দরকার ছিল? অন্তত, ওপরের পার্টির উঁচু দাঁত দুটো তো এই সেদিনও ছিল হিপোর মতোই মস্ত। একটু গাম্ভীর্য খসেছে কি কেলিয়ে বেরিয়ে পড়ত। তাকে এডিটর করার আগে ভারতন বলেছিলেন, 'বাট, ইউ উইল গেট ইন টাচ উইথ আ ডেন্টটিস্ট ফার্স্ট বিফোর ইউ জয়েন—ওন্ট ইউ?' প্রসিদ্ধ দন্ত-উৎপাটক

এই শালা লি-ইয়ঙের কাকা লিন-লিন হুয়া ওপরের পার্টির বাদবাকি দাঁতগুলো তুলে দিয়ে ('নেহি তো সেট নেহি ওগা') পুরো মাড়িটাই বাঁধিয়ে দিল! অংশত বাঁধানো দাঁতে নাকি গ্রিপ থাকে না, হাসলে বা রেগে জোরে কথা বললে 'কটাং' করে খুলে যেতে পারে। 'পার্টিকুলার দিউরিং কিসিং' লিন-লিন সোনার দাঁত দেখিয়ে হেসে বলেছিল। বিল হয়েছিল ২২০০। অবশ্য কোম্পানিই বিল মেটায়। তবে এতে করে এম-ডি-র সামনে চাকরের হাসি হাসতে বা অধস্তনদের প্রভুর ধমক ধমকানো গেলেও, মানালির পুরু ঠোঁট টেনে চোষার প্রশ্নই ওঠে না। লিন-লিন হুয়া যা বলেছিল, বড়জোর তরুণ প্রেমিকের স্পর্শাতুর চুম্বন। বাধ্য হয়ে সে তাই করে। বেশ প্রেমিক-প্রেমিক লাগে। যেন সেও বিশ্বাস করে চুম্বনে। ঠোঁট-চোষায় নয়।

কোম্পানি দেওয়া দাঁতের সাহায্যে ৫ ফিট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে সেই হাসিটার রিহার্সাল দিল, যেটা নাকি এম-ডিকে দেখামাত্র সশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে সে হাসবে। না খুব মিথ্যে বলে নি লি-ইয়ং। অন্তত, হাসিটা নট ব্যাড। অবিকল কৃতার্থ ক্রীতদাসের। এবং হাসিটা দেখতে গিয়েই সে দেখতে পেল, আরে, এ কী কাণ্ড, তার ঘন আর মোটা দক্ষিণ ভ্রু-তে ওই বিদ্রোহী সিকনি-রঙা পাকা চুলটা মানালি দেখতে পায়নি? পাকা পিউবিক হেয়ার কমোডে বসে এখনো নিজের হাতে তুলে থাকে বটে, এখনো বলেনি মানালিকে তুলে দিতে। মাথায় কলপ নেয় নিয়মিত। কিন্তু, বুক আর ভ্রু-র যা কিছু সবই তো মানালির তুলে দেবার কথা। দ্যাখো, কাণ্ড! কেমন তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে আছে।

তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে বহু কষ্টে সে চুলটা তোলে। সে জল ঝাপ্টা দিয়ে আর একবার মুখ ধোয়। ওঃ, ভ্রূ-র একখানা পাকা চুল পাকড়ে তুলতেই জীবনের দশটা মিনিট কেটে যায়। কী হেলথি দেখাচ্ছে দ্যাখো, শালহা পেকেছে কিনা। গোলা সাবানের ডিবেটো উলটে, হাতের এঁটো ধোবার জন্যে হলেও, তাই দিয়ে সে মুখটা সাফসুতরো করে নেয়। নাঃ, এখন নিঃসন্দেহে 'নাইস' দেখাচ্ছে। গতমাসে দিল্লি থেকে বোম্বেতে উড়ে এসে ডি-এম ভারতন তাকে দশ মিনিট সময় দেন। ময়ূরপুছ-এর এই ব্রেকফাস্ট রুমে। বললেন, ভিনদ্রনওয়ালে মরল, প্রাইম মিনিস্টার মরল, তবু সার্কুলেশন বাড়ছে না। সেই বিশ থেকে পঁচিশ। হোয়াট প্রিসাইজলি ইজ রঙ উইথ ইউ ভাদুড়ি?

আসলে কলু ব্যাটা টের পেয়েছে। বলদটা ঘাড় নাড়ছে, ঘন্টাও বাজছে, কিন্তু ঘানি ঘোরাতে পারছে না।

'সার, এই পাঞ্জাব ইস্যুটা নিয়ে আমাকে আর-একটু খেলতে দিন। অ্যাণ্ড লেট রাজীব কনটিনিউ ফর আনাদার সিক্স মান্থস। হি ইজ গোয়িং টু পিক আপ আ ওয়ার প্রিটি সুন—আই আম সিওর। অ্যাণ্ড দ্যাট উইল বি দা টাইম ফর আওয়ার রাইজ। আই শ্যাল পুল আপ অ্যাট লিস্ট টু এইট্টি।

এম-ডি ইম্প্রেসড হন নি। আই সি, পিনাকি বুঝতে পেরেছিল, ডেকান টাইমস-এর ভি এম আইয়ার-এর সঙ্গে তাহলে সত্যিই কথাবাতা চলছে। পিনীক শেষপর্যন্ত মূলে হাভাত করার জন্যে শেষ চালটাই দিয়েছিল। 'ইন দ্যাট কেস সার, আই শুড লাকি টু বি রিলিজড' সে শেষমেষ দুম করে বলে বসে।

মনে তো হয়েছিল যে কাজ হল। এম-ডি-র সুর নরম হয়েছিল 'না-না। তা বলছি না। ইউ কনটিনিউ। বাট হাউ মেনি প্রাইম মিনিস্টার্স হ্যাভ টু স্যাক্রিফাইস দেয়ার লাইভ্স্ ইন অর্ডার টু পুল আপ আওয়ার সার্কুলেশন—ইউ টেল মি—'

হাসতে হাসতে উনি বলেছিলেন চিজ স্যান্ডউইচের প্লেটটা ওর দিকে ঠেলে দিয়ে। কেন যে ওখানেই থামেনি। আরও দাম বাড়াবার জন্যে অফিসে গিয়ে রেজিগনেশান

লেটারটা পাঠাল কেন যে। আরও ৬ মাস চাকরি করতে পারত। আগস্ট পর্যন্ত কনট্র্যাক্ট ছিল। তাড়াতই। কিন্তু, এর মধ্যে সে কি একটা কিছু জুটিয়ে নিতে পারত না।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে সে দেখল, গ্লাস প্যানেলের ধারে একটা টেবিলে ডি-এম একা বসে। শীতের সকাল। এখানেই প্রথম রোদ আসবে। বেয়ারা সুরেশ পরদাটা আরও একটু টেনেটুনে দিয়ে কাঁধের তোয়ালে দিয়ে টেবিলটা মুছে দিচ্ছে। দূর থেকে তাকে এগিয়ে আসতে দেখে এম-ডি-র কপালে শায়িত পর পর দুটি সেকেণ্ড ব্যাক্রেটে এখন ঢেউ খেলছে, পিনাকী দেখতে পেল।

'সো ইউ আর হিয়ার', এম-ডি বললেন, ঘুম-জাগা ভারি গলায়, 'দ্যাট অ্যানয়েজ মি।'

'সার?'

না বসে, পিনাকী সে ভাবে এম-ডি-র সামনে দাঁড়িয়ে রইল যে-ভাবে বিস্কুট-প্রত্যাশী বুড্ঢা (কুকুর) রোজ সকালে তার সামনে এসে 'সিট ডাউন' বললে বসে, নইলে দাঁড়িয়ে থাকে।

এম-ডি ভারতন তাকে বসতে বললেন না। পিনাকী ল্যাজ গুটিয়ে ৩৩৩ নং কেনেল-এ ফিরে এল।

৩

জানুয়ারির শুরু। সবে সন্ধে হয়েছে। সকাল থেকেই মেঘলা করেছিল। এখন বাইরে তোড় বৃষ্টি। স্বচ্ছ দেওয়ালে ওপারে নিচে সুইমিং পুলে ঠাণ্ডা কনকনে জল টগটগ করে ফুটছে। কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের কারণে হোটেলের ভিতরে কোনও শীত-গ্রীষ্ম নেই।

পুলে জনপ্রাণী নেই। লবিও বিলকুল ফাঁকা। মানালির সামনে জিন-লাইম উইথ বিটার। পিনাকী সামনে একটা লম্বাপানা গ্লাসে একসঙ্গে দুপেগ রাম, সঙ্গে আকণ্ঠ স্ম্যাসড আইস। তাতে দুটি স্ট্র গোঁজা। সকালে ১১টা নাগাদ অফিসে ফোন করেছিল পিনাকী। 'ভি-এম আইয়ার হ্যাজ বিন অ্যানাউন্সড অ্যাজ দা নেক্স্ট এডিটর'—সিং তাকে জানিয়েছে। আগামী শনিবার পিনাকীর বিদায়-সম্বর্ধনার জন্য চাঁদা তুলছে রিপোর্টার বসনৎ পোৎদার—পিনাকী যাকে সাসপেণ্ড করেছিল। অফিসে উল্লাস।

পিনাকীর ফেভারিট ড্রিঙ্ক এই ডাবল্ রাম উইথ ছেঁচা বরফ। এতে হয় কী, বরফ যেমন-যেমন গলে, পানীয়ের রঙও সেই মতো বদলায়। রামের ষাঁড়রক্তে ইতিমধ্যে তিন সন্তানের মা, সূতিকাগ্রস্ত সতী, স্ত্রী মনোরমার পায়ের আলতার রঙের আভাস! রঙ যত বদলাবে, বরফ যত গলবে, প্রতি সিপে আর স্বাদও তত বদলাবে। এর সঙ্গে কাঠবাঙাল জোতদারের ছেলে চায় খানকতক শুঁটকি মাছ, পোয়াটাক প্যাঁজ, কাঁচা লঙ্কা আর সৈন্ধব লবণ। তা সে-সব আর এই হোটেল ময়ূরপুচ্ছ-এ জুটবে কোত্থেকে। বদলি হিসেবে তাই এক প্লেট ব্যাঙের ঠ্যাং বলে দিয়েছে মানালি। এল বলে। মানালি খাচ্ছে এক প্লেট টেংরি-কাবাব। পিনাকির কথা যদি সত্যি হয় নিউজ ডেস্ক থেকে রিপোর্টার রুমে সে প্রোমোশন পেয়েছে। কাল তার অফ ডে। কাল অফিসে যাবে। গেলে অ্যাপো-লেটার পাবে। তাই সেলিব্রেট করছে মানালি।

একসঙ্গে দুটি স্ট্র মুখে পুরে মাত্র একখানা লম্বা চুমুকেই গ্লাস এক-চতুর্থাংশ ফাঁকা হয়ে গেল। তা যাক। বরফ আবার গলবে। গ্লাস ফের ভরে উঠবে কানায় কানায়। উপচে পড়ার আগেই লাগাও ফের লম্বা চুমুক। মজা আসবে। শেষ হয়ে এলে এই গ্লাসেই আবার রাম ঢেলে দিয়ে যাবে। ধ্বস্ত বরফ দিয়ে যাবে ঠেসেঠুসে, গ্লাস বদল না করে। এই ককটেলে এটাই

নাকি দস্তুর। হোটেল ময়ূরপুচ্ছ এই ককটেলের নাম রেখেছে, 'নেভার এন্ডিং স্টোরি।'

'কী সুন্দর দেখাচ্ছে পুলটা। বৃষ্টির মধ্যে? একটা হাঁস থাকলে বলা যেত সোয়ান লেক, তাই না?' বলে পিনাকী মানালির দিকে চেয়ে দেঁতো হাসি হাসে। ভাবখানা, কেমন দিলাম! অ্যাপ্রিসিয়েট কর! নিকুচি করেছে তোর 'সুন্দর'-এর। সুন্দর তো অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউন। এ-ভাবে লাতাড়ে 'সুন্দর' বলে যেতে তো তোর পিওন কাশিনাথও পারে। আরে বাবা, কী সুন্দর, কেন সুন্দর এ-সব বল্। ঝেড়ে কাশ। তবে তো বুঝব। বলি। নাউনটা কী। তুই যখন বলিস, 'মানালি, তুমি কী সুন্দর।' তখন কি আমার পাছায় হাত বোলাস না? অর্থাৎ নাউনে।

সে এ-ভাবে ভাবতে শিখেছিল শান্তনুর কাছে। শান্তনু তাকে বলেছিল, সৌন্দর্যের জন্য প্রকৃতির দ্বারস্থ হবার দরকার নেই। ওর গুরু কে-এক কমলকুমার মজুমদার নাকি খালাসিটোলার দেশি মদের দোকানে ওকে একদিন বলেছিলেন, ''নিজের দিকে তাকিয়ে, নিজের ডানহাত, নিজের বাঁ কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত বুলিয়ে বলবে,' আঃ, কী সুন্দর এই পৃথিবী!'' কেন যে চলে গেল ছেলেটা। বসন্তের কোকিল কেশে কেশে রক্ত তুলে মরে গেল, কেন যে।

'হাঁস না থাকলেও বলা যেত।' মানালি বলল, 'এই যে আপনি আমাকে কুলু বলে আদর করে ডাকেন, আর আমি সাড়াও দি, কিন্তু, আমি তো মানালি!' একটু চুপ করে থেকে লিপস্টিকের ঘোর রাম-রক্ত বক্র হাসি দিয়ে গুলে ঈষৎ পাতলা করে দিয়ে মানালি বিষণ্ণভাবে বলল, 'কনগ্রাচুলেট মি ইন এডভ্যান্স।'

'ফর হোয়াট?'

'আই অ্যাম গোয়িং টু জয়েন অ্যাজ আ রিপোর্টার ইন ইওর পেপার ফ্রম টো-মরো।'

'ও-হ্যাঁ। ইয়াস। ইয়া। ফর স্যিওর।'

'এম-ডি-কে সকালে বলেননি?'

'এতে এম-ডি-কে বলার কী আছে? এ তো আমার ডিসক্রেশান। মাই প্রেরোগেটিভ।'

'তা জানি। তবু...'

বাইরে সুইমিং পুলের ওপর অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। এই পুলটা কতবার দেখেছে পিনাকী, রোদে-বৃষ্টিতে বা আকাশে যখন মেঘ। শরতে সাদা মেঘের হাঁস ভেসে যেতে দেখেছে এর নীল জলে। আজ সে-দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বৃষ্টি-ঝাঁটে টগবগে সুইমিং পুলের ওপর বৃষ্টি পড়া থামিয়ে জলতল থেকে একটা আস্ত পূর্ণিমার চাঁদ উঠে এসে ভেসে উঠল অপর এক সুইমিং পুলের শান্ত-নীল জলে। এই নগ্ন নির্জন দৃশ্যটি উঠে এল সেই কবে ছাত্রজীবনে মাত্র একবার-পড়া গ্রাহাম গ্রিনের 'দা কমেডিয়ানস্' বইয়ের পাতা থেকে। পোর্ট-অফ-স্পেনের হোটেল প্লাজায় পূর্ণ চাঁদের টলটলে ছবি বুকে, সুইমিং পুলের ধারে, সে দেখল, ব্রিটিশ অ্যামবাসাডারের বদলে তার, পিনাকী ভাদুড়ির লাশ পড়ে আছে। হায়িতিতে তখন মধ্য রাত। জ্যোৎস্নায় প্লাবন। রেভোলিউশান।

ফ্রগ লেগস্ খতম হো গয়া। বেয়ারাকে আর এক প্লেট টেংরি-কাবাব দিতে বলে, পিনাকী হঠাৎ লক্ষ্য করার মতো সময়ও সে পায়নি। সুইমিং পুলে এখন আবার অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। মানালিকে সব খুলে বলবে নাকি পিনাকী? না, থাক। কাল অফিসে গিয়েই ত সব জানতে পারবে। মানালির আজ অফ্ ডে। আর পিনাকী 'অসুস্থ' বলে আজ আর অফিস গেল না। ফোন করে দিয়েছে। মানালি তাই জানে। আর একটা রাত, সাব-এডিটর থাক না এডিটরের বুকে। বরং, মনোরমার কাছে খবরটা যতদিন সম্ভব লুকিয়ে রাখতেই হবে। টাকাকড়ি যা পাবে, মাসছয়েক টের পাবে না মনোরমা।

বেয়ারা আবার একটা বড় পেগ দিয়ে গেল। বরফ দিয়ে গেল ঠেসেঠুসে। কোম্পানির

দেওয়া বাঁধানো দাঁত দিয়ে জোড়া স্ট্রতে, চোষার বদলে, স্পর্শাতুর চুম্বন করে আড়চোখে তাকিয়ে পিনাকী দেখল, তোড় অব্যাহত রেখে সুইমিং পুলের ওপর সমানে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। তবে পুলের ধারে-কাছে কোনও লাশ এখনো পড়ে নেই। না অ্যামবাসাডারের। না কোনও প্রাক্তন এডিটরের।

কেন্দ্রীয় শীততপ নিয়ন্ত্রণের অধীন হোটেল ময়ূরপুচ্ছ-এর এই নির্জন লবিতে এখন শীত-গ্রীষ্মও বলে কিছু নেই। কোথাও বিপ্লব নেই।

পদাবলী, ৩বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৮৮

ইতিহাসের ধারা

It is well-known that Goering sometimes entertained dressed as Nero and with his face made-up.

ওঁর শুধু একটাই দোষ, সত্যেশবাবুর। স্ত্রীর বোধবুদ্ধির ওপর ওঁর অগাধ বিশ্বাস। অবশ্য দোষ ধরলে তবেই। গুণ মনে করলে, তাও ভাবা যেতে পারে।

বোকা হোক, চালাক হোক, স্ত্রীর পরামর্শ কে না নেয়। এমনকি হাবা-কালা সহধর্মিণীর মতামতও, বিবেচনাসাপেক্ষে, গৃহীত হয়ে থাকে। এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু পরামর্শ নয়, মতামতও নয়। সত্যেশবাবুর শুধু স্ত্রীর সিদ্ধান্তগুলো শোনার অপেক্ষা ও অতঃপর অনুগত কর্মচারীর মতো, তাঁর কাজ বলতে, সেগুলো অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করা। একে যদি গুণ বলেন গুণ। দোষ বলেন দোষ।

পরদা-পছন্দ, ক্বচিৎ গয়নাগাটি, শাড়ি-ব্লাউজ, সাবান-তেল কি শাঁখা-সিঁদুর... স্যানিট্যারি ন্যাপকিনের ব্র্যান্ডের মতোই, এ-সব নিরঙ্কুশভাবে মেয়েলি ব্যাপার—সব বাড়িতে গৃহিণীদের কথাই এসব ব্যাপারে শেষ কথা। এহ্-বাহ্য মার্জিনাল ব্যাপার যেগুলো, যেমন ধরুন, বাচ্চা ইংলিশ বা বেঙ্গলি কোন মিডিয়ামে যাবে, পুজোর ছুটিতে কোথায় যাওয়া, বিয়েতে কারা কারা নিমন্ত্রিত হবে বা কার বিয়েতে কী উপহার, বাথরুমের মেঝেয় টালি না মোজায়েক, টালি হলে তার রঙ-বা কী—ফ্রিজ, আলমারি, টিভি-র মেক এ-সব তো আছেই—মায় কোন ছবি ঝুলবে কোন দেওয়ালে—এ-সবের ওপর স্ত্রীর কর্তৃত্বও কম-বেশি স্বীকৃত। অনেকেই লেডিজ সিটে বসে থাকা পুরুষের মতো দাবিদার সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্র এগুলো ছেড়ে দিয়ে থাকেন। এমনটাও হয়ে থাকে। কিন্তু, সত্যেশবাবুর কথা আলাদা। তিনি দাড়ি কাটার ব্লেড-ব্যাপারেও অর্ধাঙ্গিনীর অভিমত গ্রহণ করেন।

এক যে ছিল গাছ।
আর ছিল একটা ছেলে।

তাই বলে, সত্যেশবাবু কোনও অ্যানা-ত্যানা মানুষ নন। নন কোনও সাব-পোস্টাপিসের অন্ধকার উইনডোর মোহন-মারা কেরানি। তিনি মাধবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জাঁদরেল অধ্যাপক। তাঁর বই-গুদাম বা ড্রয়িংরুমে বসলে এমন ইম্প্রেশান হওয়া তেমন অস্বাভাবিক হবে না যে তিনি বুঝি অক্সফোর্ড কি কেমব্রিজের কোনও ইংরেজির অধ্যাপক।

কেননা, তাঁর বসার ঘরে যতগুলো আলমারি, যতগুলো র‍্যাক, সবই বই-এ ঠাসা এবং সব বই-ই ইংরেজি। একজন তরুণ কবি তাঁর কাছে এ-ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করলে পাইপে অগ্নিসংযোগ করতে করতে, ধোঁয়া টেনে ও ছেড়ে, তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, বিদেশি ভাষার ভাল বই না পড়ে বাংলা ভাষার খারাপ বই তিনি পড়বেন কেন। যুক্তিপূর্ণ কথা। সম্প্রসারণ করলে দাঁড়ায় : বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুর কেন পুষিব? বা, মেমের সঙ্গে যখন আমার শোবার সুযোগ রয়েছে তথা যে একবার শুয়েছে, সে দেশোয়ালি মেয়ের সঙ্গে শোয় কী করে? বাংলা নয়, তিনি তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক। ঘরে একটিও বাংলা বই না রাখার হক তাঁর আছে।

অপিচ, একেবারে অকৃতজ্ঞ যে তিনি, তা নয়। বাঙালি লেখকরা ছাইপাঁশ যা হোক কিছু লিখে রেখে গিয়েছিল এবং আজও শত লাঞ্ছনাতে চর্চা ছাড়েনি, সংস্কৃতের মতো উঠিয়ে দেয়নি ভাষাটি, তাঁর যাবতীয় করিৎকর্মের সঙ্গে যে এ-ভাষার একটা মাসতুত পিসে-সম্পর্ক রয়েছে তা তিনি একেবারে উড়িয়ে দেন না। তাই, অন্তত রবীন্দ্র-রচনাবলির বিশ্বভারতী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার-কৃত এডিশন দুটি এবং তৎসহ রবীন্দ্র-বিষয়ে লেখা খানপঞ্চাশেক বইসমেত একটি লম্বাটে র‍্যাক ড্রয়িংরুমে তাঁর আসনের ঠিক পিছনেই অনেকদিন ধরে দাঁড়িয়ে ছিল।

আসলে, আসল ঘটনা অন্য।

একদিন কী যে হল, কেন যে—ঝড় নেই, বাদল নেই, ঘুণও ধরেনি—রবীন্দ্র-সেলফটি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল কিনা তাঁরই মাথার ওপর! ভাগ্যিস, বাইরের কেউ ছিল না। সেদিন ঘাড় মটকে না গেলেও, গায়ের ব্যথা-ট্যথা সারতে বেশ দু-চার দিন সময় লেগেছিল। সেই থেকে বাংলা বই-এর বিদায়, ড্রয়িং রুম থেকে। যাই হোক, ওই কদিন স্ত্রী সুশ্বেতার পতিসেবা তাঁর কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

ছেলেটা দামাল।
গাছের ডাল থেকে ডালে
সে পড়ত ঝাঁপিয়ে
শুকনো ডালপালা ভেঙে যেত মটমট করে।
শুকনো যত পাতা, সে সবই ঝরিয়ে দিয়ে যেত।

হ্যাঁ, তা, যে-কথা আমরা বলছিলাম। স্ত্রীর ওপর তাঁর এই অবিচলিত আস্থা, এটি যে সম্পূর্ণ অ্যা-পোলিটিকাল তথা রাজনীতি-নিরপেক্ষ ছিল, তেমন মনে করলে কিন্তু আদ্যন্ত ঠিক ভাবা হবে না। বরং, একটুখানি ভুলই ভাবা হয়ে যাবে। অফিস-আদালতে যেমন ওপরঅলার দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ পাবার পর কাজ করে গেলে কখনও ছোট-চাকরি পাংচার হয় না, সত্যেশবাবুর ক্ষেত্রে ও এই নিশ্ছিদ্র আনুগত্য এসেছিল তেমনি একটা আত্মরক্ষা-প্রবণতা থেকেই। যে, কোথাও যদি কোনও ছন্দ-পতন হয়, যদি কিছু ফেঁসে যায় কোথাও কোনওদিন, বলা যাবে, আমার নয়, দোষ তোমারই। তুমি বলেছিলে! আর স্ত্রী যদি সারা জীবনে তর্জনী তুলে বারেকের জন্যে স্বামীকে দোষী সাব্যস্ত করতে না পারেন, তাহলে সত্যেশবাবুর অখণ্ড জীবন-চরিতকে ইংরেজিতে ইমম্যাকুলেট না বলে তুলনামূলক কীই-বা বলা যেতে পারে। কেননা, ও-রকম একটা সাহিত্য থাকলেও 'তুলনামূলক' নামে তো কোনও মানব-ভাষা নেই।

গাছের কিন্তু খুব পছন্দ।
এই বর্বর ছেলেটাকে।
যে তাকে ভাঙে, মোচড়ায়
তার ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে পড়ে
তাকে নাড়ে-চাড়ে।
গাছটা সারাদিন
হ্যা-পিত্যেশ করে বসে থাকে ছেলেটার জন্যে।

স্ত্রীর ওপর এই যে অটুট আস্থা সত্যেশবাবুর, তা দিনে দিনে বেড়েছে বই কমেনি। স্ত্রী-নির্দেশিত পথে চলে, কই, একটি বারের জন্যেও পা মচকায়নি তো তাঁর, কোনওদিন হোঁচট খাননি, পিছলে পড়েননি। বেশি দূরে যাবার দরকার কী। চেতলার পীতাম্বর ঘটক লেন ছেড়ে যোধপুর পার্কের এই দশতলায় লিফটে উঠে আসার ব্যাপারটা থেকে তপতী ত্রিপাঠী উইন-হাইমারকে ডজ করে তাঁর রিডার হওয়ার ব্যাপারটা—যে দিকে তাকাও, তাঁর জীবনের ছোট-বড় কোন সমস্যাটার শিকড় যে মূলরোম পর্যন্ত দূরদর্শিনীর সুবিবেচনা-সিঞ্চনে রসসিক্ত হয়নি।

তপতী জয়েন করতে চেয়েছিল মেরিল্যান্ডের জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির কাজ ছেড়ে। সে একেবারে যাকে বলে 'ঐ আসে, অতি ভৈরব হরষে' গোছের ব্যাপার। এই পড়ল বুঝি এসে। গেল বুঝি হাতছাড়া হয়ে রিডারশিপটা! প্রতিদিন রাতে তখন কে তাঁর মাথা চাবড়ে ঘুম পাড়াত? গত বিশ বছর ধরে যখন যেখানে গেছে, পার্টিতে, বিয়েতে, শ্রাদ্ধে, অন্নপ্রাশনে—স্বামীর কথা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে টেনে এনে সশ্রদ্ধ 'ওঁর মতো পণ্ডিত', 'ওঁর মতো বিদ্বান'—এ তো ছিল তার মুখের বলি। ভুবনেশ্বরী গার্লস কলেজের অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজির বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর্স রুমের কলিগদের দিকে চুড়ির ঝনাৎকারসহ 'ওঁর পাণ্ডিত্যের কাছে আমরা কেউ কিছু নয়, বুঝলেন?'—এ-কথা গত দশ-বার বছরে কতবার যে বলেছেন, তার হিসেব কেউ রাখেনি। মিনিবাসের কন্ডাক্টরকেও এমনকি, একদিন সে একথা জানাতে ভোলে নি—যখন সত্যেশবাবুর সঙ্গে সেই ছোকরার সামান্য বচসা হয়—যে তিনি কে। কন্ডাক্টর কার সঙ্গে কথা বলছে! আর যোধপুর পার্কের এই ফ্ল্যাট? ঠিকানা লেনে হলেও তাঁদের চেতলার বাসাবাড়িটা ছিল সেন্ট্রাল রোডের মুখেই। নতুন মালিক বিজয় ফতেপুরিয়ার নোটিশ পাবার পর পনের-বিশ হাজারে রফা করে সবাই উঠে গেল। কিন্তু, সুশ্বেতার কাছে পাকা খবর। কর্পোরেশনের মাল্টি স্টোরিড সেলে লোক পাঠিয়ে শুধু সে জেনেছে, মালিক বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট বানাবে আর বিক্রি করবে। এটাই তার কারবার। সে সত্যেশের ক্লাস-ফ্রেন্ড ব্যারিস্টার কৃপাসিন্ধু সেনকে সস্ত্রীক ডেকে এনে ডিনার খাইয়েছে ও পরামর্শ গ্রহণ করেছে। 'মাই ক্লায়েন্ট ডঃ সত্যেশ এন জোরদার (হবে জোয়ারদার) উড নট অ্যাকসেপ্ট এনথিং আদার দ্যান অ্যান আইডেনটিক্যাল অ্যাকোমোডেশান ইন সাউথ ক্যালকাটা...'

ডক্টর-ব্যারিস্টারে এই যুগলবন্দী, তৎসহ অধ্যাপিকার জোরদার তবলা-লহরা শুনতে শুনতে একটা সময়ে স্রেফ গুণমুগ্ধতাবশতা ফতেপুরিয়া ফণা নামায় ও তার যোধপুর পার্কের চার লাখ টাকার একটা ফ্ল্যাট তাদের দেড় লাখে ছেড়ে দেয়। সাধে সত্যেশবাবু 'আজ কোন জামাটা পরব গো', জানতে চান স্ত্রীর কাছে এবং জেনে, সেই পোশাকে বেরন।

বেশ কিছুদিন ছেলেটা আসে না।
তারপর এলে।
গাছ দেখল, সে একটু বড় হয়েছে।
'কী খোকা, এতদিন আসোনি যে!'
'আমরা গরিব', ছেলেটা মাথা নিচু করে বলল, 'আমি এক টুকরি ফল নেব তোমার? হাটে বিক্রি করব।'
গাছ বলল, 'আর-এ, কী মুশকিল। নাও না, যত খুশি। তুমি রোজ আসবে। আর এবার একটা বড় ঝুড়ি আনবে সঙ্গে, কেমন?'
ছেলেটা রোজ আসে। একদিন সব ফল গেল ফুরিয়ে। তারপর সে আর এল না।

তাই বলে, সত্যেশবাবুকে একেবারে ভিখারি-ভোলানাথ করে ছেড়ে দিয়েছে তার স্ত্রী, এমনটা ভাবলে একটুখানি ভুলই ভাবা হয়ে যাবে। বা, আদ্যন্ত ঠিক ভাবা হবে না। বস্তুত, তেমন হর-গৌরী সুশ্বেতা-সত্যেশ না। রাজ্যের হাতে অত অধিক ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া সত্ত্বেও ন্যাশনাল, মাল্টি-ন্যাশনাল বা ফরেন কোলাবরেশনের ব্যাপারে, মানে শিল্প-সংস্কৃতির ব্যাপারেই আর কী, তাঁর রয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা। এ-দিক থেকে স্বরাজ্যে তিনি স্বরাট। চাইকোভস্কির একটা বিশেষ মুভমেন্ট বোঝাতে বিদেশি লং-প্লেয়িং রেকর্ডের মাঝামাঝি অব্যর্থ থেড়ে তিনি পিন বসাতে পারেন এবং, ভালেরির অমুক কবিতাটি পিতা বাসুকীর মতো কীভাবে মাথায় ধরে আছে বিশ্বমানুষের জীবন-যন্ত্রণা, তা বুঝিতে দিতে পারেন, এলিয়ট থেকে করবিয়ের-লাফার্গ, ডুরেনমাট-দস্তয়েভস্কি ভায়া কাফকা অধুনাতন মার্কেজ-এর 'কলেরার দিনগুলিতে প্রেম'-এ তাঁর স্বচ্ছন্দ অবগাহন—তাঁর এ সবে মুগ্ধতা অন্তত ছাত্রছাত্রীদের তো চোখে-মুখে। এখানে, যেমন যখন তিনি টয়লেটে, সুশ্বেতা কখনও কড়া নাড়ে না। এ তাঁর একান্ত, ধ্যানমগ্ন, নিজের জগৎ। এইসব সাজানো-ছড়ানো বই, এইসব রেকর্ড—এরাই আমার সব', তিনি সুশ্বেতাকে জানিয়েছেন, 'এরাই আমি!' যত দিন গেছে, সুশ্বেতা তা ততই মেনে নিয়েছে।

যেমন, সম্প্রতি তিনি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ও রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারটা নিয়ে ডুবে আছেন। যে, দেহ-সম্পর্ক হয়েছিল, না হয়নি। তাঁর মতে, হয়েছিল। বিশেষত ওকাম্পোর জার্নাল যদি পড়া যায়...অবশ্য, ইন-বিটুইন-লাইনস কে আর তাঁর মতো পড়তে জানে?

এবার ছেলেটা এল বহুদিন পরে।
একদম যুবক হয়ে গেছে। কী দারুণ মানিয়েছে ঝকমকে কুঠারটি, তার পেশিবহুল কাঁধে!
'কী খোকা এতদিন কোথায় ছিলে?'
'আমি বিয়ে করব। আমার একটা ঘর চাই। আমার চাই তোমার ডালপালাগুলো।'
'বেশ তো, নাও না, যা তোমার লাগে।' গাছ বলল, 'কিন্তু, তুমি আসো না কেন আর?'
ডালপালাহীন শুধু কাণ্ড-সম্বল হয়ে গাছটা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে রইল।

সত্যেশবাবুর বিশ্বলোকে অনুমতিসাপেক্ষে মাঝে মাঝে প্রবেশাধিকার ছিল শুধু একজনের। সে সুশ্বেতার বৈমাত্রেয় বোন, সত্যেশবাবুর শ্যালিকা বাবলি। বাবলি,

তুলনামূলকের ফাইনালের ইয়ারে একাধারে তাঁর ছাত্রীও বটে। ছুটিছাটায় হস্টেল থেকে আসে। দিদির বাড়িতে কদিন কাটিয়ে যায়। এবার তো পুরো পুজোর ছুটিটাই থেকে গেল। সেই যা মাঝে-মধ্যে প্রশ্ন তোলে, 'কিন্তু জামাইবাবু, রবীন্দ্রনাথের তখন তেষট্টি—' 'তাতে কী', পাস্টোরাল সিম্ফনির রেকর্ড থেকে ধুলো ঝাড়া থামিয়ে ঘন ভ্রূ-জোড়া তুলে সত্যেশবাবুর বিদগ্ধ দৃষ্টিপাত বাবলির খোলা কোমরে এসে আটকে থাকে, 'পিকাসো যখন ফ্রাঁসোয়া জিলোর সঙ্গে, তখন তার বয়স কত?'

'বাহাত্তোর।' কোমরে কাপড় টেনে তাঁর শ্যালিকা নতুবা ছাত্রী ঠোঁট ফুলিয়ে হার মানে।

এইভাবে, একদিন, সত্যেশবাবুকে নিছক বহু বছরের অন্ধ-অভ্যাসবশতই স্ত্রীর কাছে সমাধানের আশায় একটি অভূতপূর্ব সমস্যা তুলে ধরতে হল।

'বাবলি ইজ প্রেগন্যান্ট'—একদিন এমত ঘোষণা করে তিনি দুগ্ধ-লোভী বাছুর-চোখে মা-গাভীর দিকে মুখ তোলেন। সুশ্বেতা অনার্সের খাতা দেখছিল! সে স্বামীর দিকে তাকায়। চুলের গুছি কপালে, রগের কাছ থেকে স্বেদধারা, হ্যাঁ, যা ভেবেছে, বেশ ক-পেগ টেনে এসেছেন। তাড়ার ওপর চশমা খুলে রেখে হালকা ভাবেই সে জানতে চাইল : 'হোয়াট ডু ইউ মিন?'

ঠিক যা আশা করেছিলেন। ঠিক এই অব্যর্থ মুহূর্তে ধুলো-ঝাড়া রেকর্ড থেকে তাঁর মনে আছড়ে পড়তে লাগল পাস্টোরাল সিম্ফনির নব-নতুন দোলা আর মুভমেন্ট, যখন কী বলছেন তা তাঁর আর মনে রইল না, পার্থিব সব ধরতাই-এর বাইরে এক অতল তন্ময়তার মধ্যেও তলিয়ে যেতে যেতে তিনি বলে গেলেন, যেন গান, 'ইয়াস, শী ইজ প্রেগনান্ট। মেরি স্টোপস ক্লিনিক কনফার্ম করেছে। অ্যান্ড আই অ্যাম', বুকে হাত রেখে, 'রেসপনসিবল ফর দ্যাট।'

'আই হ্যাড বীন হ্যাভিং অ্যান অ্যাফেয়ার উইথ হার ফর দা লাস্ট ওয়ান ইয়ার অ্যান্ড আ হাফ' এত বলে তিনি চোখ বুজলেন। চোখ বুজেই রইলেন। একেবারে ধ্যানস্থ।

বেশ কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। তারপর শুনলেন, তাঁর কাছে কে যেন, না কে-যেন তো নয়, সুশ্বেতা, না, সুশ্বেতা তো নয়, সুশ্বেতার সফেদ, থলথলে, বাঁজা শরীর তাঁর কাছে জানতে চাইছে, 'তুমি কী ডিভোর্স চাইছ?'

এরপর যখন সে এল, তখন তার মধ্যবয়স। তার কাঁধে সেই কুঠার।
'কী খোকা, এতকাল পরে যে। কী মনে করে?'
'আমার বয়স হয়েছে। আমি এবারর পৃথিবীটা দেখব। আমার চাই একটা নৌকো। তোমার কাণ্ডটা পেলে...'
'বেশ তো, নাও না। এতে হবে তো তোমার নৌকো?' গাছ জানতে চাইলে, 'তুমি কবে দেশে ফিরবে?' গুঁড়ি থেকে কাণ্ডটা কেটে নিয়ে ছেলেটা চলে গেল।

না-না, এ আমি ভাবতে পারি না। এ তুমি ভাবতে পারলে কী করে? আমি পারছি ভাবতে। ফ্ল্যাট আমার। কাল ভোরে উঠে এখানে আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সম্ভব হলে কালই, তুমি এ-বাড়ি থেকে বিদেয় হও। আমার বইপত্র? আমার রেকর্ড? কী বলছ তুমি? আমি তোমাকে এক মাসের নোটিশ দিচ্ছি। কিন্তু, আমার টাকাকড়ি তো সব তোমার নামে। তাছাড়া ফ্ল্যাটে আমার টাকাও আছে। আমি তোমাকে একটা চেক লিখে দেব, সুশ্বেতা বলল।

'না-না, শ্বেতা, এমন করো না।' সত্যেশবাবু দুহাতে, হাত নয়, সায়ার ফ্রিল তুলে স্ত্রীর

সফেদ গোদা পা-দুটি জড়িয়ে ধরলেন। আসলে, তিনি ও-ভাবে ছুঁতে চাইলেন সুশ্বেতার মন, যা তার শরীরের মতো অমনই সফেদ, থলথলে এবং বোধহয় বাঁজা। চোখ মুছে বললেন, 'তুমি এ-ভাবে ভেবো না প্লিজ। আমার জীবনের সব দায়দায়িত্ব চিরকাল তোমার হাতে। আমার ধারণা, আমাদের বিবাহিত জীবনটা অন্যরকম। আর সকলের থেকে সেটা আলাদা এই দিক থেকে যে, তুমি যখন যা বলেছ, যা চেয়েছ, আমি তাই করে গেছি। আমি সেই পথে চলেছি। আজ, আমার নিজের বলতে কোনও পথ আর নেই! ইউ কান্ট ডিজোন মি লাইক দিস, অ্যান্ড অ্যান্ট দিস এজ। আমি তোমাকে ছাড়া...

'জীবনে মাত্র একবার আমি তোমার কথা শুনিনি। তোমার পথে চলিনি। না-চলে কত বড় ভুল করেছি, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু তুমি আবার, এই শেষবার, এরও দায়িত্ব নাও'... বলতে বলতে স্ত্রীর পরম নির্ভরযোগ্য অতিপ্রশস্ত জঘনদেশে মাথা নামিয়ে রাখলেন সত্যেশবাবু। পাস্টোরাল সিম্ফনি থেকে একশত বছরের নিঃসঙ্গতার মূর্ছনায়, ওই, আবার আচ্ছন্ন হয়ে আসছে তাঁর মাথা, তিনি বুঝতে পারলেন, কিন্তু, তাঁর হাত থেকে লাইব্রেরি ফ্রেমের মাইনাস-১০ চশমাটা কখন যে খসে পড়ল তা টেরও পেলেন না।

সুশ্বেতা চশমাটা মেজে থেকে তুলে নিল। না, ভাঙেনি।

তারপর ঋতুর পরে ঋতু এল, গেল। বছরের পর বছর। ছেলেটা আর এল না। গাছ তার আশা ছেড়ে দিল। তার শুধু-গুঁড়িটার চারিধারে হাঁদাপ্রান্তর ততদিনে ফেটেফুটে চৌচির।

মাত্র দিন পনেরর জন্যে সত্যেশবাবু গিয়েছিলেন ঢেঙ্কানলে। ইনস্টিটিউট অফ স্টাডিজ ইন ডায়িং লিটারেচার-এর সেমিনারে আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা দিতে। রবীন্দ্রনাথ-ওকাম্পোর দেহতত্ত্বের ব্যাপারটা এবারেই চিরতরে সাব্যস্ত করে আসতে পারতেন, এত তথ্য-প্রমাণ ছিল তাঁর হাতে। কিন্তু, একটা জরুরি তারবার্তা পেয়ে সমাপ্তি-সংগীত না গেয়েই এবারের মতো তাঁকে ফিরে আসতে হল!

তারপর বহুবছর সে আর আসে না।
তারপর...সেই হাঁদাপ্রান্তরের সীমানায় এক মেঘমাশ্লিষ্ট সন্ধ্যায় তাকে দেখা গেল।
দূর থেকে দেখা গেল কাঁধে-কুঠার তার নির্মম স্যিলুয়েট।
ধীরে পায়ে, যেন পদধ্বনি গুনে, সে গাছের গুঁড়ির সামনে দাঁড়ায়। এখন তার সব চুল সাদা ফুরফুরে, দাঁতের অভাবে চোয়াল ঝুলে পড়েছে, তবু, এ কোন অলৌকিক উপায়ে আজও সে এত পেশিবহুল!

ইওর ওয়াইফ হ্যাজ কমিটেড সুইসাইড,বায় টেকিং অ্যান ওভারডোজ অফ স্লিপিং পিলস্। ক্যাচ দা নেকস্ট প্লেন।

একটু ভাববার সময় চাই সত্যেশবাবুর। একটু ধ্যানস্থ হবার সময়। তাই রাজধানীতে ফিরছেন। ট্রেন দিল্লি ছাড়ার পর, সেই বিকেল থেকে, একটিবারের জন্যেও চোখ খোলেন নি।তাঁর কোলের ওপর টেলিগ্রাম; তিনি বারবার টেলিগ্রামে হাত বোলাচ্ছেন। কখনও, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন জানালার ঘষা কাচে টায়ে-টায়ে ফুটে ওঠা আত্মপ্রকৃতির দিকে।

সুশ্বেতা আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু কেন? এমনটা তো ছিল না। একটা সমস্যা, অন্ধ

আনুগত্য থেকে, বলা যেতে পারে প্রাচীনতম সংস্কারবশত, তিনি সমাধানের আশায় তার সামনে উপস্থিত করেছিলেন যে বেশি ক্ষমতাবান, যে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তার কাছে। মানুষের ইতিহাস জুড়ে তো এমনটাই হয়ে এসেছে। বরাবরের মতো সুশ্বেতা এবারেও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বাবলির সন্তান আবোর্ট করাবার গুরুভার সে স্বয়ং কাঁধে তুলে নিয়েছিল। নার্সিং হোম ঠিক করেছিল সে নিজে। আফটার অল, সত্যেশবাবু তো যেতে পারেন না। তাছাড়া, তাঁর রয়েছে সেমিনার। তাঁর ঢেঙ্কানলে থাকাকালীন পক্ষকালের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে, সে কথা দিয়েছিল। সত্যেশবাবু, বিশ্বাস করেছিলেন তাঁর প্রিয় অভিভাবিকাকে।

ঘাড়ের কাছে প্রলম্বিত বাবরি দুহাতে টেনে ধরে সত্যেশবাবু বুঝতে চাইছেন 'কিন্তু, এ কী হল', 'কেন এমন হল', 'কী করে হল',—হেন সময় ভেস্টিবিউলের মাইক্রোফোন-চেন ঘোষণা করল, দা ট্রেন ইজ এনটারিং গাজিয়াবাদ। ঘোষণাটি শোনামাত্র সেই প্রত্যাশিত ঘটনাটি ঘটল যে জন্যে তিনি এতক্ষণ চোখ বুজেছিলেন। তাঁর একান্ত নিজের জগৎ, তাঁর ধ্যানের জগৎ, তাঁর কেন্দ্রীয় অনুশাসন থেকে তাঁকে রক্ষা করতে, তাঁর মাথার মধ্যে বেরিয়ে এল খোঁচা-খাওয়া বাসা থেকে ক্রুদ্ধ পিপীলিকা-শ্রেণীর মতো—বেটোফেন, মোৎসার্ট না চাইকোভস্কি ঠিক ধরতে পারলেন না—একসঙ্গে শত শত বেহালার সশস্ত্র সুর...অজানা, অশ্রুতপূর্ব সংঙঘধ্বনি, নতুন এক মুভমেন্ট। ইতালির ট্রাম্পেট, ফ্রান্সের টেলর ড্রাম, জার্মানির বিউগিল—সঙ্গে বাংলার ঢাক, শাঁখ ও উলু—মোৎসার্টের ম্যারেজ অফ ফিগারো-তে এ-জিনিস ছিল কি? গাজিয়াবাদ স্টেশনে ট্রেন ধীরে ধীরে থামল। প্রায় ঘণ্টা তিনেক বাদে সত্যেশবাবু এই প্রথম চোখ খুললেন। তাঁর মুখে অপরাধী বিস্ময়, ঠোঁটে বোধিপ্রাপ্ত বুদ্ধের নিরঞ্জন হাসি। আ-হ্যাঁ, তিনি বুঝতে পেরেছেন। ভাগ্যিস, সব খুইয়েও, কেন্দ্রীয় কেল্লাটির কর্তৃত্ব তিনি নিজের হাতে রেখেছিলেন! সেখান থেকে, সেই পর্বতচূড়া থেকে, একটি মাত্র তোপধ্বনি, মাত্র একটি বিদ্যুচ্চমক তাঁকে লহমায় বুঝিয়ে দিয়ে গেল, নাঃ, সে পারেনি। যে নিজে জন্ম দিতে পারেনি, সে কি পারে কখনও এক নবজন্মের গলা টিপে মারতে?

বড় গুরুদায়িত্বই তাকে দেওয়া হয়েছিল এবার, আহা। প্রিয় অভিভাবিকার প্রতি শেষে শ্রদ্ধায় বুকের দিকে ঝুঁকে পড়ল তাঁর মাথা। মাত্র একটি দীর্ঘশ্বাসে খালি হয়ে গেল বুক। সত্যি, সুশ্বেতার দুর্বলতাগুলো তাঁর চেয়ে বেশি আর কে জানে। জীবনধারা অক্ষুন্ন রাখতে, বাবলির সন্তানকে বাঁচাতে, সে নিজে সরে গেছে। শেষবারের মতো প্রমাণ করে গেছে, তার সিদ্ধান্তসমূহের ওপর সত্যেশবাবুর অবিচল আস্থা ছিল কত নির্ভরযোগ্য। কত অভ্রান্ত।

বাবলির সঙ্গে তাঁর বয়সের কত তফাত? কুড়ি? বাইশ? রবীন্দ্রনাথ-ওকাম্পোর ব্যবধানের তুলনায় তা তবুও কম। না, তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো ভুল করবেন না। তিনি রবীন্দ্রনাথ না, তার বয়স তেষট্টি নয়। বাহান্ন। তিনি সত্যেশ জোয়ারদার। তিনি বাবলিকে বিয়ে করবেন। তার সন্তানের পিতা হবেন। স্বেচ্ছামৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সুশ্বেতা তো তাঁকে সেই পথই দেখিয়ে দিয়ে গেছে। তিনি চিরকাল সুশ্বেতার পথে হেঁটেছেন। পরম নির্ভরযোগ্য প্রিয় অভিভাবিকার শেষ ইচ্ছা তিনি শেষবারের মতো অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। এমনকি মৃত্যুর পরেও, তর্জনী তুলে স্ত্রী তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করবে, তা তিনি হতে দেবেন না।

'কী খোকা, এতদিন পরে মনে পড়ল?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাছ বলল, 'কিন্তু, এখন

তো তোমাকে দেবার মতো আমার আর কিছু নেই।'

'আছে', কাঁধের কুঠার দুহাতে মাথার ওপর তুলে ধরে ছেলেটা বলল, 'আমি এবার তোমার শেকড়গুলো কেটে নেব।'

প্রতিক্ষণ, জুলাই ১৯৮৮

আইভি সোম হত্যামামলা (১৯৭৮) : একটি পোস্টমর্টেম

বাক্স রহস্য

রানীকুঠির বাজার ছাড়িয়ে পোল পার হয়ে, বাঁশদ্রোণির দিকে অনেকটা ভিতরে গেলে একটি মাটির গির্জা পরে। গির্জার পাশ দিয়ে সোজা চলে গেলে বোড়াল গ্রাম। (সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'র সুটিং হয়েছিল বলে গ্রামটির নাম আজ অপরিচিত নয়) গির্জা থেকে মাইল-দেড়েক বোড়ালের দিকে গেলে একটি কালভার্ট। তার নিচে দিয়ে বর্ষার জল ছোট নদীর মতো বহে চলেছে।

১৯৬৮ সালের ১৭ আগস্ট শেষরাতে কালভার্টের নিচে একটি টিনের কালো ট্রাঙ্ক দেখতে পায় রতনতনু ভক্ত নামে স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস থ্রি-র একটি ছেলে। সারারাত পেটের যন্ত্রণার পর, শেষরাতে, মা-র সঙ্গে প্রাতঃকৃত্যের প্রয়োজনে সে তাদের বাড়ি সংলগ্ন খাল-পাড়ে গিয়েছিল। শৌচকার্যের জন্যে জলে নেমে কালভার্টের নিচে সে ট্রাঙ্কটি দেখতে পায়। সে উঠে এসে তার মাকে বলে।

খবর পেয়ে বাবা শ্রীকাশীকান্ত ভক্ত (৪৯), ওই স্কুলের শিক্ষক, সেখানে আসেন। তিনি দেখেন, ট্রাঙ্কটি সদ্যই কেনা হয়েছে এবং আঙটায় পিতলের তালা, সেটিও ঝকঝক করছে। ভাল রকম কিছু প্রাপ্তির আশায় তাঁরা তিনজনে খুবই ভারী ট্রাঙ্কটি কোনওক্রমে বাড়িতে নিয়ে আসেন। তখন সবে আলো ফুটছে। অত ভোরে তাঁদের কোনও জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হয়নি। বাড়িও খালের ধারেই।

তালা ভেঙে আধ ইঞ্চি ফাঁক করেই কাশীবাবু ডালাটা নামিয়ে দেন। তারপর সোজা ছুটে যান স্থানীয় এম এল এ-র বাড়িতে।

ট্রাঙ্কের ভেতর মোচড়ানো-দোমড়ানো অবস্থায় এক যুবতীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। তার জিভটি প্রায় বিঘৎখানেক বেরিয়ে, দাঁতের চাপে কেটে ঝুলে আছে খানিকটা। মাথাটি কয়লা ভাঙা কিছু ভারী জিনিস দিয়ে (মুখের রক্ত-মাংসের সঙ্গে কয়লার গুঁড়া দেখে তাই অনুমান করা হয়) এমনভাবে থেঁতো করা যে চেনবার উপায় নেই। ট্রাঙ্কের নিচে তোয়ালে মোড়া একটি ছোট কপিকল ও খানিকটা প্লাস্টিকের দড়ি পাওয়া যায়।

লালবাজার স্পেশাল ব্রাঞ্চের (মার্ডার) তরুণ ইনস্পেক্টর কে পি (কামাখ্যাপ্রসাদ) সেন তদন্তের ভার পান। পোস্টমর্টেম ও অটোপসি রিপোর্ট এলে দেখা যায়, যুবতীর বয়স ২৫ এবং গলায় ফাঁস দিয়ে তাকে খুন করা হয়েছে। তার ডান কাঁধে একটি জন্ম-জড়ুল ছিল। এবং তাকে ১৬ আগস্ট কোনও একসময় খুন করা হয়।

ট্রাঙ্কে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বলতে কিছু পাওয়া যায়নি। এক সপরিবারে কাশীকান্তবাবুর ছাড়া। কিন্তু পুলিস তাঁদের আদৌ সন্দেহ করেনি।

কালভার্টের পাশে একটি লাইব্রেরি ফ্রেমের চশমা পাওয়া যায়। চশমাটি আনকোরা নতুন একটি কাচে +১০ ও অন্যটিতে +৮ পাওয়ার। ডাঁটিতে চশমার ব্র্যান্ডের নাম দেখে বউবাজারের দোকান থেকে দোকানে খোঁজাখুঁজি করে, গত ৬ মাসের মধ্যে ওই পাওয়ারের ১৩টি চশমা করিয়েছেন এমন ১৩ জনের নাম ও ঠিকানা মেলে। তাঁদের মধ্যে একজন গল্‌ফ ক্লাব রোডের শখের পক্ষী-বিশারদ ও ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রী সাধন চক্রবর্তী।

চশমাটি তাঁরই বলে দেখামাত্র তিনি স্বীকরে করে নেন ও 'দেখি দেখি' বলে তখুনি চশমাটি পরেন। ('এ আপনি কোথায় পেলেন?'—রেকর্ড।) কামাখ্যাবাবু টিপে-টাপে দেখলেন অধ্যাপকের মুখে বেশ ফিট করেছে চশমাটি। তাঁরই বটে। সাদা পোশাকে কামাখ্যাবাবু তখন তাঁকে তাঁর আইডেনটিটি কার্ড দেখান। এবং অনুমতি নিয়ে চশমাটি তাঁর কাছে রেখে দেন। ('না-না, এতে আপত্তির কী আছে?')

সাধনবাবুর নতুন চশমা হয়েছে ('স্ত্রীর পছন্দ')। এবার ছোট ছোট গোলাকার কাচের চশমা করিয়েছেন, এবার স্টিল ফ্রেমের। আরও কিছু প্রশ্নোত্তরের পর কামাখ্যাবাবু তাঁকে লালবাজারে আসতে বলেন। ('আমি প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে এসেছি'—কামাখ্যাবাবু। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আই উইশ ভেরি মাচ টু হেল্‌প ইউ আউট ইয়ং ম্যান, টু ড্রাইভ দা লাস্ট গ্রেন অফ ডাউট ফ্রম ইওর মাইন্ড।'—সাধনবাবু।)

জিজ্ঞাসাবাদের সময় সাধানবাবুর স্ত্রী বাসনাদেবী বলেন, ১৪ আগস্ট বিকেলবেলা বায়নাকুলার নিয়ে পাখি দেখতে সাধনবাবু ওদিকে গিয়েছিলেন। ওই দিকে লুপ্তপ্রায় জাতের দু-দুটি পক্ষী-দম্পতি দেখা গেছে, এই শুনে (হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওই কালভার্টে আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছিলাম'—সাধনবাবু।) চশমাটি উনি তবে ওখানেই ফেলে আসেন। ('যা ভুলো মন'—বাসনাদেবী)

খুবই বিশ্বাসযোগ্য কথা। পাখি বিষয়ে সাধনবাবুর একটি নির্ভরযোগ্য বই আছে। বস্তুত, তখন, একটি দৈনিকপত্রে 'ওপার বাংলার পাখি' নামে তিনি একটি নিয়মিত কলামও লিখছেন।

সাধনবাবু নামকরা লোক। একজন উপমন্ত্রীর সহপাঠী বন্ধু। বন্ধুবান্ধবদের কেউ সেক্রেটারি, কেউ স্টিল অথরিটির জেনারেল ম্যানেজার, একজন চিলির রাষ্ট্রদূত। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়লে যা হয় আর কি। লালবাজারে সসম্ভ্রমেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এটা-সেটা, এলোমেলো, অবাস্তব সব প্রশ্ন—দুঁদে পুলিস অফিসাররা প্রথমেই যেভাবে বিভ্রান্ত করে দেন। তারপর এক সময় কামাখ্যাবাবু ড্রয়ার খুলে সাধনবাবুর চশমাটি টেবিলের ওপর রাখেন।

'আপনি কত তারিখে ওদিকে গিয়েছিলেন বললেন?'

'১৪ আগস্ট।'

'বিকেলবেলা।'

'আ-হ্যাঁ।'

'কী কী পাখি দেখলেন?'

'ইন্টারেস্টিং বলতে ওই শা-বুলবুল যা দু-একটা আর হ্যাঁ, বেশ কয়েকটা ক্রশ-ব্রিড নতুন জাতের টুনটুনি।'

এবার টেপটা চালিয়ে দিলেন ইনসপেক্টর সেন। টেপ ঘুরে যাচ্ছে। দুজনেই চুপ।

যেন, তাঁর আর-কোনও প্রশ্ন নেই। সেন হঠাৎ জানতে চাইলেন, 'কিন্তু সেদিন, বিশেষ করে বিকেলবেলা তো মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল।'

ঘূর্ণ্যমান টেপ থেকে সাধনবাবু চোখ তুললেন না।

'এই দেখুন আপনার চশমা, আর এই দেখুন', একটা ফোটোগ্রাফ, টেবিলে রেখে, 'আপনার চশমার ছবি পেয়েই ছবি তোলান হয়। এই যে', ছবি উলটে, 'ফোটোগ্রাফারের সই, ডেট আর সময়।'

ছবি দেখার জন্যে সাধনবাবু একটু মুখ তুললে ইনসপেক্টর সেন এতক্ষণে হেসে বলেন, 'চশমাতে একফোঁটা বৃষ্টির দাগও ছিল না।'

অধ্যাপক চক্রবর্তীকে আর বাড়ি ফিরতে দেওয়া হয়নি। সেদিনই ভোররাতে তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তীকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

খুনের মোটিভ

জামিনের অযোগ্য বিবেচনা করে আদালতের নির্দেশে মোট ৬ মাস জেলে থাকাকালীন তদন্ত-কার্য সমাধা হয়। সরকারি উকিল আলিপুর কোর্টে দুদিন ধরে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট পেশ করেন। চক্রবর্তী দম্পতিকে দায়রায় সোর্পদ করা হয়।

বিখ্যাত ক্রিমিনাল প্র্যাকটিশনার শ্রী এম এল বাসু ও তাঁর দুজন সহকর্মী আসামীপক্ষে দাঁড়ান এবং সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন অ্যাডভোকেট প্যানেলের প্রধান শ্রীকেশব হালদার স্বয়ং। সেশন কোর্টে দু-বছর ধরে মামলা চলাকালীন ৮৮ জন সাক্ষ্য দেন, ২৯টি 'একজিবিট' আলাদতে পেশ করা হয়। সাক্ষী-সাবুদের জেরা করার সময় বহু অজানা তথ্য উদ্ঘাটিত হয়।

সেশন, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের তিনজন বিচারপতির তিনটি রায় পড়ে, বলা যেতে পারে 'অধ্যয়ন' করে, আমার সেসন জাজের রায়টিই সবচেয়ে মূল্যবান বলে মনে হয়েছে যদিও এটিই ছিল সংক্ষিপ্ততম, মাত্র ২২ পৃষ্ঠার। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের রায় ছিল যথাক্রমে ১০৩ ও ৭৫ পৃষ্ঠার, যদিও রায় দুটি পাঠ করতে উভয় বিচারপতির প্রায় একই সময় লেগেছিল—অর্থাৎ সারাদিন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন বেশ তোতলা।

যাই হোক, তিনজন বিচারপতিই খুনের 'মোটিভ' সম্পর্কে তিনরকম মতামতও দিয়েছিলেন এবং তিনজনেই স্বীকার করেন পুলিস-প্রদত্ত মোটিভ আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। ('সেক্স ম্যানিয়াক'।) খুনের মোটিভ সম্পর্কে সেশন কোর্টের বিচারপতি হিজ অনার জে এন বসাকই কিছুটা বুঝেছিলেন বলে আমার মনে হয়েছে। ('আমি জীবনে রায় দেবার আগে এবং পরেও একটি খুনের মোটিভ নিয়ে কখনো এমন দিনের পর দিন চিন্তাভাবনা করি নি।')

আবহসঙ্গীত

আইভি হত্যা মামলার (১৯৬৮) প্রধান আসামী অধ্যাপক শ্রীসাধনধন চক্রবর্তী ৫০ দশকের গোড়ায়, তৎকালীন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। ('সাধন ক্লাসে আসত সরস্বতীর মুটের মতো, দু-কাঁধে অন্তত ১০ খানা মোটা মোটা লাইব্রেরির

বই নিয়ে, মনে হত দেবী বুঝি ওর পিছনে পিছনে ক্লাসে ঢুকবেন। তখনই তার চোখে খুব মোটা কাচের চশমা, একটু কুঁজো, স্কলাররা যেমন হয়। অ্যাড্রেসড্ না হলে সে কারও সঙ্গে কথা বলত না : সাক্ষী শ্রীবীরেন্দ্রলাল ব্রহ্ম : কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং ইনসপেক্টর।) আসামীর বাবা হরিপ্রসাদ চক্রবর্তী ছিলেন খুলনার জেলা স্কুলের শিক্ষক। পার্টিশনের পর দমদমের দেবীনিবাস রোডে মামাশ্বশুরের বাড়িতে সপরিবারে ওঠেন। খুব তাড়াতাড়ি দমদমের মতিঝিল স্কুলে চাকরি পেয়ে প্রাইভেট রোডের কলোনিতে চলে যান।

এম-এ পড়ার সময়েই অমিত সেনের মেয়ে বাসনার সঙ্গে তাঁর লাইব্রেরিতে আলাপ। গোয়ালিনী-টাইপের গোলগাল, বাসনাকে দেখতে মোটেই ভাল ছিল না, লেখাপড়াতেও তথৈবচ, যে জন্য 'ইসলামিক হিস্ট্রি' ছাড়া সে আর-কিছুতে চান্স পায়নি। মাতৃহারা, একমাত্র সন্তান এই অচল আধুলিটিকে পসারহীন কিন্তু ফাঁটবাজ দূরদর্শী ব্যারিস্টার সেরা প্রজাপতি অফিস বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে চালাবার প্রয়াস করেন। সেশনে মামলা চলাকালীন, বালিগঞ্জের কমলা গার্লস স্কুলের সহপাঠিনী মৃদুলা সাহাকে (তখন তিন সন্তানের জননী) সাক্ষ্য দিতে রাঁচি থেকে আনা হলে তিনি বলেন :

মৃদুলা : মাসিমা মারা যাবার পর ফ্ল্যাট একদম খালি থাকত। স্কুল পালিয়ে প্রায়ই আমরা সারা দুপুর ওদের ফ্ল্যাটে কাটিয়েছি।

প্রশ্ন : বেডরুমে?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্র : দরজা বন্ধ করে?

উ : হ্যাঁ।

প্র : এক বিছানায়।

উ : হ্যাঁ। বাসনা হত সেলিম আর আমি আনারকলি। মেসোমশায়ের নাম আমরা দিয়েছিলাম 'আকবর'।

৫৯-এ ব্যারিস্টার সেন হঠাৎ জুতো পরতে পরতে স্ট্রোকে মারা গেলে, প্রায় কর্পদকহীনা, কুরূপা কিন্তু 'তবু আকর্ষণীয়া' বাসনা সেনকে বিয়ে করে সাধনধন ক্ষীরোদ মার্কেটের ওপর শ্বশুরের ফ্ল্যাটে ওঠেন। গল্‌ফ ক্লাবের ফ্ল্যাটে এসেছিলেন মাত্র মাস ছয়েক। জলার ধারে গল্‌ফ ক্লাবের ফ্ল্যাটটি একটেরে, ৩০টি ফ্ল্যাটের মাত্র তিন-চারজনের বেশি তখনও গৃহপ্রবেশ করেননি। কলেজ কো-অপারেটিভের বাড়ি, কলকাতায় তখন 'ওন ইওর ওন ফ্ল্যাট' সিস্টেম সবে চালু হয়েছে। প্রতিবেশী ফ্ল্যাট মালিকরা সকলেই অধ্যাপক। প্রতিবেশীদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় ওঁরা ছিলেন 'বিচিত্র দম্পতি'। রাতে 'প্রতিদিন দুজনে মদ্যপান করতেন।' সকালের দিকে শোনা যেত ভাঙচুরের প্রবল শব্দ। শ্রীমতী সেন মর্নিং কলেজে পড়ান। ১২টা নাগাদ তিনি যখন ফেরেন, স্বামী কলেজে চলে গেছেন। তাঁরে বে-আইনিভাবে সংগৃহীত একটি মূল্যবান দু-টুকোর কোনারক-ভাস্কর্য রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ফ্ল্যাটে যেতে দেখা গেছে, যা তাঁর স্বামী কাচের জানালার মধ্য দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেন। এই ভাঙচুর করাটা তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। পুলিস তাঁদের স্টোররুমে ঢুকে ছেঁড়া শাড়ি, সায়া ও ব্রেসিয়ার, ছেঁড়া শেক্সপিয়র (অখণ্ড) সহ বহু মূল্যবান বই, ছুরি দিয়ে শত ছিন্ন করা কাটা 'এ গার্ল উইথ এ হর্স টেল' (পিকাসো: কপি) ও একটি যামিনী রায় (মা ও ছেলে : কপি)—বাঁকুড়ার ঘোড়া ও পুরুলিয়ার মুখোশ ইত্যাদি পায়—সবই টুকরো টুকরো। অথচ, প্রতি সন্ধ্যায় স্বামী-স্ত্রীকে মুখোমুখি বেতের চেয়ারে বারান্দায় দেখা যেত টানা ২-৩ ঘণ্টা : মদ্যপান করছেন।

চাবি দেওয়া ড্রয়ারে সাধনবাবুর একটি ডায়েরি পাওয়া যায়। এন্ট্রি ১৯৬৭ সালের গোড়া থেকে।

'২১-২-৬৭। না, আইভির বুকের প্যাচটা জন্ম-জড়ুল। আজ আইভিকে স্পেশালিস্ট দেখালাম। ক-দিন আগে আইভির সঙ্গে ব্ল্যাকবার্ন লেনের তা-ফা-হ্সুন-এ সারাদুপুর'। (এখন হোটেল কুঙ্গা : লেখক) আইভি বলল, 'দেখুন স্যার, আমার বাবা নেই, বলার মতো কেউ নেই। তাই আপনাকে বলছি। আমার চামড়ায় একটা লালরঙের প্যাচ দেখা গেছে। আপনি কি কোনও স্পেশালিস্টকে চেনেন?'

আমি : স্কিন স্পেশালিস্ট?

আইভি : না। অসুখটা... অসুখটার নাম 'L' দিয়ে।

—লিউকোডারমা?

—না স্যার।

—লিউকোমিয়া?

—না। 'এল' দিয়ে আর একটা অসুখ বলুন। লেপ্...

—রোসি?!

আমি আঁতকে উঠলাম।

—কোথায়?

সে আপনাকে দেখানো যাবে না।

—কোথায়?

—বুকে।

'লজ্জা করতে হবে না আইভি। যদি সত্যিই বাবার মতো মনে করো' অসীম পিতৃস্নেহ থেকে আমি তাকে বলেছিলাম, 'তবে দেখাও। আমিও তো কিছুটা বুঝব।'

'আইভি প্রথম বোতামটা খুলল। তারপর আর কিছুতেই পারে না। আমি উঠে গিয়ে বাকি দুটি খুললাম। সত্যিই, বাম স্তনের ওপর হালকা লালচে প্যাচ একটা, বিঘৎ খানেক,ঠিক একটা নৌকোর মতো। হঠাৎ বানের সময় মোহনা দিয়ে ঢোকা দুটি জলস্তম্ভের আকার নিল তার স্তনদুটি, আমি দেখলাম, তরঙ্গের মাথায় টলমলে একটি লাল নৌকো। ধ্বংস হবার আগে আমি মাথা নিচু করে সেই জল-তোড়ের মধ্যে ঝাঁপ দিলাম। মুহূর্তে আমাদের পিতাপুত্রীর সম্পর্ক বদলে গেল।'

'৬-৫-৬৭। গলিতে টিউবওয়েল বসছে। ভারার উপর আজ বিকেলবেলা দেখলাম একটা দুধরাজ বসে। দুধরাজের এত্ত লম্বা ল্যাজ আমি আগে দেখিনি। তা, ৮ ইঞ্চি তো হবেই। পেট আর গলা ছাই-রঙা, নিচের দিকটা লালে-বেগুনিতে। সরু থেকে মোটা ছাইরঙা ল্যাজের ওপর আড়াআড়িভাবে কালো পট্টি চার-পাঁচটা। দুধরাজ না সিবিয়া?'

'১৮-৯-৬৭। আজ মহরমের ছুটি। আজ সকালে বাসনার সঙ্গে ঝগড়া নয়, মারামারি। বাসনা ভেবেছে কী? রবীন্দ্রভারতী ভাইসচ্যান্সেলর পদের জন্যে আমাকে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে তদ্বির করতে যেতে বলেছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়েছে; যখন পার্টি ভাগ হয়নি সে ছিল আমার কমরেড, তা বলে রমেনের কাছে তদ্বির করতে—ছিঃ! আসলে বাসনা চায় গাড়িটা। কিন্তু, আমি আরও রেসপেক্টবল হতে চাই না। রেসপেক্টিবিলিটি ইজ আ প্রিজন!'...

'চোপ! আর একটা কথা বলেছ কি—' বলে দুহাতে টেপ রেকর্ডরটা (টেলিফাঙ্কেন)

তুলে আমি আছড়ে ভাঙার ইঙ্গিত করলাম। কথা বলল না বাসনা, কিন্তু তার চেয়েও যা বেশি, দেখি-না-মুরোদ-কত চোখে দাঁড়িয়ে রইল। এত স্পর্ধা! আমি আছাড় মারলাম না। কিন্তু, তার চেয়েও যা বেশি, হাত দুটো রেকর্ডার থেকে খুলে নিলাম। খান-খান হয়ে ভেঙে গেল আমার প্রাণাধিক জিনিসটা।

অন্যান্য কয়েকটি এন্ট্রি—

'২৮-১০-৬৭। আইভির কাছে ৭ দিন ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়ে পুজোয় বাসনার সঙ্গে চাইবাসা ঘুরে এলাম। (১৯।১০ থেকে ২৬।১০)। ২৪ আর ২৫ গভীর জঙ্গলের মধ্যে টিলার ওপর বরাইবুরুর বাঙলোয়। নিচে কারো নদী। ওপারেও জঙ্গল। ভাল লাগল না। সন্ধেবেলা দেখি একটা ময়ূরী এসে বারান্দায় পায়চারি করছে। আইভির কথা মনে পড়ল। যদি আইভি থাকত বাসনার বদলে? তাহলে হয়ত অনেক বেশি শরীর হত। আইভি হয়ত, হয়ত কেন নিশ্চয়ই, ন্যাংটো হয়ে আমার সঙ্গে স্নান করতে রাজি হত ওই কারো নদীর ঝকমকে জলে। কিন্তু, তাহলেও কিছু হত না। ৭ দিনের প্যাগানিজমে মুক্তি নেই।

ভাল লাগল না। অথচ, আমার সময় সে কী ছটপটানি! যেন বরবাদ হয়ে যাবে জীবন, অরণ্যে-বাঙলোয় কদিন না কাটালে। কিছুই তো হল না। কিছু তো হয় না। হোয়ার ইজ দ্য মাইন্ড? মন সহযোগিতা না করলে কিছু হাবর নয়।'

'১০-২-৬৮। কাল ছিল আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদ না-করার দশম বার্ষিকী। শুতে যাবার আগে বাসনাকে বললাম, 'কেমন মজা দেখলে বাসনা?' বাসনা বলল, 'কীসের মজা?' আমি বললাম, 'এই যে, দশ-দশটা বছর কেটে গেল আমাদের বিবাহিত জীবনের, অথচ ভালবাসার কোনও দারকারই হল না।'

'৫-৮-৬৮। আইভি ভালবাসতে পারে। সে আমাকে ভালবাসে। আইভি আমাকে সত্যিই 'সব' দিয়েছে। তবু আমার ঝুলি খালি কেন? তবু 'আমি' কিছুই পাইনি।' কেননা আইভির ভালবাসা আমাকে ভালবাসার আরও-বাইরে ছুঁড়ে দিয়েছে।

আইভি একটা সরকারি ফ্ল্যাট পেয়েছে। হস্টেল ছেড়ে সে সেখানে উঠে যেতে চায়। নিয়ে যেতে চাইছে আমাকে। ভালবাসা পেলে মানুষ 'সব পেয়েছি'কে পায়। কিন্তু, আমি তো কিছুই পেলাম না! বাসনার কাছে যা পাইনি তা আইভির কাছে পেতে গিয়ে আমি দেখছি এ তো কিছুই-না, আমার আরোগ্যের ওষুধ তো 'এ' নয়। ভালবাসা 'ভাল', গ্রহণ করার মতো মনটা আমার কই? নেই। কিন্তু আইভির সঙ্গে এতদূর এসে, কৌমার্যসহ তার শরীর, সর্বস্ব লুণ্ঠন করে, এ-কথা তো তাকে আজ বলা যায় না। পৃথিবীর কোন মেয়ে মানুষ এটা বুঝতে চাইবে যে নারীর-প্রেমের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। সব উৎস শুকিয়ে গেছে।'

'৮-৮-৬৮। The best relation between a man and a woman is that of the murderer and the murdered. Who said that? Dostoievsky's krilov or Durenmat's Herr M.?'

'৬-৮-৬৮। আমাদের রোজকার কোটা এক-পাঁইট রামের শিশিটা অনেকক্ষণ ফুরিয়ে গেছে। টেবিলে পাশাপাশি দুটি শূন্য গ্লাস। বাসনার হাত দুটি ধরে আমি তাকে বললাম, 'বাসনা, তোমাকে ছেড়ে নতুন 'ভাল'-র সন্ধানে আমি যেতে চাই না। তুমি আমাকে বাঁচাও।'

ডায়েরির শেষ এন্ট্রি—

'১২-৮-৬৮। আসবে বলেছে। দুপুরে। আগের দিন আমরা যাব। দুটি বোরখা ও ক (কপিকল?—লেখক।) জোগাড় হয়েছে।'

জাস্টিস বসাক তাঁর রায়ে এক জায়গায় অবজার্ভ করেছেন, 'ভালবাসা গ্রহণ করার মতো মন আর না থাকলেও, বেদনা ও দুঃখকে গ্রহণ করার মতো মন আসামীর ছিল। সে দাঁড়িয়ে ছিল সীমারেখায়। দু-নম্বর আসামী বাসনা চক্রবর্তীর দ্বারা প্ররোচিত না হলে সে হয়ত আইভি সোমকে খুন করত না।' যথার্থ!

নায়িকার প্রবেশ ও প্রস্থান

ডায়মন্ডহারবারে গঙ্গার ধারে একটি নির্জন দোতলা হোটেল। নাম 'মোহিনী'। তখন ডায়মন্ডহারবারে কাজে-কর্মে ছাড়া কেউ যেত না, অন্তত ফূর্তি করতে। 'সাগরিকা' হবার কিছুকাল পরে হোটেলটি উঠে যায়। এখন নার্সিং হোম হয়েছে।

অনেক খোঁজ খবর নিয়ে, ওই হোটেলে সাধনধন ১৬ আগস্ট, সোমবার, দুপুরবেলায় ১নং ঘরে আইভিকে আসতে বলেন। ('সেলিম আখতার নামে বুক করব। এক সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে না। অবশ্যই বোরখা পরে আসবে। আফটার-অল, তুমি আমার ছাত্রী': হাত চিঠি।) আগের দিন, ১৫ আগস্ট বিকেলবেলা, শেরোয়ানি-পাঞ্জাবি পরা সেলিম আখতার ও তাঁর স্ত্রী (বোরখা পরিহিতা) মোহিনী হোটেলের এক নম্বর ঘরে আসেন। সঙ্গে ছিল একটি কালোরঙের ট্রাঙ্ক। পরদিন দুপুরবেলা বোরখা পরে আইভি যখন রিকশা থেকে নামে, হোটেলের ম্যানেজার তখন ঘুমুচ্ছিলেন। এবং কুক বলরাম ছাড়া তাকে কেউ দেখেনি। সে ভেবেছিল, সাহেবের বউ-ই বোধহয় কোথাও থেকে ঘুরে-টুরে এলেন। ১নং ঘর সেই দেখিয়ে দিয়েছিল।

আইভি এলে, দরজা বন্ধ করে, সাধনধন তাকে একটি সুন্দর হাউসকোট উপহার দেন (নিউ মার্কেটের 'মঞ্জু-লা'র সেলসম্যান হায়দার আলি সেটি ও ক্রেতা সাধনবাবুকে শনাক্ত করে) এবং বাথরুম থেকে পরে আসতে বলেন। হাউস কোটে বেল্টটি লাগান ছিল না। বাথরুম থেকে একেবারে স্নান-টান করে শুধু হাউসকোট পরে বেরিয়ে আইভি বেল্টটি চায়। অধ্যাপক চক্রবর্তী বেল্টটি নিজের হাতে তার কোমরে লাগিয়ে দিতে গিয়ে, না লাগিয়ে, যেন বরমাল্য পরিয়ে দিচ্ছেন, এমনভাবে (ধরা যেতে পারে সাদরে ও সহাস্যে) তার গলায় পরিয়ে দেন ও তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। চুম্বন করতে করতে তিনি তাকে নিয়ে যান গঙ্গার দিকে দেওয়াল-জোড়া কাচের জানালার ধারে। লিনটেল জুড়ে ভারী পরদার ধারে অন্ধকারে ঝুলছিল একটি প্লাসটিকের দড়ি, তার ডগায় আঙটা। আইভির গলায় পরানো বেল্টের হুকটা তিনি আঙটায় লাগিয়ে দেন। পরদার পিছনে অধ্যাপক পত্নী আধ ঘণ্টা ধরে ঘামছিলেন। ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র তিনি দড়ি ধরে ঝুলে পড়েন। আইভি 'টুঁ' শব্দ পর্যন্ত করতে পারেনি। তারপর দুজনে মিলে দড়ি ধরে অনেকটা উঁচুতে টেনে তোলেন এবং আইভিকে অনেকক্ষণ শূন্যে ঝুলিয়ে রাখেন।

তার জিভ বেরিয়ে আসে। পায়ের পাতা লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ে। কপিকলটি লিনটেলের পিছনে ফিট করা হয়েছিল।

'খুন যখন হয়, তখন খুনীর কাছে পৃথিবীটা দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে থাকে খুন, অন্যদিকে বাকি পৃথিবী'—জাস্টিস জে এন বসাক তাঁর রায়ে এক জায়গায় লেখেন। এরপর বাকিটা খুনের নিয়মেই ঘটে যায়। এবং সে সম্পর্কে বিস্তৃত কিছু না বলাই ভাল। সাধনবাবু একটি আন্ডারওয়্যার পরে মুখ থেতো করার কাজটি করেন। ('আমি বাথরুমে পালিয়ে যাই'—বাসনা চক্রবর্তী।) এ-জন্য ব্যবহৃত থান ইটটি ছিল হোটেলের রান্নাঘরের

সামনে কয়লার স্তূপে বেড়া দেবার জন্য ইটগুলির একটি, পরে সেটি খাপে খাপে মিলে যায়। হোটেলের জানালার ধারে ঝোপের মধ্যে যে তোয়ালে দিয়ে মোড়া অবস্থায় ইটটি পাওয়া যায়, সেটিও হোটেলের বলে শনাক্ত হয়। থানইটে লেগে-থাকা রক্ত ও মাংসকুচি, বলাবাহুল্য, ছিল আইভি সোমের।

হোটেল থেকে রিকশায় ডায়মন্ডহারবার স্টেশন। ভারী কালো ট্রাঙ্কটি রিকশঅলার সাহায্য নিয়ে তোলার সময় কুক বলরামের সন্দেহ হয়েছিল। ('মুই তখনি সন্দেহ করিলা কি টাঙ্কো এত্তা ভারি হইলা কেমতি'—বলরাম)। শিয়ালদহ থেকে ট্যাক্সি করে সোজা বাঁশদ্রোণি ছাড়িয়ে গড়িয়ার পথে কালভার্ট পর্যন্ত। তখন রাত এগারটা। মাঠের মধ্যে একটা দোতলা আলোজ্বলা বাড়ি। 'ওই বাড়ি' বলে টাক্সি থামান এবং ট্রাঙ্ক নামিয়ে ও সেকালে ১০টা বখশিস দিয়ে ড্রাইভারকে চলে যেতে বলেন। 'ভজা' 'ভজা' বলে বাড়িটির উদ্দেশে তিনি চাকরকে ডাকেন। ড্রাইভার বাঁকেবিহারী বর্মনের তাই সন্দেহ হয়নি।

খানিকটা পায়ে হেঁটে, কিছুটা রিকশায় সাধানবাবুরা বাঁশদ্রোণি বাজারে ফেরেন। সেখান থেকে ট্যাক্সিতে গলফ ক্লাব রোডে।

মানুষ খুন করে কেন?

মানুষের মানুষ খুন করার মতো স্টুপিড কাজ আর হয় না। পৃথিবীতে প্রতি মিনিটে একটি করে খুন হয়। প্রায় সবগুলিই হঠাৎ উত্তেজনার বশে, শতকরা ৯৫ ভাগ। পৃথিবীর প্রায় সব খুনই এক : স্টুপিড! এবং এইসব খুন নিয়ে এমনকি, কিছু লেখাও গর্হিত, অমানবিক কাজ। 'কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু খুন হয়', জাস্টিস বসাক তাঁর রায়ে যেমন বলেছিলেন, 'যার মোটিভ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা, সমাজের মঙ্গলের জন্য ঠিক ততটাই জরুরি, আনাটমি জানার জন্য যতটা জরুরি বিজ্ঞানীর মড়াকাটা। এইসব খুনীদের আমাদের মতো মানবতাবাদী ফাঁসুড়েরা ('humanist executioners') ফাঁসি না দিলে, নিঃসন্দেহে এরা আর একটি খুন করত না। আইভি সোমের হত্যাকারী আসামী সাধনধন চক্রবর্তী পৃথিবীর সেই স্বল্প-সংখ্যক খুনীদের একজন'। বস্তুত, সেশান জাজ জাস্টিস জে এন বসাকের রায়টি প্রথমেই না পড়তে পেলে এই খুন সম্পর্কে তথা এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ হত না।

রায়টি মাত্র ২২ পৃষ্ঠার হলেও, এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের নায়ককে জাস্টিস বসাক চমৎকার বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর মতে, 'আসামী একালের মূল্যবোধহারা সমস্ত সর্বস্বান্ত মানুষের প্রতিনিধি। গরিবের মেধাবী ছেলে, বিয়ে হল চালিয়াত ব্যারিস্টারের মেয়ের সঙ্গে। বাবা-মা, ভাই, আইবুড়ো বোন দুঃস্থ আত্মীয়স্বজন সকলকে ছেড়ে সে ফ্ল্যাটে উঠে এল। কেন? না, সে ভালবাসবে। সে, ভালাবাসা পাবে। ১০ বছরের দাম্পত্যে তার বাঁজা স্ত্রী একের-পর-এক জন্ম দিয়ে গেল ফ্ল্যাট-ফ্রিজ ও টেলিফোন—শেষে একটি গাড়ির জন্ম দেবে বলে মন্ত্রীর কাছে তাকে পাঠাতে চাইল। ঠিক এইসময় এল কন্যা-সমা আইভি। সে কিছুই চাইল না। শুধু সর্বস্ব খুইয়ে তাকে ভালবাসল। কিন্তু আসামী দেখল, সে ভালবাসার 'বাইরে'। এই 'বাইরে' শব্দটা প্রয়োগ করতে গিয়ে আমি এখানে আলবের কামুর 'দা আউটসাইডার' গ্রন্থটিকে সাক্ষ্য দেববার জন্য ডাকি। আসামী তার ডায়েরিতে ডস্টইয়েভস্কির কিরিলোভ (দ্য ডেভিলস) ডুরেনমাটের হের এম-এর (দ্য প্লেগ) উল্লেখ করেছে। কিন্তু আমার মনে হয় 'দা আউট সাইডার'-এর নায়ক মারসোর সঙ্গেই তার

মেলে বেশি। সে হয়ত বইটি পড়েনি।... তবু, মারসোর তুলনায় অন্তত, কিছুটা 'ভিতরে' সে ছিল। অন্তত হত্যার পূর্বে তার এক বছরের ডায়েরি পড়ে তাই মনে হয়। তার অন্তত কিছুটা দুঃখ ও কিছু বেদনাবোধ অবশিষ্ট ছিল। সে পাখি ভালবাসত। বরাইবুরু যাবার জন্যে সে 'ছটপট' করত। তার জীবনে একরাশ ভালবাসা নিয়ে আইভি সোম এসেই তাকে সব মূল্যবোধের 'বাইরে' ঠেলে দিল। তার মৃত্যুদণ্ড আইভিই ঘোষণা করে গেছে।...

'গত দেড় বছর ধরে দিনের পর দিন কাঠগড়ায় এসে সে দাঁড়িয়েছে। আমি তার শূন্য, সর্বরিক্ত চাহনি লক্ষ্য করেছি। প্রায় কোনও প্রশ্নেরই সে জবাব দেয় নি। এবং যে-টুকু দিয়েছে, তা কত নিরাসক্তভাবে!

[অ্যাডভোকেট জোনারেল : আপনার আন্ডারউয়্যারে ১৮টি রক্তবিন্দু পাওয়া গেছে যা নিহত আইভি সোমের।

আসামী : নিরুত্তর।

অ্যা জে : এই থানইটে নিহতের রক্তমাংস পাওয়া গেছে।

আসামী (আনমনে) : হ্যাঁ, ওটা দিয়েই আমি তার মুখটা থেঁতো করি।

অ্যা জে : (বিচারকের প্রতি) ইওর অনার, অ্যাটেম্পট টু কনসিল এভিডেন্স। (আসামীর প্রতি :) কেন?

আসামী : নিরুত্তর।

অ্যা জে : (চিৎকার করে) আই সে, হোয়াই? হোয়াট ওয়াজ দা আইডিয়া?

আসামী : আমি তাকে খুন করেছি।

অ্যা জে : আপনি একা নন।

আসামী : হ্যাঁ আমি একা।]

১৮ পাতায় এসে দণ্ডদানের ঠিক প্রাক্কালে জাস্টিস বসাকের ভাষা স্পষ্টতা হারিয়ে ফেলে। দু-লাইনের ফাঁকগুলি পড়ে আমার অন্তত তাই মনে হয়েছে। তার রায়ের শেষ কটি প্যারাগ্রাফে ছিল এইরকম—

'আমি মানুষের ভালবাসায়, মানুষকে ভালাবাসায় বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি, যদি ভালবাসার, কোথাও কোনও মানুষের মনে, মৃত্যু হয়, তা সাময়িক। ভালবাসা আরও অব্যর্থ শক্তিকে তারই মনে আবার বেঁচে উঠবে। যারা খুন করে, হ্যাঁ, আমি তাদের ঘৃণা করি।'

'আসামী বাসনা চক্রবর্তীর অপরাধ সম্পর্কে আমার মনে কোনও দ্বিধা নেই। কিন্তু, আমার মনে একটা সংশয় থেকেই গেল যে আসামী সাধনধন চক্রবর্তী তারই প্রেম-ভিখারিণী আইভি সোমকে কি সত্যিই খুন করেছিল, না, এটা তারপক্ষে, একজন আউটসাইডার হিসেবে, ছিল আত্মহত্যা? যদি শেষোক্তটি সত্য হয়, তবে ঈশ্বর জানেন, সকল আত্মহত্যাকারী মানুষের কাছে যা পায়, সেই সহানুভূতিও করুণা আমার কাছেও সে পেতে পারত।...

'তবু, এটাই সত্যি যে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে আসামী সাধনধন ও বাসনা চক্রবর্তী পূর্বপরিকল্পনা মতো ঠান্ডা মাথায় খুনই করেছে। কেইন খুন করেছিল অ্যাবেলকে। কেউ খুন করলে সমাজে থাকার অধিকার তার আর থাকে না। কেইন পালিয়েছিল মরুভূমিতে। সেখানে মরে ছিল। আমাকেও তাই মৃতুদণ্ডই দিতে হবে।

'আমি, ৩৪ উপধারাসহ পঠিতব্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে আসামী সাধনধন ও বাসনা চক্রবর্তীকে মৃত্যু পর্যন্ত দড়িতে ঝুলিয়ে রেখে ফাঁসির আদেশ দিচ্ছি। আসামী সাধনধন চক্রবর্তীর মৃত্যু-পর আত্মার জন্য আমি সেই সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে অগ্রিম

শান্তি-কামান জানাই।'

২২ পৃষ্ঠাব্যাপী রায়ের এখানেই শেষ। রাষ্ট্রপতির কাছে সাধন চক্রবর্তীর পিতা অশীতিপর শ্রীহরিপ্রসাদ চক্রবর্তীর ক্ষমা-আবেদন নামঞ্জুর হবার পর ১৯৭২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্সি জেলে, ভোর রাত্রে, সাধনধন ও বাসনা চক্রবর্তীর আধ ঘণ্টা আগে পরে ফাঁস হয়। ফাঁসর মঞ্চের দিকে যাবার সময় সাধনধনের কোনও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। কিন্তু, বাসনা চক্রবর্তী ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। তাঁকে নাকি অজ্ঞান অবস্থাতেই ফাঁস দেওয়া হয়।

থ্রিলার : গল্পটি কল্পনাপ্রসূত
আজকাল, ১৯৮৭

আঁধার রাতের কল্লোল

অন্যান্য মহকুমা শহরের সঙ্গে রামপুরহাটের একটু তফাত আছে। এমনিতে তেমন কিছু না। স্টেশন থেকে বেরলে সেই রিকশার ভঁক-পঁক, টেম্পো আর অটোর কিলবিল। খোঁয়াড়ে বাসের গুঁতোগুঁতি। ছাদভরতি মাল ও মানুষ। বাস যখন শহরের মধ্যে দিয়ে যায়, বৈশিষ্ট্য বলতে তখনও কিছু চোখে পড়ে না।

স্টেশন এলাকা পেরিয়ে প্রথমে রেল-কোয়ার্টার্স, তারপর কোর্ট-কাছারি স্কুল আর কলেজ, অব্যবহৃত রবীন্দ্রসদন। দোচালা মিষ্টির দোকানের সামনে কেলেকুলো বেঞ্চি। পথের ধারে কলাপাতার ওপর শোয়ানো পেঁকো পুকুরের বোকা কাতলা, সামনে রুখুসুখু মেছুনী। সর্বত্র যা। সিনেমা হলের নাম ওয়েস্টার্ন টকিজ।

নতুনত্ব বলতে, বহরমপুরে রিলে সেন্টার খোলার পর, এদান্তি কিছু কিছু ছাদে বুস্টারসহ টিভি-র অ্যান্টেনা দেখা দিয়েছে, এই যা। এ সবেরই মধ্যে দিয়ে ধুলোভরা সরু পথ জুড়ে দুমকাগামী গতরজব্দ বাস চলে হেলেদুলে। যেন, স্বাধীকারপ্রমত্ত ষাঁড়। কাশীর।

তবে, এহ্ বাহ্য। অন্তত, রামপুরহাটের ক্ষেত্রে। কেননা, শহরের পশ্চিমদিকে ছ-ফুঁকো নামক রেল-টানেল থেকে একবার বেরলেই পরিবেশ আবহাওয়া সব যেন কেমন জাদুবলে হঠাৎ বিলকুল পালটে যায়। আরও পাঁচশ গজ এগিয়ে ব্রাহ্মণী নদীর খাল। এবং এই খাল-পোলটা পেরলে এ রামপুরহাট—বৈশিষ্ট্য চোখে না পড়েই পারে না যে, সারা পশ্চিমবঙ্গে হয়ত এই একটিই শহর, যার শহরতলি বলে কিছু নেই। বা, থাকলে, তা একটি সুদীর্ঘ এবং ঝকঝকে, অম্লান চিত্র প্রদর্শনী!

৪০ মাইল দূরে সেই দুমকা পর্যন্ত ধুলোকাঁকরহীন, চিক্কণ, কুচকুচে কালো পিচের রাস্তা। আঁক-বাঁক নেই, অনর্গল, এক্কেবারে নাকবরাবর সোজা। রাস্তার দুধার দিয়ে টানা লালমাটির বর্ডার। আর, দুইদিকে—দুই দিগন্ত পর্যন্ত, যতদূর দু-চোখ যায়—উঁচু নিচু, হাঁদা ল্যাটেরাইট, জমি শুধু। চাষবাষ হয় না, তাই আল বলে কিছু চোখে পড়ে না কোথাও। যেজন্যে, গ্রামগুলিও দূর দিগন্তরেখায় সরে গেছে। শুধু শালবন মাঝে-মাঝে, টিলা। নিরবধি সময়, জোরালো হাওয়া আর অনুর্বর বাঁজা জমি। ক্কচিৎ, গির্জার রক্তিম মুণ্ড দেখা যায়। ছানার জলের মতো নীল আকাশের গায়ে, এছাড়া কিছু, কোনও অ্যান্টেনা, কোথাও

চোখে পড়ে না।

১০ মাইল দূরে প্রথম বাঁশের বেড়া—বিহার বাংলা বর্ডার। এরপর এক কিলোমিটার ভারত-সরকারের জমি—নো ম্যানস ল্যান্ড। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এখানে এয়ারফোর্সের একটি ছোট্ট স্ট্রিপ ছিল। এখানে বাস দাঁড়ায়। এখান থেকে শুরু বড়-বড় টিলার। সিঙ্গারসি পাহাড় দেখা যায়।

এখানেই, বিশেষত সকালবেলায় 'বিজয় ভারত' বাসে উঠলে, কন্ডাক্টর-কাম-মালিক মিছরিলালজী বাসযাত্রীদের উদ্দেশ্যে এখনো হেঁকে ওঠেন, 'জয় জয় বাবা অম্বিকা মহারাজ কী—'

বাঙালি-বিহারী-আদিবাসী নির্বিশেষে যাত্রীরা বলে ওঠেন, 'জয়!'

অম্বিকা মহারাজ আজও এ-পথের দেবতা।

জায়গাটির নাম সুরুচুয়া। এরপর থেকে, না-ঘরকা না ঘাটকা বলেই হয়ত, সামনে এক মাইল জুড়ে কাচপাহাড়ির ভারি জঙ্গল। যাত্রীরা যখন সামনের দিকে তাকিয়ে পথের দেবতার উদ্দেশে হাত জোড় করেন, তখন, সেদিকে তাকালে দেখা যায়, দূরে, ঘন জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে সম্ভবত কোনও টিলার ওপর—না, কোনও মন্দির-চূড়া নয়—নয় কোনও ত্রিশূল—নীল আকাশের গায়ে একটি দুর্বোধ্য জ্যামিতির চিহ্ন আঁকা রয়েছে; একটি সুউচ্চ অ্যান্টেনা।

কাচপাহাড়ির জঙ্গল-মহলের মাঝখানে ওই বিশাল অ্যান্টেনাটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৭৯ সালে। একটি পুঁচকে ১৪ ইঞ্চি টিভি-র জন্যে, যদিও নির্ভেজাল 'সোনি'।

আসলে, সবটাই ভিকি-র ভুল। কাচপাহাড়ি? ভিকি ভেবেছিল, সে আর কত ছোট জায়গা হতে পারে? সান্টা ফে হোক, সান হোজে হোক, মডেরা হোক—হোয়াইট গেট হোক—আর কত ছোট হবে? সেই খুব ছোটবেলায় একবার যা ইন্ডিয়ায় এসেছিল। ছিল দিল্লি আর বম্বেতে। সে আর জানবে কী করে, যে, কলকাতাতেই টিভি এসেছে মাত্র কবছর আগে। আর খোদ রামপুরহাটে ইলেকট্রিক এসেছে স্বাধীনতার পর সে বেশ কিছু বছর গত হবার পরেই।

তবে, ৫ হোক, ১৪ হোক, ২০ ইঞ্চি হোক, অ্যান্টেনা তো একই।

তখনও বহরমপুর কি আসানসোলে রিলে সেন্টারের কথা সরকারের মস্তিষ্কেও আসে নি। টানা সাত দিনের চেষ্টায় রামপুরহাট থেকে জিনিসপত্র আনিয়ে সে নিজের হাতে বহু-বুস্টার লাঞ্ছিত ওই বিশাল অ্যান্টেনাটি বানিয়েছিল। জঙ্গল-মহলের মধ্যে একটি টিলার ওপর সেটি ফিট করে, খুব-কাছে-নয় পাথরকলের জেনারেটর থেকে তার টেনে টিভি চালু করতে লেগেছিল আরও সাতদিন। আর প্রথম যেদিন সন্ধেবেলায় টিভি চালু হল, সে একটা সেরিমোনি বটে।

পাহাড়-জঙ্গল ভেঙে লোক এসেছিল। সকাল থেকেই তেলে-ভাজা, পাঁপড় আর শুকনো লাড্ডুর দোকান বসে গিয়েছিল। মায়, চুড়ি-ব্লাউজ আর বেলুনওয়ালাও বাদ যায় নি। লোক এসেছিল শিকরোপাড়া, মুর্গাডাঙা, হরিণধুকড়ি আর আদলপাহাড়ি থেকে। সুদূর আসানবনি ও মন্থলপাহাড়ি থেকে লোক আসে গরুর গাড়িতে চেপে। খবর নয় তো—শিমুলের তুলো—এখানে হাওয়ায় ওড়ে। অবাক কাণ্ড সত্যিই। কাচপাহাড়ির জঙ্গলের মধ্যে অম্বিকা মহারাজের আশ্রমে একটা টেবিলের ওপর টুল বসিয়ে এ-অঞ্চলের আদিবাসী মানুষ কিনা বিস্ময়বাক্সে সিনেমা দেখল—যা শহর রামপুরহাটের বাবামানুষের দেখতে তখনও চার বছর বাকি। বস্তুত, রামপুরহাট কলেজ থেকে আমার বন্ধু অধ্যাপক

তমোনাশ ভট্টাচার্যও ছিলেন সেদিনের সেই উদ্বোধন উৎসবে। সস্ত্রীক এবং সপুত্র। সেদিনটা থেকে গিয়েছিলেন।

মনে পড়ে ১৯৭৯ সালের ২৫ ডিসেম্বরের বড়দিন। গেম-টিচার সন্তোষদা আর আমি সায়ান্স বিল্ডিং-এর পেছন দিয়ে শর্টকাটে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছি স্কুল-গেটের দিকে। ধূলিয়ান থেকে আজ বিকেলে ওঁর শ্যালক অরুণবাবুর আসার কথা। একটু আগে স্কুলের সামনে দুমকার শেষ বাস দাঁড়াবার শব্দ আমরা কোয়ার্টারে বসে শুনতে পেয়েছি। বিকেলবেলা। দূর থেকে আমরা দেখতে পেলাম, অরুণবাবু কোথা, তার বদলে থেকে নেমে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে ২৪-২৫ বছরের এক ফিটছয়েক সাহেব-বাচ্চা। (পরে জেনেছি, ১৮, ওদের, আমেরিকানদের, নাকি তখনই ২৪-২৫ দেখায়)। তার পরনে সাদা শর্টস, গায়ে নীল উইন্ড-চিটার, পিঠে স্লিপিং ব্যাগ। পায়ের কাছে একটি মাঝারি প্যাকিং বাক্স ও প্রকাণ্ড এক কিটস-ব্যাগ পড়ে আছে। সে দাঁড়িয়ে আছে দুমকা রোডের ধারে। তার ঠিক পেছনে আমাদের কম্পাউন্ডের একমাত্র পান্থপাদপ গাছের পাতা কটি সবুজ চালচিত্রের মতো ছড়িয়ে আছে। সত্যি, দূর থেকে তাকে মনে হচ্ছিল বুঝি গ্রহান্তরের কোনও লাল-মানুষ। হঠাৎ কাচপাহাড়ির ভাঙা রানওয়েতে ফোর্সড ল্যান্ডিং করতে বাধ্য হয়েছে। সসার নামাবার মতো এর চেয়ে উপযুক্ত স্থান এ-অঞ্চলে আর কোথায়-বা। চিল-শকুন তো এখনো নামে।

'হাই।' দূর থেকে আমাদের উদ্দেশে হাত নেড়ে সে হাসল। সহজেই চেনা যায়, প্রথম দর্শনেই ভাল লাগে, এমন মানুষ বিরল হয়ে আসছে। সে ছিল তেমনি একজন মানুষ। যখনই ইচ্ছে করি, তার সেই প্রথম দেখা সহাস্য, তরুম দেবমূর্তি আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। পিছনে পান্থপাদপ।

অস্তরাগের আলোয় তাকে আরও লাল দেখাচ্ছে।

তার চোখে আকাশের দু-দুটি নীল তারা।

সে বলল, তার নাম ভিক্টর। আসছে ক্যালিফোর্নিয়ার সাক্রামেন্টো থেকে। ডু ইউ নো সামবডি কলড্ আম্‌বিকা চোন চাকারবোর্টি হু লিভ্‌স অ্যারাউন্ড হিয়ার—অ্যাট আ প্লেস কল্‌ড...কল্‌ড... সে জানতে চাইল। সে জায়গাটার নাম ভুলে গেছে এবং পুরো ঠিকানাটি হারিয়েছে।

'এ-জায়গার নাম তো সুরুচুয়া।'

'সুরোচোয়া। আ, দ্যাটস রাইট। বেঙ্গাল-বেহার বর্ডার?'

'দ্যাটস রাইট।'

'দেন দা প্লেস মাস্ট বি অ্যারাউন্ড হিয়ার।' বলে সে দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে স্রাগ করে বিজয়ীর হাসি হাসে।

'আমবিকা? চোন?' যদিও এমন সম্ভাবনার কথা দূরতম কল্পনাতেও আসে না, তবু, কী মনে হল আমার, তার অনুকরণেই নামটা উচ্চারণ করে আমি জানতে চাইলাম, 'ইজ হি এ হারমিট?'

'ইয়াপ। ইয়াপ।' শরীর দুলিয়ে ছেলেটা বোধহয় ব্রেক-ডান্সের কোনও একটা মুভমেন্টই করে নিল! তীরে ওঠার মতো গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল, 'হি ইজ আ সাড়ু।'

বৃদ্ধ অম্বিকা মহারাজের খোঁজে সাত সমুদ্র তের নদীর পরপার থেকে উড়ে এসেছে এই নীলচক্ষু, স্বর্ণকেশ তরুণ জুপিটার? এও বিশ্বাস করতে হবে? আমার একটা স্বভাব এই যে কোনও কিছু ঘটতে দেখলে আমি সঙ্গে সঙ্গে তা মেনে নিই। কিন্তু, এ যেন মানতে

পারছি না কিছুতেই।

'তাঁকে কেমন দেখতে বল তো?'

'তা আমি বলতে পারব না। খুব ছোটবেলায় একবার মাত্র হার্ডওয়ারে দেখেছি।'

'হরিদ্বার?'

'নো, হার্ডওয়ারে।' ভিক্টর আবার বলে।

হ্যাঁ, এরপর আর কোনও সংশয় রেখে লাভ নেই। পরনে রক্তাম্বর ও মাথায় জটাজুট, অম্বিকা মহারাজ হরিদ্বার থেকে স্কুলে এসে ওঠেন ১৯৭৪ সালে। তাঁকে স্কুল-মন্দিরে পুরোহিতের কাজ দেওয়া হয়।

ক্রমে তাঁর, বিশেষত কানের লতি ও নাকের পাটায়, গলিত-কুষ্ঠের লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠল। তারপর কাচপাহাড়ির জঙ্গলে তৈরি করলেন ওঁর নির্জন সাধনক্ষেত্র। ৭৬ থেকে সেখানে।

'তা, তোমার', শীতের দেবদারু-পাতার মতো ঘুরে-ঘুরে ঝরে পড়ছে আমার বিস্ময়, আমি জানতে চাইলাম, 'অম্বিকা মহারাজের সঙ্গে কী দরকার?'

'হি ইজ মাই আঙ্কল।' ছেলেটা সগৌরবে জানাল। আবার!

আকাশের নীল তারার মতো ছলছলিয়ে উঠল তার চোখ। সে বলল, 'মাই ড্যাড্স ওন এল্ডার ব্রাদার। দা ওনলি ওয়ান অন টপ অফ দিস প্ল্যানেট মাই ব্লাড উড রেকন অ্যাজ মাই ওন।'

'দিস প্ল্যানেট' শব্দদুটি সে বিশেষ জোর দিয়ে বলে। যেন, সত্যিই সে 'দ্যাট প্ল্যানেটে'র মানুষ!

পূর্ণিমার রাতে এখানে সন্ধ্যার আঁধার হয় না। আলো থাকতে থাকতেই চাঁদ বনজঙ্গলের মাথায় উঠে পড়ে। তখন দিনের আর চাঁদের আলো মিশে এমন এক না-রুপোলি, না-সাদা কল্প-রঙ তৈরি হয় যা হয়ত স্বর্গেরই। স্যিলুয়েটে দুমকার পাহাড়। তার মাথায় এখনো কমলা-কোয়া আকারে সূর্য, তিন-চতুর্থাংশ পাহাড়ের পিছনে নেমে গেছে। দিগন্তে সাদা মেঘ রূপবদল করতে করতে এখন রূপ নিয়েছে সোপানশ্রেণীসহ এক অলৌকিক দুর্গতোরণে। এক-একটি সূর্যাস্ত রশ্মির স্পর্শে ধাপগুলি একে একে রাঙা হয়ে উঠছে। পাথর কল থেকে ফেরা একদল সাঁওতালি মেয়ে খুনসুটি-রাগিণীতে গান গাইতে গাইতে পিচের রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে।

সেতম্‌বে বিচড়ি তাসি-ইমে
রাচাড়ে শুড় তাসি-ইমে...

রোদ উঠেছে। ওগো, তোমার উঠনে কাপড় শুকতে দাও। ওগো, উঠনে ধান শুকতে দাও....

রাস্তা ছেড়ে তারা দল বেঁধে মাঠে নামে। সূর্যাস্ত ছেড়ে তাদের গানের সুর চন্দ্রোদয়ের পথে মিলিয়ে যায়।

'আ। দেন, দিস ইজ দা হেভেন!' ভিক্টর মুগ্ধ মনে বলে ওঠে।

বক্ষপট বিস্তৃততর করে ফুলিয়ে সে প্রশ্বাস নেয় ও বহু সময় বুকে আটকে রাখে।

'হ্রীং' আর 'ক্রীং' এই দুই বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে অম্বিকা মহারাজও এভাবে শুভ্র, কেশরাশিতে ভরা তাঁর বিশাল বুক ফুলিয়ে রাখতে পারেন, আমার মনে পড়ল।

তবে সে আরও বহুসময় ধরে। তান্ত্রিক সাধক। এ-জিনিস বহু সাধনার ফল। সহস্রপল ধরে এই ক্রিয়া দশ লক্ষবার করতে পারলে মানুষ অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, উনি আমাকে বলেছিলেন। ('স্বর্গ-মর্ত-পাতাল কোত্থাও কেউ টেরটি পাবে না, বুঝলে বাবা?'—অম্বিকা

মহারাজ)।

'আই লুক এগজ্যাক্টলি লাইক মাই আঙ্কল। ডোন্ট আই? লুক, অ্যাট দিস—জোড়া ভ্রু দেখিয়ে সে কোলের শিশুর দেয়ালি-হাসি হাসে।

বলে, 'হি অলসো উইয়ার্স দিস। ডাজন্ট হি?'

যেন ছদ্মবেশ, দুজনেরই। সে হাসতেই থাকে।

কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। জ্যোৎস্না এখানে এত প্রখর যে পথ চেনা দায় হয়ে উঠে। সব একাকার হয়ে যায়।

এখন আর কাচপাহাড়ির জঙ্গলে ঢোকার প্রশ্ন ওঠে না। সে রাতটা ভিক্টর কাটাল আমাদের সঙ্গেই। সন্তোষদার বাড়িতে হ্যারিকেনের আলোয় ডিমের ঝোল দিয়ে মাধুরীবউদির হাতে-গড়া রুটি খেতে খেতে জানাল : সে ছাত্র। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন পড়ছে।

তার বাবা-মা গতবছর একসঙ্গে মোটর-দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

পৃথিবীতে জেঠু ছাড়া তার আপন বলতে কেউ নেই। মা ছিলেন আইরিশ, মৃত পিতামাতার একমাত্র সন্তান। মা-র তরফে পিসে-মেসোরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে। যোগাযোগ নেই। ইন্ডিয়ার দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন সকলকে চিঠি লিখে-লিখে হরিদ্বারের কাছে কনখলে বাবা কমলিবালার আশ্রমে সে জেঠুর খোঁজ পায়। চিঠি লিখে উত্তর না পেয়ে খ্রিসমাস-ব্রেকে নিজেই চলে এসেছে। হরিদ্বারে কমলিবালায় জেঠুর এক সতীর্থ সাধু ওকে কাচপাহাড়ির খবর ও পথ নির্দেশ দেন। বহুকষ্টে পথ চিনে সে এখানে পৌঁছেছে।

'প্যাকিং বাক্সে কী এনেছ, ভিক্টর?'

আমি তখনও বিয়ে করিনি। সে রাতে পাশাপাশি তক্তপোশে শুয়ে আমি ওর কাছে জানতে চাই, 'জেঠুর জন্যে কিছু নাকি?'

'ইয়াপ। দ্যাটস রাইট। ইটস আ স্মল টিভি। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট।'

'কাচপাহাড়িতে টিভি? হাঃ-হাঃ-হাঃ। পাগল ছেলে!'

'হাসছ কেন? এখানে কোথায় জেনারেটর নেই?'

'তা আছে। পাথর-কলগুলোও থাকে। কিন্তু—'

'কেন ওরা কানেকশান দেবে না? তোমরা সবাই তো টিভি দেখবে?'

'তা হয়ত দিতে পারে। এখানে সবাই তোমার জেঠুকে শ্রদ্ধা করে।

কিন্তু, সবচেয়ে কাছাকাছি পাথর-কল থেকে তোমার জেঠু থাকেন অন্তত আধমাইল দূরে।'

'দ্যাট, আই শ্যাল ফিক্স আপ। নো প্রবলেম। ডোন্ট ওয়রি।' বলে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে থেকে দু-আঙুল বের করে সে আমাকে V-মুদ্রা দেখায়, 'দিজ ইজ ভিকি। দে কল মি ভিক্টর।'

সত্যিই, দিন-পনেরর অক্লান্ত চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত অসাধ্যসাধন করল ভিকি। মাটিতে পোঁতা শিসল গাছের খোঁটা থেকে টানা কঠিন তার দিয়ে টানটান করে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সে টিলার ওপর টাঙাল বিবিধ বুস্টারসহ এক বিশাল অ্যান্টেনা। পাথর-কল থেকে গাছগাছালির ডালপালায় বেঁধে মোটা ইনসুলেটর-দেওয়া তার টেনে নিয়ে গেল কাচপাহাড়ির জঙ্গলের মধ্যে। এই গ্রহের ওপর তার একমাত্র শোণিত-সম্পর্কের সাধনক্ষেত্রে সুদূর আমেরিকা থেকে বয়ে আনা পাণ্ডোরার বাক্সর মুখ সে খুলে তবে ছাড়ল।

তখন কে জানত, মাত্র ২ বছর যেতে না যেতেই ভুতচতুর্দশীর অন্ধকার রাতে তাকে

এভাবে আবার কাচপাহাড়িতে ফিরে আসতে হবে! এবং, তাও এই অভিশপ্ত টিভি-টার কারণেই।

অভিশপ্তই-বা বলি কী করে। 'মন্ত্রসিদ্ধ' বলতে বাধা কোথায়? কেননা, কাচপাহাড়িতে, তাঁর সাধনক্ষেত্রে, ঝুরি-নামা প্রাচীন অশ্বত্থের গুঁড়ির কাছে, মাটির বেদির ওপর, কালীকামূর্তির সঙ্গে রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা ওই বৈদ্যুতিক যন্ত্রটি অথবা মাতৃমূর্তির উদ্দেশে আমি কতদিনই-না অম্বিকা মহারাজকে লাল কম্বলাসনে উত্তরমুখী বসে ধ্যান করতে দেখেছি। কখনো মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছে উদাত্ত কণ্ঠে

'ওঁ নিত্যায়ৈ নমঃ। ওঁ ক্লিন্নায়ৈ নমঃ। ওঁ
মদদ্রমদয়ৈ নমঃ। ওঁ ফ্রেং ফ্রেং ক্রোং ক্রৌং
পশূন গৃহাণ ওঃ হং ফট স্বাহা.....

একদিন দেখলাম, বেদির ওপর আঁকা, রহস্যময়, অনুন্মোচনীয় তান্ত্রিক যন্ত্র-চিহ্নের ওপর টিভিটা বসানো। তার সর্বাঙ্গে সিঁদুর ও রক্তজবার মালা। কালীকামূর্তির সামনে বসানো যেন চতুষ্কোণ ঘট একটি। মাটিতে ৭টি নির্জীব কাক পড়ে আছে। প্রত্যেকের পা লাল সুতো দিয়ে বাঁধা। হোমাগ্নি দাউদাউ জ্বলছে।

কাকগুলোকে দেখে বেশ বোঝা যায়, ওরাও জানে ওদের আহুতি দেওয়া হবে। টিভি-র পাশে কালো পাথরের দেবীমূর্তি। তারকাবিহীন শ্বেত চক্ষুদুটি ঝকঝক করছে। সামনে পোঁতা ত্রিশূল। তাতে লাল কাপড় বাঁধা। ত্রিশূলের গোড়ায় একটি নরকপাল। তাতে মিলেমিশে থাকে গো, অশ্ব, মার্জার, সারমেয় ও গর্দভ মূত্র—মহারাজের চেলা বটু সোরেন পরে পুলিসকে বলেছিল। সেদিন মহারাজের মন্ত্র ছিল :

'দেবী মহাপিশাচিনী! ওঁ, হ্রীং, ক্রিং, শ্রীং, ক্লীং, হং হূ। বলিদানং দদাতি মে। গৃহ্নতু। গৃহ্নতু। গৃহ্নতু। অ, র, ব, ফট স্বাহা!

এত বলে দড়ি-বাঁধা প্রথম জ্যান্ত কাকটি ছুঁড়ে দিলেন হোমাগ্নির মধ্যে! বলিদানের মন্ত্র। তা বলে দেবীমূর্তি ছেড়ে টিভি-পুজো! মহারাজ পাগল হয়ে গেছেন, সেইদিন প্রথম আমি বুঝতে পারলাম।

বলা নেই কওয়া নেই, ১৯৮১-র কালীপুজোর আগের দিন ভিকি এসে হাজির। চুলটুল উষ্কখুষ্ক। চোখের কোলে কালি। যেন কত রাত ঘুময়নি।

তখন বিকেল ৪টে। বাস তো নেই এখন। এল কী করে। একজন মোটর সাইকেলে চেপে দুমকা যাচ্ছিল। হিচহাইক করে এসেছে, ভিকি বলল।

'এ-সব কী শুনছি আঙ্কল!' ভিকি জানতে চাইল, 'পুলিস নাকি আমার জেঠুকে অ্যারেস্ট করতে যাচ্ছে?'

'ঠিকই শুনেছ।' ওকে সত্যি কথা বলতে আমার বেশ কষ্টই হয়, 'মানে আমিও তাই শুনেছি। তুমি কি সেইজন্যেই চলে এলে?'

'আসব না?' আগুনের নীল শিখায় দপদপ করছে তার দুই চক্ষু, মুখচোখ লালে-লাল, সে বলল, 'আঙ্কল টেলিগ্রাম করেছিল আমাকে। আই টুক দা ভেরি নেক্সট ফ্লাইট। শুনছি নাকি চারটে মার্ডার কেস ওঁর বিরুদ্ধে?'

'হ্যাঁ।' আমি শান্তভাবে বলি, 'গত সপ্তাহে বটু সোরেনের খুনটা যদি উনিই করে থাকেন, তাহলে পাঁচটা।'

'বাট আই ডোন্ট বিলিভ ইট! বুকে গোরিলার থাবড়া মেরে ভিকি বলল, 'আমার আঙ্কল একজন সাধু। সে একটা পিঁপড়েও মারতে পারে না। সে করেছে পাঁচটা খুন। চালাকি!'

বললাম, 'তুমি বাড়িতে এস। তোমাকে সব বলছি।'

'নো-নো। আই মাস্ট মেক আ মুভ টুওয়ার্ডস কাচপাহাড়ি। হিয়ার অ্যান্ড নাউ! আই মাস্ট সি মাই আঙ্কল ফার্স্ট। হাউ ইজ হি?'

'উনি তো কদিন ধরে নিরুদ্দেশ।'

'বাট হোয়ার ইজ হি?'

'আমি কী করে জানব?'

'কে জানবে? আই মাস্ট মিট হিম।'

'জানবে পুলিস। পুলিসই তাঁকে আজ সাতদিন ধরে পাচ্ছে না। তুমি কোথায় পাবে?'

'দা পোলিশ কান্ট টাচ হিম।' ওর গোড়ালি-ঢাকা সাদা 'নিক' জুতো দিয়ে, চলতে চলতে, মাটির লাথি মেরে ভিকি দাঁড়িয়ে পড়ল, 'আমি আগাম জামিনের কাগজপত্র কলকাতা থেকে তৈরি করে সঙ্গে এনেছি। রামপুরহাটের এস ডি পি ও মিঃ সাংমা সব দেখেছেন। উনি নিজে স্বীকার করেছেন, আমি যদি সিউড়ির সদর-কোর্টে কাল পিটিশনটা ফাইল করতে পারি—দে কান্ট ডু এনিথিং। বাট হোয়ার ইজ হি?' সে স্কুলের সায়ান্স ও আর্টস বিল্ডিং, হস্টেল, অফিসঘর, কিচেন এমনকি ঊর্ধ্বপানে এ অঞ্চলের দীর্ঘতম সেগুন গাছটার মাথাও চুলচেরা চোখে দেখতে থাকে, 'আই নিড হিজ সিগনেচার।'

কিছুতেই, কিছুতেই ও আমাদের বাড়ি গেল না।

আজ ভূতচতুর্দশীর রাত। আগামীকাল কালীপুজো। কাচপাহাড়ি যেতে যেতে ঘনঘোর অন্ধকার নেমে আসবে। যেখানে পূর্ণিমার আলোয় খবরের কাগজের হেডিং পড়া যায়, সেখানে অমাবস্যার রাত কতদূর দুর্নিরীক্ষ্য, কালো হতে পারে তা অনুমেয়।

'ওন্ট ইউ মিট ইওর আন্টি?'

'তুমি বিয়ে করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'না। ভিকি বলল, 'এখন না। চল, আগে জেঠুকে খুঁজে বের করি। হি হ্যাজ সেন্ট মি অ্যান এস-ও-এস।'

'চল, অন্তত একটা টর্চ আনি বাড়ি থেকে?'

'আই হ্যাভ ওয়ান। আই হ্যাভ ওয়ান।' বলে মাটিতে কিট্‌সব্যাগ নামিয়ে কাঁপা হাতে সে চেন টানে। একটা ছসেলের মস্ত ব্যাটারি বের করে জ্বেলে দেখে বলল, 'ওক্‌কে। দিস ইজ ওয়ার্কিং।'

আমাদের স্কুল কম্পাউণ্ড বিশাল। প্রায় ৯০ বিঘের ওপর। এর মধ্যে ১০ বিঘের মতো জুড়ে স্কুল বাড়ি, মন্দির, মাস্টারমশাই ও স্টাফদের কোয়ার্টার, ছেলেদেরর হস্টেল, রান্নাবাড়ি, প্রেয়র হল, জিমনাসিয়াম—মায় একটা স্কুলের নিজস্ব পোলট্রি—একটি গোশালাও এমনকি— বাড়ির প্রায় খান-পঞ্চাশ। ডিনামাইট দিয়ে ফাটিয়ে ১০-১২টি কুয়ো খোঁড়ার প্রয়াসের মধ্যে ৪টি সফল হয়েছে। বাকি ৮০ বিঘে জুড়ে স্কুলের খেলার মাঠ ও জমি। ধান না হলেও শাকসবজি ও রবিশষ্য যথেষ্ট হয়। জমির প্রায় সবটাই স্থানীয় সাঁওতালদের দান। থিয়েটার না নাচ-গানের প্রচলন নেই—নইলে সত্যানন্দ শিক্ষাপীঠকে অনায়াসেই একটা মিনি শান্তিনিকেতন বলা যেত। বিহার থেকে আদিবাসী ছেলেরা এখানে পড়তে আসে।

স্কুলের বিরাট কম্পাউণ্ড পেরিয়ে মাঠ ভেঙে আমার সুরুচুয়ার চেকিং পোস্টে গিয়ে উঠলাম।

যেতে যেতে আমি ওকে যতদূর যা জানি, সংক্ষেপে বললাম। সেবারও কাচপাহাড়ি

ছেড়ে যাবার মাসছয়েকের মধ্যেই সারসডাঙ্গার একটি কিশোরী সাঁওতাল মেয়ে নিখোঁজ হল। তার নাম সুশীলা হেমব্রম।

সুশীলা হারানো ছাগল খুঁজতে কাচপাহাড়ির জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছিল। ছাগল পাওয়া গেল। কিন্তু, সুশীলার খোঁজ আর পাওয়া গেল না। কাচপাহাড়ির টিলা থেকে একটা জলধারা বেরিয়ে এসে সুরুচুয়ার কাঁদড়ে (ডোবায়) এসে জমে। পরদিন ভোরে দেখা গেল কাঁদড়ের জল লাল। কিন্তু, তখন কেউ কিছু ভাবেনি। সেদিনটার তিথি ছিল, পরে মনে করে দেখা গেছে, অমাবস্যার চর্তুদশী।

'সো হোয়াট?' ভিকি বলল, 'দ্যাট ডাজন্ট নেসেসারিলি ফিক্স মাই আঙ্কল অ্যাজ দা মার্ডারার।'

'আরে, শোনো না তুমি আগে সবটা।' আমি যেতে যেতে ওকে বলি, তিন মাস যেতে না যেতেই, আবার সেই অমাবস্যার রাতে, চর্তুদশী তিথিতে, ফরেস্ট গার্ড ভুটলের মেয়ে চম্পা নিরুদ্দেশ হল। সে ফিরছিল মলুটির মেয়েদের স্কুল থেকে, সাইকেলে চেপে। পথের ধারে সাইকেল আর বইখাতা পাওয়া গেল। কিন্তু এবারেও মেয়েটার খোঁজ পাওয়া গেল না।

এমন ঘটনা এখানে আগে ঘটেনি। তিন মাসের মধ্যে দু-দুটো মেয়ে নিখোঁজ, দুজনেই কিশোরী, আর তাও দুবারই অমাবস্যার চতুর্দশীতে? পুলিসে খবর দেওয়া হল।

কিন্তু, ভিকি আর শুনতে চায় না। ঘটনার গতি কোনদিকে যাচ্ছে টের পেয়ে সে বলল, 'আই হ্যাভ সিন আওয়ার কনসাল জেনারেল ইন ক্যালকাটা। হি হ্যাজ অ্যাসিওর্ড মি দ্যাট হি উড কনট্যাক্ট দা হোম মিনিস্টার। আই অ্যাম আম্যারিকান সিটিজেন। হি ইজ মাই আঙ্কল। নান ক্যান টাচ হিম। আই শ্যাল মুভ হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ টু সেভ হিম।'

বুঝলাম, বাকি দুটি মেয়ের কথা ওকে বলে আর লাভ নেই।

তাই উপসংহারে বলি, 'অনলি লাস্ট উইক, বটু সোরেন হ্যাজ বিন মার্ডারড। হিজ বডি ওয়াজ ফাউন্ড মিউটিলেটেড বায় এ চপার।' 'বাট, নট বায় মাই আঙ্কল।'

'কিন্তু, পুলিসের ধারণা তাই। মিঃ সাংমা নিজে আমাকে তাই বলেছেন। বটু সোরেন ছিল পুলিসের স্পাই। চেলা সাজিয়ে তাকে অম্বিকা মহারাজের আখড়ায় পুলিসই ঢুকিয়েছিল। টের পেয়ে, অম্বিকা মহারাজই তাকে খুন করেছে বলে পুলিস মনে করে।' আর এরপর থেকেই তিনি নিরুদ্দেশ।

'অবশ্য, এত কথা লোকে এখনো জানে না।' জানি, শুধু আমার দু-একজন। লোকে এখনো মহারাজকে আগের মতোই ভক্তি করে, ভিকিকে আশ্বস্ত করতে আমি বলি।

যেতে যেতে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নেমে এসেছে। আমরা দুমকা রোড ধরে চলেছি। দুদিকে কাচপাহাড়ির জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে।

রাস্তাটা এখান থেকে চড়াই। শপাঁচেক ফুটের মতো উঠে গিয়ে, ইংরেজি 'U' অক্ষরের মতো বেঁকে, আবার নিচে নেমে গেছে। বাঁকের মুখেই বাঁ-দিকের জঙ্গলে ঢোকার রাস্তা। মহারাজের আখড়া সেখান থেকে মিনিট কুড়ির পায়ে-হাঁটা পথ।

ভিকির ছ-সেলের আমেরিকান টর্চ আমাদেরর পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। কেউ কোথাও নেই। দূর মলুটিতে আজ থেকে ৭ দিন ভূতচতুর্দশীর মেলা। গেমস-টিচার সন্তোষদা মাধুরীবউদি আর মেয়ে হেনাকে নিয়ে মেলায় গেছেন। ওখান থেকে মাদলের শব্দ ভেসে আসছে। সত্যি, দূরত্ব অতিক্রম করার ব্যাপারে মাদলের জুড়ি নেই। লং ডিসট্যান্স রানার বলতে যদি কিছু বোঝায় তবে তা ওই সাঁওতাল পরগণার রাতের মাদল-শব্দ।

দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত শুধু অন্ধকার। শুধু আমরা দুজন। এ-পথের প্রতিটি নুড়ি আমার চেনা, প্রতি ইঞ্চি জমি আমার মুখস্থ। টর্চ রয়েছে। 'আই হ্যাভ আ ওয়েপন', ভিকি আমাকে অভয় দিয়েছে। মনে হয়, রিভলবার। তবু আজ আমার গা ছমছম করে। আমার খুব ভয় করে। একটু পরেই আসবে সেই ইউ-টার্নের চড়াই, যার শুরুতে বটুর বডি সারারাত পড়েছিল। শেয়াল অথবা নেকড়ে। নেকড়ে টাইপ এক ধরনের বনবেড়াল এখানে যথেষ্ট। দেহের কয়েকটি অংশ পাওয়া যায়নি। তারা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।

সেই জায়গাটার দিকে, বটুর নির্মম বিধিলিপির দিকে, আমি যত এগোই আমার ভয় তত বাড়ে। গতি শ্লথ হয়ে আসে। 'প্লিজ ওয়াক ফাস্টার পল্টুদা, উইলিউ!' মিনতি-মাখা সুরে ভিকি আমাকে অনুরোধ করল।

মলুটির দিক থেকে একটা জিপ আসছে মাঠের খানাখন্দ ভেঙে। জিপের টাল-মাটালের সঙ্গে হেডলাইটের তীব্র আলো স্বেচ্ছাচারী চাবুকের মতো উলটে-পালটে পড়ে তুলে নিচ্ছে অন্ধকারের চামড়া। একবার বোধহয় গাড্ডায় পড়েই কিছুক্ষণ শিবনেত্র হয়ে পড়ে রইল গাড়িটা। হেডলাইটের আলো আকাশের দিকে কতদূর উঠে গিয়ে ঠিক কোনখানটায় অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে, তা বোঝা অসম্ভব। ইঞ্জিন ফের স্টার্ট নিলে শব্দ শুনে বুঝি, রেঞ্জার নস্করবাবুর জিপ। উনি একাই মলুটি গেছেন এবং ওঁর গাড়িতে সন্তোষদার সপরিবারে ফেরার কথা।

দুমকা রোডে সামনের দিকে উঠে পড়ে গাড়ি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা তখন জঙ্গলে ঢোকার পায়ে-হাঁটা পথের সামনে পৌঁছেছি।

স্টার্ট বন্ধ করে ও হেডলাইট নিবিয়ে জিপ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন নস্করবাবু। গাড়ির আলোয় আমাদের আগেই দেখতে পেয়েছেন।

'ভিক্টর না?'

'হ্যাঁ। ও একটু আগে পৌঁছেছে। আপনি একা যে। ওরা এল না?'

টর্চের আলোকছায়া এলাকায় নস্করবাবুর মুখ যতটা দেখা গেল, সেখানে ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি।

'হেনা মলুটির মেলা থেকে ডিসঅ্যাপিয়ার করেছে! আমি জানতাম আজও একটা চতুর্দশী। আজ কিছু হতে পারে। তাই নিজের মেয়েকে নিয়ে যাইনি। কিন্তু, হেনাকে আগলে রেখেছিলাম সর্বক্ষণ।

হঠাৎ কী যে হল নস্করদা হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন, ও-হো-হো-হো-হো। সব শালা ওই অম্বিকা-খুনের কাজ।'

'ডিড হি সে আম্‌বিকা!'

আমেরিকায় ভিক্টরদের বাড়িতে বাংলার কিছু কিছু চল ছিল।

কিন্তু, এতখানি বাংলা বোঝার এলেম নেই। 'অম্বিকা' শুনেই সে কৌতূহলী হয়ে পড়েছে।'

'হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেনড্ উইথ মাই আঙ্কল? হ্যাজ হি সিন হিম!'

ওকে উত্তর দেবার প্রবৃত্তি সেই মুহূর্তে ছিল না। ও তো শুনে একটা কথাই বলবে। বাট, হি ইজ নট। বাট, হি হ্যাজ নট।

নস্করদার কাছে জানতে চাইলাম, 'ওরা কোথায়?'

'মাধুরী অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। সন্তোষ নিয়ে আসছে। মলুটিতে মিঃ সাংমা সে-ই নিজে এলেন। এক কোম্পানি পুলিসও প্লেন ড্রেসে আগে থেকে ছিল। এস ডি পি ও ঠিকই ভেবেছিলেন যে আজ কিছু হতে পারে এবং হলে ব্যাটাকে হাতেনাতে ধরবেন। কিন্তু উনি

যখন পৌঁছলেন অনেক দেরি হয়ে গেছে। বোকা বেহারি কনস্টেবলগুলোর চোখে ধুলো দিয়ে মেছো কুমির তখন মাছ নিয়ে জলে নেমে গেছে।'

একটানা এতক্ষণ দমবন্ধভাবে বলে বুক খালি করে নস্করদা একটা প্রশ্বাস ফেললেন।

'তোমরা কী আশ্রমে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'চল। আমিও যাব। সাংমা ওর ব্যাটেলিয়ন নিয়ে জঙ্গলের চারদিক দিয়ে ঢুকছে। ব্যাটা এ জঙ্গলেই লুকিয়ে আছেই। কোথাও। কে জানে, অমার মণিমা' আবার ফুঁপিয়ে উঠলেন নস্করদা, 'এখনো বেঁচে আছে কিনা।'

সেদিন মেলার ঘটনার পরে বিশদভাবে জেনেছিলাম। বীরভূমের মতো বড় বড় গ্রাম পশ্চিমবঙ্গের আর কোনও জেলাই নেই। এমন গ্রামও নাকি আছি বীরভূমে, জনসংখ্যা যার লক্ষাধিক। মলুটি গ্রামটিও বেশ বড়সড়।

গ্রামটি সীমান্ত-বিহারে পড়ে গেছে। কিন্তু পুরোপুরি বাঙালি অধ্যুষিত বলে, বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে মলুটি গ্রামের কথা অন্তর্ভুক্ত না করে পারেননি। পুরো একটি চ্যাপ্টার আছে মলুটি নিয়ে। সমরেশ বসু তাঁর 'কোথায় পাব তারে' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মলুটির মেলায় নাকি মধ্যরাতের পর গণমৈথুন হয়। বিনয় ঘোষ যখন এদিকে আসেন, উঠেছিলেন আমাদের অতিথিশালায়। একদিন বেড়াতে বেড়াতে উনি আমাকে বলেছিলেন, 'আসলে ফার্টিলিটি কাস্টের ব্যাপার, অ্যা। জমির উর্বরতা বাড়াতে, অ্যা, আগে কুমারী-বলির প্রথাও প্রচলিত ছিল।

আসলে, যে-সব মেয়ে পুরুষের দোষে গর্ভবতী হতে পারত না, অ্যা, তাদের ফার্টাইল করাই ছিল এই বছরে-একদিন সারারাত মেলার উদ্দেশ্য। উপজাতিরা যাতে সংখ্যা কমে না যায় আর কী। অ্যা।' (প্রয়াত, শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষের সঙ্গে যাঁরা কথা বলেছেন, তাঁরা ওঁর এই অ্যা-দোষের কথা জানেন।)

ইন ফ্যাক্ট স্ত্রী কণিকাকে গণমৈথুনের কথা তুলে আমি আজ সকালেই রসিকতা করে বলেছিলাম, 'যাবে নাকি?' দ্যাখো, ফার্টাইল হবার একটা বিরাট চান্স। একজন না-একজন ক্লিক করবেনই।' শুনে কণি 'ধ্যাৎ' আর আমি 'উঃ' একসঙ্গে বলে উঠি যখন সে অকথ্যস্থানে আমাকে এক রামচিমটি কাটে। (বঙ্গসাহিত্যের শিক্ষক হয়েও স্ত্রীর সঙ্গে এবম্বিধ রসিকতা করার জন্য আমি শুধু পাঠকদের কাছে মাপ চাই। তবে পাঠিকারা কেউ দোষ ধরবেন না, তা জানি। কারণ, এর সঙ্গে পুরুষ-শাসিত নারীর হারানো স্বাধীনতার মৌলিক প্রশ্নটি জড়িত।)

তখন বেলা ১২টা। মলুটির মেলায় হঠাৎ গুঞ্জন : বাবা এসেছেন! বাবা এসেছেন!

তারপর সেই অনুমেয় দৃশ্য। এক দীর্ঘদেহী শ্মশ্রুজটাধারী রক্তাম্বরপরিহিত মানুষ হনহন করে এগিয়ে চলেছেন, আর মোজেসকে যেমন বাইবেলে, জনসমুদ্র তাঁকে দু-ফাঁক হয়ে পথ করে দিচ্ছে। তাঁর পিছনে আসছে শত শত মানুষ। ওঁর পথের দুধারে দারুণ ধস্তাধস্তি। কে রইল, আর কে গেল সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই কারও। সবার চোখের সামনে দ্রষ্টব্য শুধু একজনই বাবা!

দেখলে, ভয় হয় সত্যিই। দশটা মানুষ নিয়ে যেন এক একটা মানুষ, বৃষস্কন্ধ, সাড়ে-ছফুট, আজানুলম্বিত বাহু, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, লক্ষ্য করে দেখলে বোঝা যায় তাতে কটি অস্থিখণ্ডও রয়েছে। মুখ ঘামে-সিঁদুরে মাখামাখি। দেখলে, দৈত্যাকার লাগে।

ভিড়ে দাঁড়িয়েছিল সন্তোষদা, মাধুরীবউদি আর হেনা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন ওদের

সামনে।

মাধুরীবউদির দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ('ওঃহো, কী আগুন রে ভাই সে চোখে। মনে হচ্ছিল কপালকুণ্ডলার সেই ভয়ঙ্কর কাপালিক যেন এখুনি মাধুরীকে বলবে—'মামনুসর।'—সন্তোষদা।)

মেঘগম্ভীর স্বরে বাবা মাধুরীবউদিকে আদেশ করলেন—'খেতে দে!'

ব্যস, আর যাবে কোথা। 'বাবা কথা বলেছেন', 'বাবা কথা বলেছেন', 'বাবা মৌনী ভেঙেছেন', 'বাবা খেতে চেয়েছেন'—মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ল সারা মেলা জুড়ে। (বলতে ভুলে গেছি, বাবা শেষ ছমাস ধরে ছিলেন মৌনী।)

মানুষের হাতে-হাতে চলে আসতে লাগল মিষ্টির থালা, বিভিন্ন হোটেল আর দোকান দোকান থেকে ভাত-তরকারি।

প্রায় দশ-বারটি থালার সামনে বাবা বসে। এর-ওর থালা থেকে নিয়ে মাধুরী বাবাকে খাওয়াতে লাগল।

বাবা বললেন, 'জল দে।'

জল খেয়ে হঠাৎ উঠে পড়ে বাবা হনহন করে হাঁটতে শুরু করলেন।

তখন আর বাবার সঙ্গে কেউ নেই। শত শত মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ছে বাবার প্রসাদ সংগ্রহের জন্যে। মাধুরীবউদি মুখ থুবড়ে পড়ে গেছেন।

ভিড় সরে গেলে দেখা গেল, হেনা নেই।

দূর থেকে মনে হচ্ছিল, অম্বিকা মহারাজের আশ্রমে বুঝি আজ কোনও বড়সড় ধুনি জ্বলছে।

'বাট নো!' ভিক্টর অস্ফুটস্বরে বলে উঠল, 'ইটস ফায়ার!'

জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় মহারাজের আশ্রম। এখান থেকে পুরোটা ঢালু পথ। আমরা সেইদিকে ছুটতে শুরু করলাম। সবার আগে টর্চ হাতে ভিকি। মনে হচ্ছিল, সে যেন টর্চের আলোর আগে-আগেই ছুটে চলেছে। আমাদের অনেক আগে সে পৌঁছে গেল অকুস্থলে।'

'আ-ং-ক-ল্‌ল্‌ল্‌ল্‌!'

তার জঙ্গল-ফাটানো চিৎকারে গাছের ডাল ছেড়ে পাখিরা ওড়াওড়ি শুরু করে দিল।

লম্বা শালগাছের খুঁটির ওপর অম্বিকা মহারাজের খড়ো চালের কাঠের ঘরটার চারিদিকে আগুন জ্বলছে। বাতাসে কেরোসিনের গন্ধ। নিঃসন্দেহে কেরোসিন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আমরা প্রথনে দেখলাম রক্তাম্বর পরিহিত জটাজুটধারী এক অতিকায় পুরুষ—তাঁর চারিদিকে আগুন, কেন্দ্রস্থলে তিনি নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে। অগ্নিপরিধির মধ্যে সত্যিই তাঁকে স্বয়ং ব্রহ্মা মনে হচ্ছিল।

তারপর দেখতে দেখতে তার লাল কাপড়ে লাগে হলুদ আগুন। তিনি ছুটোছুটি শুরু করলেন।

এখন দাউদাউ করে জ্বলে যাচ্ছে। তাঁর সঙ্গে জ্বলে যাচ্ছে তার ধর্ম ও অধর্ম, পাপ এবং পুণ্য—ক্রোধ, অভিমান, মন্ত্র ও মৌন। তাঁর রোগ ও আরোগ্য জ্বলে যাচ্ছে।

ভূতচতুর্দশীর অন্ধকার রাতে, ডানা ঝটপট জঙ্গলে শেয়াল ও শূকরের ছুটোছুটির মধ্যে আগুন-আভায় উদ্ভাসিত শতশত পুলিস ও মানুষের বিস্মিত, ভীত, এবং নিঃসন্দেহে

সশ্রদ্ধ চোখের সামনে আগুনের গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন এক আরোগ্য-তন্ত্রী খুনে সন্ন্যাসী.....পাঠক একবার কল্পনা করুন দৃশ্যটি!

তাঁর বুকের কাছে দুহাতে আঁকড়ে ধরে আছেন, ওহো, টিভি-র সেটটা!

বুঝি, সেই আঁধার রাতের কল্লোলের চূড়ায় দাঁড়িয়ে ভিক্টর আর একবার চিৎকার করে উঠল—

'আ-ং-ক-ল্‌ল্‌ল্‌'

মনে হল, তিনি শুনতে পেয়েছেন।

স্পষ্ট দেখা গেল, জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে তিনি তাঁর মাংস-খসা ডান হাতটা আশীর্বাদের ভঙ্গিতে ভিক্টরের উদ্দেশে তুলে ধরেছেন।

কিংবা, সম্ভবত আগুন সেই মুহূর্তে এমন একটা অস্থি-সঙ্কটকে ছুঁয়েছিল যে যাতে তাঁর হাতটা ওভাবেই উঠে যায়।

ওই তাঁর হাত থেকে সেটটা পড়ে যাচ্ছে জ্বলতে জ্বলতে।

তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

তাঁর সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল জ্বলন্ত ঘরটা।

কলকাতার স্টোনম্যান আজ খবরের কাগজের প্রথম পাতায় রোজ হেডলাইন। স্টোনম্যানের দৌলতে ফুটপাতের ভিখারিরা জাতে উঠল। লালবাজার পাগলে-পাগলে ভরে গেল। স্টোনম্যান বি বি সি-র নিউজ হল। তাকে ধরতে এফ বি আই সাহায্যের হাত বাড়াল। টাইম ম্যাগাজিন নাকি কভার স্টোরি করছে?

অথচ, ১৯৭৯-৮১ জুড়ে বীরভূম-সান্তাল পরগনার সীমান্তে এতবড় মর্মান্তিক অতি-নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল সুদীর্ঘ দু-বছরের কাগজে একটি পঙক্তিও ছাপা হয়নি। ১৯৮১-র অক্টোবরের শেষের দিকে 'রামপুরহাটে সাধুর আত্মহত্যা' শীর্ষক ১২ লাইনের একটি খবর তৃতীয় সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাও ঘটনার দিনদশেক পরে। বাস্তবিক মফস্বলের প্রতি কলকাতার এই অবহেলা ও বঞ্চনা, সমাজ-বিজ্ঞানের এটা একটা সম্পূর্ণ অধ্যায় হতে পারে। যাই হোক, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমি গোটা ব্যাপারটার সাক্ষী। তাই আমাকেই এতকাল পরে এই বিশেষ প্রতিবেদন লিখতে হল।

অগ্নিকাণ্ডের পরদিন সকালবেলায় ফরেস্ট বাংলোর বারান্দায় চা-আসরে বসে এস ডি পি ও মিঃ সাংমা আমাদের সামনে, যবনিকা তুলে, সম্পূর্ণ নেপথ্যকাহিনী উন্মোচন করেছিলেন।

দুমাস আগে শাগরেদ সেজে বটু সোরেন মহারাজের আখড়ায় ঢোকে। পুলিস তার কাছেই নিয়মিত খবর পেত। মাত্র দিনকয়েকের সেবাদাসত্বই তাঁকে অম্বিকা মহারাজের পরম বিশ্বাসভাজন ও প্রিয়পাত্র করে তোলে। বস্তুত, মহারাজ তাঁকে অবিলম্বে সাধনসঙ্গী করে নেন।

এই রোমহর্ষক নাটকের উদ্বোধন হয় ভিক্টর প্রথমবার এসে টিভি প্রতিষ্ঠা করে চলে যাবার দিনকয়েকের মধ্যেই। একদিন, মধ্যরাতে কী এক স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে মহারাজ মন্ত্রচালিতের মতো এগিয়ে গেলেন টিভি-র দিকে এবং থার্টিনথ চ্যানেলের বোতাম টিপলেন। অত্যন্ত জোরালো অ্যান্টেনা এবং আধুনিকতম প্রযুক্তিবিদ্যায় সজ্জিত হওয়ার দরুন, নেপালের কোনও-এক 'প্রায়ান্ধকার দোকান থেকে' (ভিক্টর বলেছিল) কেনা 'সোনি'র অন্তত এই সেটটিতে কিছুটা ভূতগ্রস্ততা ছিল গোড়া থেকেই, বিশেষ ওই ১৩নং চ্যানেল। ওটা টিপে এবং টিউনিং-এর চাকা ঘুরিয়ে ভিকি দু-তিনবার অজানা স্টেশন

ধরতে পেরেছিল। যদিও কয়েক মুহূর্তের জন্য। একবার থাইল্যাণ্ড এসেছিল। রামায়ণ নৃত্যনাট্য হচ্ছিল তখন।

সে-রাতে টিউনিং-ও অ্যাডজাস্ট করতে হয়নি। মহারাজ জানতেন না, কী করে। সুইচ টিপতেই অবিকল যা স্বপ্ন দেখেছিলেন...

১৪ ইঞ্চি পর্দায় ভেসে উঠল, সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের খেলার আদি অদৃশ্য শক্তি—বিশ্বপ্রসবিনী রাজরাজেশ্বরী মাতা ভবতারিণীর কামেশ্বরী মূর্তি। ঠিক যে-রকম বর্ণনা আছে কালিকা-পুরাণে, অক্ষরে অক্ষরে!

পাথরের সিংহাসনে রামধনুর সাতটি স্তর পরপর। তার ওপর সিংহ। সিংহের ওপর শব। শবের ওপর পদ্ম। তার ওপর দেবী স্বয়ং।

বটু সোরেন আমাদের স্কুল থেকে ফাইনাল পাশ করা ছেলে। সে নিখুঁত রিপোর্ট করত মিঃ সাংমার কাছে।

দেবী বলিদান প্রার্থনা করলেন। বললেন, 'ওরে, তুই পাঁচটি কুমারী মেয়ের মুণ্ডু দিয়ে পঞ্চমুণ্ডির আসন কর। তার ওপর বসে পঞ্চভূতশুদ্ধি সাধন কর। তোর কুষ্ঠ তা নইলে সারবে না।'

এরপর থেকে সাধনক্ষেত্রে দেবীমূর্তির পাশে রেখে শুরু হল 'সেনি'র নিত্যপূজা। রক্তচন্দনে জবামালায় সাজিয়ে পঞ্চমুণ্ডের জল কুষিতে তুলে মরাহাজ টিভি-র গায়ে নিক্ষেপ করছেন—এ দৃশ্য আমি নিজেও দেখেছি। মুখে উদাত্ত মন্ত্র—তারিণীং অভিষিঞ্চামি। তারিণীং অভিষিঞ্চামি। তারিণীং অভিষিঞ্চামি। ওঁ, হ্রীং....ইত্যাদি। কিন্তু সেই যে অন্তর্ধান করলেন, তারপর দেবী আর দেখা দিলেন না।

তারপর শুরু হল একের পর এক কুমারীর অন্তর্ধান।

'মৃত বটু সোরেনের কাছে পাওয়া সূত্র ধরে', মিঃ সাংমা বললেন, কাল রাতেই সাধনক্ষেত্রে মহারাজের আসনের নিচে মাটিতে পোঁতা চারজন কিশোরীর মুণ্ডু পাওয়া গেছে। তাদের দেহগুলি পাওয়া গেছে এয়ার-বেসের আমলের ডিনামাইট দিয়ে ফাটানো এক গভীর কুয়ো থেকে। একটি লাশ ফেলার পর, তার ওপর একস্তর করে মাটি ফেলা হয়েছে। বটুকে সাধনসঙ্গী জ্ঞানে তিনি ওদের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। তাঁর মতে, 'ওরা সব ভৈরবী প্রেরিত।'

জিপে ওঠার আগে মিঃ সাংমা নমস্কার করলেন জঙ্গলের মাথায় অ্যান্টেনাটার উদ্দেশে। কী ভেবে যে! বললেন, 'লাক উড-হ্যাভ ইট, তাই সন্তোষবাবু মেয়েকে ফিরে পেয়েছেন! ওঁর হয়েছিল ইনকিওরেবল লেপ্রসি অফ দ্য ওয়র্স্ট কাইন্ড। ভূতসিদ্ধির জন্যে ওঁর তো দরকার ছিল মাত্র আর-একটি কুমারীর মুণ্ডু!'

পরিশিষ্ট

মর্গ থেকে এক তাল মাংস আর কিছু হাড়গোড় পাওয়া গিয়েছিল। হিন্দুমতে সৎকার তো হলই। আমাদের আশ্চর্য করে ভিকি বলল, 'আমি শ্রাদ্ধ করব।' শ্রাদ্ধশান্তি চুকতে ১১ দিন।

ভিকিকে রামপুরহাটে পৌঁছে দেবার দিন। সেই 'বিজয়ভারত'। সেই মিছরিলালজী টিলার ওপর দু-বছর আগে টাঙানো সেই বুস্টার-লাঞ্ছিত দুর্বোধ্য জ্যামিতিচিহ্ন নীল আকাশের গায়ে। শরতের শ্লথগতি গাভীন মেঘ।

'জয় জয় অম্বিকা মহারাজ কী—'

'জয়!'

সবার সঙ্গে হাত তুলে ভিকিও অ্যান্টেনার উদ্দেশ্যে নমস্কার করল। ওই সেই, কঠিন এবং নতুন, মন্ত্রসিদ্ধ তন্ত্র-চিহ্ন যা অন্তরীক্ষ থেকে একদিন বিশ্বপ্রসবিনী ভবতারিণীর পবিত্র কামেশ্বরী মূর্তিকে পরদায় টেনে এনেছিল।

বাস খালি। ভোরের অবিরল চিত্র-প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে আমরা রামপুরহাটের দিকে চলেছি। কারও মুখে কথা নেই। এবার শীত বেশ তাড়াতাড়ি পড়বে, মনে হচ্ছে।

মিছরিলালজী কিছুতেই আমাদের টিকিট নিলেন না।

পাশে এসে বসে তিনি অম্বিকা মহারাজ সম্পর্কে এক অদ্ভুত গল্প শোনালেন। 'আমাদের'—কেননা, অনুবাদ করে লাইন-বাই-লাইন গল্পটি আমিও ভিকিকে বলি।

উনি মহারাজের সাধনক্ষেত্রে মাঝে মাঝে যেতেন। কাচপাহাড়ির টিলা থেকে যে সরু ঝরনাধারা নেমে এসেছে, একদিন দেখেন, তারই এক ইঞ্চি গভীর জলবিভাজিকার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে উনি স্নান করছেন। আর মুখ থেকে বেরুচ্ছে এক অনির্বচনীয় আরাম মন্ত্র—'আ, আ, আ....'

'মহাত্মা, হাত জোড় করে হামি বললে, হিঁয়া পে হামি একঠো বান্ধ লাগিয়ে দিই? পানি জেয়াদা হোগা। অউর আপ ভি আরামসে এস্নান কিজিয়ে গা।'

অম্বিকা মহারাজ তখনও মৌনী হননি। কামেশ্বরী ভৈরবীর নির্দেশ পাননি। তিনি উত্তরে তাঁকে এমন একটা কথা বলেছিলেন, মাহাত্ম্যে সন্ত তুলসীদাসজীও যার ধারে-কাছে আসে না, মিছরিলালজী মনে করেন।

'সে কী রে বোকা।' বাবা মিছরিলালজীকে বলেছিলেন হাসতে হাসতে, 'যদি বাঁধ দিস, আর একটু না একটু স্রোত তো তবু কাঁদড়ে যাবে। বর্ষায় উপচে কাঁদড়ের জল যাবে নালায়। নালা যাবে নদীতে। নদী যাবে সমুদ্রে। সমুদ্রকে ওর কষ্টের কথাও বলবে। তখন সমুদ্র আমাকে ধমকাবে না?'

বাস ছুটে চলেছে রামপুরহাটের দিকে।

মিড-লং থেকে ফার-লং শটে হু-হু করে সরে যাচ্ছে কাচপাহাড়ির টিলা।

ওঁ হ্রীং। ওঁ ক্রীং। ওঁ হূং। ওঁ হং।

ও শ্রীং স্রীং।

ওঁ হ্রেং। ক্রেং। ফ্রেং।

ওঁ ফট স্বাহা।

থ্রিলার
টেলিভিশন, ১৯৮৯

যখন সবাই ছিল গর্ভবতী

ছোটবেলার কথা তোর এইজন্যে মনে পড়ে না যে, তুই বড় হতে হতে যতবার সে কাছে এসেছে, ততবার, যেন বিষধর সাপ একটা, তুই হুস-হুস করে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিস। আর যখন সে যেতে চায়নি, ঋতুর পর ঋতু পেরিয়ে, কখনো দুই ঋতুর মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে শেষ পর্যন্ত সেঁদিয়েছে তোর ভিটেয়, কচি ফণাটি তুলে ধরে যতবার তোর প্রসন্নতা ভিক্ষা করেছে (যেন করজোড়ে), ততবার তুই তাকে, 'নিকালো হিঁয়াসে' বলে

লাঠি হাতে তাড়া করেছিস। লাঠি কখনো পড়েছে তার মাথায়, কখনো লেজে, লাঠির ঘায়ে কতবার যে তার মেরুদাঁড়া তুই গুঁড়িয়ে দিয়েছিস। তুই বড় হবার পর থেকে সে তাই আর আসে না। তবে মরে কি আর গেছে, তোর মৃত্যু পর্যন্ত সে নাকি অমর? আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে, খেয়ে না-খেয়ে, সে বেঁচে আছে ঠিকই, জানিস!

না-আসুক; তবু এ-কথা সত্যি যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়টাই ছিল তোর খুব ছোটবেলা। যুদ্ধের শেষের দিকে হাতিবাগানে যখন জাপানি বোমা পড়ল, তার আধঘণ্টার মধ্যে তুই বিধ্বস্ত হাতিবাগান দেখেছিলি। তখন তুই বছর-তিনেকের, মাস্টারমশায়ের কাঁধে চেপে, হ্যাঁ, তুই নিজেই দেখেছিলি। তোর তো কত বন্ধু, খালি-বিল-নদী-নর্দমা সাঁতরে এসে আজ সব লাট-বেলাট— একজন মন্ত্রী, দুজন উপ একজন ফিল্‌ম-স্টার—তুই ছাড়া, বল তো আর একজনের নাম, যে কলকাতার বুকে বোমা পড়ার আধঘণ্টার মধ্যে সে দৃশ্য দেখেছে।

ঠাকুমাকে তোর মনে থাকার কথা না। কিন্তু ঠাকুর্দা? ফটিক ঘোষ?

তোরও ঠার্কুদা-ঠাকুমার সব ছিল রে, প্রপিতামহ ছিল, তুইও কিছু বানের জলে ভেসে আসিসনি। বাঙালদের দ্যাখ দিকিনি, চোদ্দ পুরুষের নাম ঠোঁটে-ঠোঁটে। সাধে কি আর ওরা এমন উড়ে এসে জুড়ে বসল।

তোর ঠাকুর্দার ছিল বন্ধকী ব্যবসা। তোরা কায়েত হলে হবে কী, পাড়া তো বেনেদের। এই টকটকে রঙ ছিল তেনার, ইয়া বুকের ছাতি। বুক পর্যন্ত ঘিয়েরঙা দাড়ি, তা লম্বায় রবি ঠাকুরের বাবার চেয়ে নেহাত কম হবে না রে। ঠিক যেন এক ঋষি। তোদের আহিরীটোলার বাড়িটা ছিল ঠাকুর্দার তৈরি, তোর বাবা শুধু তিনতলার চিলে-কোঠাটা তৈরি করেছিল।

বাবা তো নয়, তোরা বলতিস 'বাবু'। কলকাতার ঘটিরা তখনও তাই বলত। তুই বললে বিশ্বাস করবি না, তোর ঠাকুমাকে ঠাকুর্দা 'মাগীকে ডাক', 'মাগী কোথায় গেল রে' বলে তল্লাস করত! মাস্টারমশায় যখন এলেন, যুদ্ধের শেষ দিকে, তখনও তুই বাবাকে 'বাবু' বলতিস, বাবাও মাকে 'মাগী' ডাকত। মাস্টারমশায়ের সামনে অবশ্য একদম না। মাস্টারমশায়ের তাড়ায় 'বাবু'কে বাবা ডাকতে তোর কি কম লজ্জা করত। যেন যার যা নাম নয়, তাকে সেই নামে ডাকা। তোর বাবাও 'মাগী' ছেড়ে 'ওগো-হ্যাঁগো' শুরু করলেন।

সেন-জেঠু আসতেন কাঁধ পর্যন্ত গিলে-করা বডুয়া পাঞ্জাবি পরে, ডান হাতে গোল্ড ফ্লেকের টিন, বাঁ হাতে চুনোট-করা ধুতির কোঁচা। ধর্মতলায় নিউ সিনেমার ম্যানেজার ছিলেন। সে সেই দেবিকারানীর যুগ। অশোক কুমার লীলা চিটনিস কি সায়গল তখনও আসে নি। 'কৈসে ছিপো গো, আব তুম কৈসে ছিপোগে...মুমতাজ শান্তি আর অশোককুমারের ডুয়েট। মেয়েদের জায়গায় বসে দেখা তোর জীবনের প্রথম ছবি। কিসমৎ। রক্সিতে তিন বছর টানা চলেছিল।

একদিন সেনজেঠু এসে বললেন, 'হ্যাঁগো, ফটিক, তোমার উপেন চাকরি করবে?'—তখন তোর বাবা ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। দুবার এন্ট্রাসে ফেল, তোর বাবার জার্ডিন হেন্ডারসন কোম্পানিতে চাকরি হয়ে গেল। সর্টহ্যান্ড টাইপ সব ওখানেই শিখিয়ে নিয়েছেন। বড়বাবু হয়েছিলেন দশ বছরের মধ্যে।

তোদের বাড়ির একদম কাছেই ছিল সোনাগাছি। পিছনেই ডোমপাড়া। রামবাগান থেকে আসত দারোগাপুঁটি, আলতা পরাতে। চিৎপুর থানার ওসি-র রক্ষিতা ছিল সে, তাই ঐ নাম। সোনাগাছিতে থাকত বেশ্যারা, কারও কাছে 'বাঁধা' পড়লে উঠে যেত

আমবাগানে। অনেকটা ব্যাঙ্কের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট আর ফিক্সড্ ডিপোজিটের মতো আর কী।

রামবাগানের রক্ষিতাদের মান-ইজ্জৎ ছিল। ভদ্রপাড়ায় তাদের রীতিমতো যাতায়াত ছিল। পুঁটি তখন বুড়ি, তখন কোথায় দারোগা, কোথায় কী। বিয়ে অন্নপ্রাশনে বেশ্যাবাড়ির মাটি লাগে না? পুঁটি দরকার হলে, নিজেই নিজের ঘরের দোরগড়ার মাটি তুলে আনত। তোকে ভালবাসত খুব। অন্নপ্রাশনে সোনার ম্যাডেল দিয়েছিল। মরার আগে নিজের মাঠকোঠা বাবার নামে লিখে দিয়ে গিয়েছিল। সে নিয়ে তোর ঠাকুর্দার নামে কেচ্ছা হয়েছিল খুব। দারোগাপুঁটি আনিয়ে দিত বার্মা থেকে 'তানেকা' কোম্পানির পমেটম তেল। সে তেল মাথায় মাখলে ৭ দিন তোর মা-র চুলে থাক থাকত। দারোগাপুঁটি তোর মাকে বেশ কটা গান শিখিয়েছিল। তার মধ্যে একটা হল : পাখি মোর প্রাণের পাখি উড্‌ড়ে গেল কোন বাগানে...টপ্পার সুর। বোধহয় নিধুবাবুর।

ঠাকুর্দার আমলে শীলেরা তোদের একতলা বাড়ির পুবদিকে আড়াল করে পাঁচিল তুলল। তোদের বাড়ি অন্ধকার হয়ে গেল। ভোরবেলা ঘোড়ার গাড়ি চেপে সোজা আমবাগান থেকে এল লুকাস দারোগা। ছাদে উঠে, দেওয়ালে ক্যাঁৎ করে লাথি মেরে বলল, 'চৌবিশ ঘণ্টা মধ্যে ওয়াল ভেঙে দেবে।' চব্বিশ কি, ২ ঘণ্টার মধ্যে সকালের রোদ আবার তোদের বাড়িতে। সবাই জানত, এ-সবই দারোগাপুঁটির সৌজন্যে। সাধে কি ঠাকুর্দার নামে অত কেচ্ছা হয়েছিল।

তোর তিলু মিস্ত্রিকে মনে নেই, না? ডোমপাড়ার তিলেশ্বর রে। বড়ালদের জমিতে সে একটা ছোট্ট ছাঁচি-বেড়ায় ঘর বানিয়েছিল, ঘরের চাল থেকে সোজা উঠে গেছে দু-তিন জোড়া বাঁশের মাথায় পায়রার বোম, দত্তদের তিনতলা বাড়িও ছাড়িয়ে। ৩০-৪০টা পায়রা ছিল তিলু মিস্ত্রির। কতদিন আমার সঙ্গে তিলুর বাড়িতে গেছিস। আর বাড়ির সামনে মস্ত পেতলের দাঁড়ে, রাস্তার ধারেই থাকত একটা রাগী কাকাতুয়া। তোকে দেখলেই, দাঁড়ের ওপর হান-টান শুরু করে দিত আর 'টুই কে রে' বলে চিৎকার করত। তুই ভয় পেতিস খুব। তিলু মিস্ত্রি কাজ করতে এলে, তাঁর কাঁধে একটা পায়রা থাকতই, হাতে সিগারেট।

একবার তোদের বাড়ির দোতলার নতুন ঘরে আলমারি বসবে, ছাদে বসে বাটালি দিয়ে পাল্লার জন্যে ফুল-লতা-পাতার নকশা করছে তিলু। হঠাৎ কাঁধের পায়রাটাকে খপ করে ধরে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'যাও শিউপুরামে।' পাখিটা সত্যিই উত্তর দিকে উড়ে মিলিয়ে গেল। ওর দেশ হল বিন্ধ্যাচল থেকে 'বিশ মীল' দূরে শিউপুরা গ্রামে। খুব লম্বা ছিল লোকটা, তিলেশ্বর। ধনুকের মতো বাঁকা ছিল তার শিরদাঁড়া। অবশ্য তাতেই ৬ ফিট।

ঢ্যাঙা ছিলেন বটে বোসপাড়ার পুন্টে। আমি হরিমতি রাক্কুসির কথা বলছি। রাক্কুসির মেকআপ নিয়ে শাড়িটাড়ি, পরচুলা সব পরে-টরে হরিমতি বেরুত সন্ধের পর। গোটা উত্তর কলকাতার যত দুষ্টু ছেলে 'ঐ হরিমতি আসছে' বল্লেই মার কোলে শুয়ে পড়ত, আর চোঁ-চোঁ করে দুধ খেয়ে নিত। দোতলার জানালা দিয়ে হরিমতি বাড়িয়ে দিত কাপড় জড়ানো একটা কাঠের পাটা—তাতে ঝুলত একটা ঝুলি। গিন্নিরা কমপক্ষে একটা সিকি দিতই। মাঝে মাঝে গলি দিয়ে হেঁটে আসত এক সত্যি-সাহেব? নাম—মিঃ ফক্স। পিছনে বেহারি মুটের মাথায় সবুজ টিনের বাক্স। গায়ে আঁকা লাল পদ্ম, নীল সাপ, সাদা মাথার খুলি, হাড়। মাঝখানে লেখা মিঃ ফক্স, ম্যাজিসিয়ান। ফুটপাতে শীর্ষাসনে দাঁড়িয়ে ফক্সাহেব দুপা দিয়ে রিং-ছোঁড়ার খেলা দেখাত।

দুনিচাঁদ দাঁ-দের বাড়িটা কিনে ধানমল জৈনেরা যখন এল, তোদের পাড়ায়, সেই প্রথম মাড়োয়ারি। তার এক সপ্তাহের মধ্যে তোদের পাড়ায় এসে জুটল কলকাতার তামাম চিল।

অন্ধকার থাকতে তা প্রায় দেড়শ-দুশো চিল এসে বসে থাকত, আমাদের আর আশপাশের সব বাড়ির ছাদে। বুড়ো ধানমল আকাশ একটু ফরসা হলেই ছাদে উঠত, পিছনে চাকর, তার মাথায় একঝুড়ি ব্যাসন আর কুচো চিংড়ি দিয়ে তৈরি ফুলুরি। ছাদ থেকে মুঠো-মুঠো ফুলুরি ছুঁড়ে দিত ধানমল, আর মাটিতে পড়ার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ত চিলগুলো—সঙ্গে যাকে বলে চিল-চিৎকার—সত্যি, সে একটা দেখবার জিনিস। লোক দাঁড়িয়ে যেত।

রোজ সকালে তোদের বাড়িতে আসত এক চ্যাঙারি সিঙাড়া-কচুরি, সঙ্গে জিলিপি। টোস্ট-ফোস্ট তো সেদিনের ব্যাপার। উড়ের দোকান থেকে আসত মস্ত পেতলের ঘটিতে দুধ-লিকার। বাড়িতে এনে চিনি মেশানো চা। রবিবারে ছাড়া, কোনও বাড়িতেই ব্রেকফাস্ট তৈরি হত না। রবিবারে নুচি আর পকেট আলুর দম। সেই আলুর দম, যা নাকি এত শুকনো যে পকেটে করে নিয়ে গেলেও জামায় ঝোল লাগবে না।

তোর ছোটভাই রণবীর এখন আমেরিকায়।

ক্যালিফোর্নিয়ার মার্সেদ শহরে। খুব নামকরা ডাক্তার ওখানে, আমেরিকান স্ট্যান্ডর্ডেই ধনী, বৌ বেলজিয়ান। ছেলেদের নাম ভিক আর নীল। গত বছর পুজোয় এসে পুরনো দোকান থেকে খুঁজে বের করে অশোককুমার আর লীলা চিটনিসের ডুয়েট 'কৈসে ছিপোগে আব তোম কৈসে ছিপোগো' রেকর্ডটা কিনে নিয়ে গেছে—তোদের মা গাইত বলে। রোজ সকালে বার আনা পয়সা নিয়ে তুই আর রনো যেতিস দুলাল ময়রার দোকানে, সঙ্গে লাঠি হাতে চাকর নারান। ঐ যে বলেছিলাম, চিল! কত চিল রে বাবা তখন কলকাতায়। সব ময়রার দোকানে তখন একটা বাঁধানো ছবি থাকত, চিলে চ্যাঙারি ছোঁ মেরে নিয়ে উড়ে পালাচ্ছে, নিচে বিব্রত বাবু ছেলের হাত ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে! ছবির ওপর অর্ধবৃত্তাকারে লেখা থাকত 'চিল হইতে সাবধান।' বড় বড় ময়রার দোকানের সামনে দড়িতে ঢিল বেঁধে একটা ছেলে 'চিল ঢিলো' 'চিল ঢিলো' বলে বনবন করে ঘুরিয়ে সারা সকাল চিল তাড়াত।

নারান মানে ব্রিটিশ। মাস্টারমশাই তাকে ঐ নামে ডাকত। একদিন অপিসের স্টোরকিপার সান্যালদা তোর বাবাকে ডেকে বলল, 'ফটিক' একটা ছেলেকে রাখবে? জেলা মেদিনীপুর ভায়া তমলুক গ্রাম খোশখানার চৌধুরীদের বাড়ির বড়ছেলে। এখন অবস্থা পড়ে গেছে, তবে ছেলেটি খুব মেধাবী। কলকাতায় ল পড়বে। তখন অনেক বাড়িতেই অমন একটি করে গাঁয়ের ছেলে রাখা হত। সে এসে পরিবারের সব দায়িত্ব নিত, ছেলে থাকলে পড়াত। ঠাকুর্দা রাজি হয়ে গেলেন।

সুভাষ বোস পালাবার দিন মাস্টারমশাই এলেন তোদের বাড়িতে। ডান হাতে শতরঞ্চি দিয়ে পাকানো ছোট্ট বেডিং, বাঁ-হাতে সবুজ টিনের সুটকেশ, তার ওপর কালো গোলাপ ফুল। চিলে-কোঠায় তাঁর স্থান হল। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মর্যাদায় বাবার পরেই তাঁর পজিশন। তখনও রুনো হয়নি। তুই বছর তিনেকের।

লম্বা,কালো, ছিপছিপে উনিশ-কুড়ি বছরের মাস্টারমশাই ছাড়া তোদের সংসার তখন আর এক পা চলতে পারত না। মাসকাবারি বাজার, মুটের মাথায়, পিছনে মাস্টারমশাই। মহালয়ার আগে সারা বাড়ির ঝুল ঝাড়া—মাস্টারমশাই।

রোজ ভোরে পান্না গোয়ালা গরু নিয়ে আসত, দুধ দুইবে—মাস্টারমশাই-এর সামনে। তার বালতিতে রোজই পোয়াটাক অবুঝ জল—আর রোজই মাস্টারমশাই-এর গম্ভীর আদেশ—'পান্না, জলটা ফেলে দাও।'

হোমে যাবার আগে ম্যাকক্লাসকি সাহেব বাবাকে দিয়ে গেলেন বিলিতি রেডিও—সেটাও মাস্টারমশাই-এর ঘরে স্থান পেল। সন্ধের পর ঘরে ঢুকে ঘণ্টার পর

ঘণ্টা নব ঘুরিয়ে রেডিও শুনতেন মাস্টারমশাই।

বিশেষ করে রেডিও বার্লিনের ইংরেজি খবর। আর টেবিলের ওপর সাঁটা একটা পৃথিবীর ম্যাপ থেকে পিন তুলতেন আর বসাতেন 'যে, জার্মানি কতদূর এগোল। হাতিবাগানে বোম পড়ার পর এ সেই 'সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি, বোম ফেলেছে, জাপানি, বোমের ভেতর কেউটে সাপ, ব্রিটিশ বলে বাপরে-বাপ'-এর যুগ। নেতাজি জার্মানিতে, এটা তখন জানাজানি হয়ে গেছে।

মাস্টারমশাই নারানের নাম দিয়েছিলেন ব্রিটিশ। ধমকে বলেছিলেন, 'তোর নাম ব্রিটিশ, ব্রিটিশ বলে ডাকলে সাড়া দিবি।' ব্রিটিশ ফতুয়াটা কেচে রাখবি। ব্রিটিশ, এক প্যাকেট কাঁচি নিয়ায়। ব্রিটিশ, পা টেপ। সেবার সরস্বতী পুজোর দিন তোদের বাড়ি পুলিস এল। রাজমোহন চৌধুরীর নামে ওয়ারেন্ট। তোর বাবার তখন প্রস্ট্রেট গ্ল্যান্ড অপারেশন হয়েছে, মেডিকেল কলেজে। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে মাস্টারমশাইকে পাওয়া গেল তোর মায়ের ঘরে। জোড়া খাটের ওপর একদিকে ডাঁই-করা লেপ-তোষক বালিশের মধ্যে লুকিয়েছিলেন। তোর মা হেমাঙ্গিনী সেই ডাঁই-এ হেলান দিয়ে 'অসুস্থ' বলে শুয়ে বঙ্কিম গ্রন্থাবলি পড়ছিলেন। তখন বিকেলবেলা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন শেষ হয়ে আসছে। কোহিমার তামু-প্যালেল রোডে তখনও রক্ত ঢালছে আই-এন-এ। গলির মোড়ে টাঙানো লাল সালুর ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা : 'জার্মানি আত্মসমর্পণ করেছে, এবার জাপানের পালা...' তার নিচে দিয়ে মাস্টারমশাই রাজমোহন চৌধুরীকে নিয়ে পুলিসের ভ্যান চলে গেল।

রুনো তখন তিন মাসের, পেটের মধ্যে সবে নাড়াচড়া করতে শিখেছে। মা খাট থেকে কিছুতেই নামতে চাননি। দারোগার এতেই সন্দেহ হয়।

আচ্ছা, রণবীর, বল্ তো, তোর মা খাটে শুয়ে গ্রন্থাবলির কোন বইটা তখন পড়ছিল? বইটার নাম কী? ধ্যুৎ, তোর কিছুই মনে নেই।

আমি বলি? বইটা ছিল বঙ্কিমবাবুর 'চন্দ্রশেখর'। আচ্ছা, রুনো, বল তো, প্রতাপ না চন্দ্রশেখর—শৈবলিনী কাকে বেশি ভালবাসত?

১৯৮৯

জাগো, মসৃণ ত্বক

—কেউ এসে পড়বে না তো?

—কে আসবে?

—তোমার বউয়ের অসুখের খবর পেয়ে কেউ যদি এখানে খোঁজ নিতে আসে?

—কে আসবে? সবাই তো জানে তোমার দিদি নার্সিং হোমে। সেখানে যাবে।

—না। তেমন কেউ, যে জানে ওর খুব অসুখ, কিন্তু কোথায় আছে জানে না!

—তুমি তোমার বর পার্থর কথা ভাবছ তো? আমি ল্যাচ-কী-র ওপর একটা ছোট্ট নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছি : উইল বি ব্যাক অন মানডে ইভিনিং।

—আমি আমার বর পার্থর কথা ভাবছি না। তোমার ছেলে পুনপুনের কথাও ভাবছি না।

—তাহলে?

—ধরো, এমন কেউ এল যে নিরক্ষর। যে দেখতে পায় না। কানে শুনতে পায় না। যে বোবা। আমি তার কথা ভাবছিলাম।

—আমাদের আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবের মধ্যে তেমন কেউ নেই।

'আছে গো', মুখ ফিরিয়ে অমিয়র কপাল থেকে চুল সরিয়ে দেয় নীরা, 'আছে একজন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়...'

অমিয় বলতে চেয়েছিল, 'নীরা, তুমি কে, কার কথা বলছ বল তো?' কিন্তু তাকে 'নীরা তুমি কে' পর্যন্ত বলতে দিয়ে, ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে, 'চুপ করো। আর একটাও কথা বোলো না' বলে সে অমিয়র ঠোঁটে হাতের তালু ঘষতে থাকে।

অমিয়র গায়ের চামড়া পীতাভ সাদা। সে রোগা। পার্থর পেশিবহুল খর্বতার তুলনায় তার শরীর লম্বাটে ও নরম। অথচ, তুলনায় তার ঠোঁট-জোড়া কী অবিশ্বাস্য কালো এবং কর্কশ—মনে হয় যেন ঠোঁটে রং মেখেছে। আর কথা বলার সময়, ছাতা-মাতা যাই বলুক সে, তার কালো ঠোঁটের চৌকো, তেকোনা, ডিম্বাকার অনবরত পাউটিং, সে তো একটা দেখার জিনিস।

দিদির নিজের হাতে পেতে-যাওয়া বিছানায় নীরা উপুড় হয়ে শুয়ে। তার পিঠে পোড়ামাটির অ্যাশট্রে। পাশে আধশোয়া অবস্থায় অমিয় অনেকক্ষণ ধরে তার পিঠে ছাই ঝাড়ছে আর কথা বলছে। অথচ, সে তার ওষ্ঠলীলা দেখতে পাচ্ছে না। তাই সে হাত বাড়িয়ে অমিয়র ঠোঁট চাপা দেয়।

ওদিকে, সিংভূমের দিকে, আদিবাসীদের হাটে পিদিমপুতুল খুব বিক্রি হয়। যদিও পিঠে নয়, মাটির মেয়েরা সাধারণত তিন থেকে পাঁচটি প্রদীপ মাথার ওপর দুই হাতে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। চাইবাসার মধুটোলার অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কাঠুরে গোরাচাঁদ মুখার্জির বাড়িতে অমিয় একবার দেখেছিল এক যুবতী পিদিমপুতুলের মাথায় অর্ধচন্দ্রাকারে একসঙ্গে বারটি প্রদীপ, সবকটা জ্বলছে! অমাবস্যার অন্ধকার রাতে—অন্ধকার বন পেরিয়ে, অন্ধকার মাঠ পেরিয়ে, পেরিয়ে অন্ধকার নদী—গোরাচাঁদবাবুর আটচালা বৈঠকখানায় ঢুকেই আগুনমাথায় সেই আজানুলম্বিত চুল দাউ-দাউ নারী—হোক মাটির—মনে হয়েছিল, তার এলো চুলগুলিই বুঝি লকলকিয়ে উঠে আগুনের শিখা হয়ে জ্বলছে। জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে তার মুণ্ডু। সেদিন পার্থ হাটে মহুয়া খেয়েছিল খুব। ভয় পেয়েছিল সে-ই সবচেয়ে বেশি। হেন সময় সেই প্রলয়-আলোয় গোরাচাঁদবাবুর দুই মেয়ের প্রবেশ। প্রথমে ছোটমেয়ে নীরা। পরে বড়বোন যমুনা।

১৯৭২ সালের কালীপুজোর আগের দিন। সেটা ছিল ভূতচতুর্দশীর রাত। যাক সে কথা। সে অনেক দিন আগের কথা। তখন বিপ্লব শেষ। তখন চারিদিকে অন্ধকার। পুলিসের তাড়ায় তারা দুই কমরেড সিংভূমের বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন ভয় পেত। ভালবাসা পেত। নিজের দেশকেও, এমনকি, ভালবাসা যেত। আজ ভয়ভীতি নেই। ভালবাসা নেই।

ল্যাচ-লক ভিতর থেকে টেনে শুধু দরজা নয়, ঘরের জানালাগুলিও সব একে-একে বন্ধ করে, অমিয় ঘর, ডাইনিং স্পেস মায় বাথরুমের সবকটি জানালার পরদা নিশ্ছিদ্রভাবে টেনে দিয়েছে। বাইরে শরৎকাল। আকাশের অনুমেয় নীলে ভাসমান সাদা সাদা মেঘ...ওদের এয়ার-হোস্টেস ভাবলে ভাবা যেতে পারে। শুধু বাংলাদেশের এ-সব কেন, পরদার পর পরদা টানতে টানতে অমিয় যেন বাইরের গোটা পৃথিবীটাকেই প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছে। এ-ভাবে পৃথিবী-প্রত্যাখ্যান না করতে পারলে যথার্থ একা হওয়া যায় কী? অবশ্য, সে একা বললে সবটা ঠিক বলা হয় না। কিছুটা ভুলই বলা হয়ে যায়। কেননা,

নীরা রয়েছে।

—ভিজিটিং আওয়ার্স কটা থেকে?

—পাঁচটা। দিদিকে দেখতে যাবে?

নীরার কোমরে কালো শাটিনের সায়া। হাতে টাইটান। ওদের বিয়ের সপ্তম বার্ষিকীতে অমিয়-যমুনার উপহার। নীরার কবজি উলটে অমিয় দেখল, এখন বেলা দেড়টা।

টিভি-তে বোধহয় রবিবার দুপুরের আঞ্চলিক ছবি শুরু হবে। একের-পর-এক বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছে। 'নিরমা ডিটারজেন্ট টিকিয়া' শুরু হতে নীরা বলল, 'একটু সাউন্ড দাও না।'

—না!

—দা-ও-না! গানটা কিন্তু ভারি মজার। যাই বলো ওই একটাই তো জিনিস, যা এখনো পুরনো হয়নি।

—না। কেউ যদি এসে পড়ে? বুঝতে পারবে ভেতরে কেউ আছে।

—কে আবার আসবে?

নাচতে নাচতে নিরমার ছেলে সাদা স্কার্ট পরা নিরমা মেয়েকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েছে। এইখানেই আছে 'একশ গ্রাম কা টিকিয়া

নে যাদু কর দিয়া...'

পরদার মেয়েটার লিপে প্লে-ব্যাক দিতে দিতে নীরা বলে, 'তোমার হল!'

অর্থাৎ, সিগারেট। অমিয় ওর পিঠের অ্যাশট্রেতে গুঁজে সিগারেট নেবায়। অ্যাশট্রেটা তুলে নেয়। এই যে সিগারেট নেবানো, এখানেও অমিয়র একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সে সবসময় সিগারেট নেবাবে বাঁ হাতে। ডান হাতে নেবাতে নীরা একবারও দেখেনি। নেবাবার আগে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে নেবেই। ঘোরানো মুখে জ্বলন্ত সিগারেট সুদ্দু তার কাঁপা-কাঁপা বাঁ হাত অ্যাশট্রে খুঁজবে। তারপর অ্যাশট্রের মুখটা খুঁজে পাওয়ামাত্র শরীরসর্বস্ব সেদিকে হেলিয়ে যে-রকম মৌলিকভাবে সে সেই অগ্নিমুণ্ড ক্রমাগত অ্যাশট্রের মধ্যে পিষতে থাকে—আর কারুকে ঠিক অমনভাবে আগুন নেবাতে দেখতে নীরার এখনো বাকি। পার্থ তো টুসকি মেরে আগুন সুদ্দু বাইরে ফেলে দেয়।

টিভির পরদা থেকে চোখ সরিয়ে নীরা এবার অমিয়র বুকের পীতাভ চামড়ার দিকে তাকায়। সেখানে হাত বোলায়। ঠিক যেন চিনেম্যানের বুক। লেপাপোঁছা। পার্থর বুক-ভরা চুল। তবু আজ সাত-বছরে তো কিছু হল না। এদিকে দিদি এই নিয়ে তিনবার অ্যাবোর্ট করালে। ডাক্তারে বলে, দোষ নাকি নীরার।

ছাই জানে ডাক্তার। আসলে সব দোষ ওই মধ্যরাতের মাতাল পার্থ। কোনও রিয়েল ইন্টারেস্টই নেই। নীরা প্রমাণ করে দেবে যে যত দোষ, নন্দ নয়, পার্থ ঘোষের।

—হঠাৎ কী হল বল তো দিদির?

—দাদার বাড়িতে পরশুদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে হঠাৎ পেটে ভীষণ যন্ত্রণা! নীল হয়ে লুটিয়ে পড়ল। ডাক্তার এসে বলল, অ্যাপেন্ডিসাইটিস। নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে যেতে ওটা ফেটে গেল। আমি যখন গেলাম, তখনও ও টি-তে অপারেশন চলছে।

—অপারেশন কতক্ষণ ধরে হল?

—পেট ভরা অত পুঁজরক্ত। ধুতে-মুছতে ঘণ্টাখানেক লাগল।

—পুনপুন কোথায়?

—ওকে মামার বাড়িতে রেখে এসেছি।

—স্কুলে যাচ্ছে?

—ওখান থেকে যাবে।

খাটের ছত্রিতে নীরা পাট করে ঝুলিয়ে দিয়েছে তার প্রিন্টেড চাইনিজ সিফন শাড়ি। পাশেই খাটের ধারে যমুনার বাড়িতে পরার লাল মখমলের চটিজোড়া ইংরেজি 'L' অক্ষর রচনা করে মেঝের ওপর পড়ে আছে। ছত্রি থেকে ঝুলছে যমুনার দুটি ক্লিপে-আঁটা ব্লাউজও, সেই থেকে শুকোচ্ছে।

ইংরেজি 'এল' অক্ষরটি মাথায় এলে আজও 'লাভ' শব্দটি প্রথমে মনে আসে। অমিয় ভাবে, অসুখ, নার্সিং হোম এ-সব প্রসঙ্গ এনে লাভ কী। বরং, এখন চুপচাপ ভালবাসা যাক নীরাকে। চুমু খাওয়া যাক তার গ্রীবায়। হাত রাখা যাক স্তনে।

যা ভেবেছিল।

'এই ওকি হচ্ছে', বরাবরের মতো ঝটকা মেরে স্তন থেকে অমিয়র হাত সরিয়ে দেয় সে। পরমুহূর্তে তার প্রত্যাখ্যাত হাত সস্নেহে তুলে নিজের জঘনদেশে রাখে। এই প্রথম যে এ-রকম, তা নয়। স্তনমর্দন দূরে থাক, সে অমিয়কে কখনো স্তন স্পর্শই করতে দেয় না। শিউরে উঠে ছিটকে সরে যায়। বারবার। অথচ, বুকে জড়িয়ে থাকলে কিছু বলে না। শুধু হাত দিয়ে ছুঁতে যাও, বলবে, না। শিউরে সরে যাবে।

দূরে সায়ার ফ্রিলের নিচে, তার প্রগলভ নিতম্ব পেরিয়ে, অমিয়র দৃষ্টি নীরার পায়ের কঠিন তে-কোনা অ্যাঙ্কল-বোন পর্যন্ত চলে যায়। একই চাহনি দিয়ে যমুনার পিঙ্ক-হলুদ ব্লাউজ ও ফেলে-যাওয়া মখমল চটি-জোড়ার দিকে সে তাকিয়ে থাকে। বিষয়-বদলের জন্য অনুভূতিতে কোনও হেরফের তার চোখে পড়ে না।

—কী হল?

—বলেছি তো, হাত দেবে না ওখানে।

—কেন?

কোথা থেকে যে কী? অমিয়র সহসা মনে পড়ে যায় বা তার অতীত থেকে, ধুলো ঝেড়ে, স্মৃতি নিজেই উঠে আসে।

কোনার্কের সেই প্রখর অপর-দুপুর। চৈত্রমাস। মন্দিরের দোতলার অলিন্দে উঠে নিছক কৌতূহলবশে মৃদঙ্গবাদিনীর বাম স্তনে সে একবারটি হাত রেখেছিল। রাখতেই, তার হাতের তালুতে উঠে এসেছিল নারী-স্তনের সেই আশ্চর্য নরম ত্বকবোধ, বজ্রাঘাত হোক তার মাথায় যদি না মৃদঙ্গবাদিনীর রক্তমাংসময় স্তনের স্পর্শ সে সেদিন না পেয়ে থাকে! তা নইলে, শরীর জুড়ে কেন তখনি সেই তা-তা-থেই মৃদঙ্গ-বোল—আত্মরক্ষার শেষ ধরতাই ছেড়ে, সব ভুলে, দুহাত তুলে, সূর্যবালিসমুদ্রের সেই অসহ্য দুপুরে—যখন গরম বালি উড়ে এসে পড়ছে মুখে-চোখে-বুকে—অমন উন্মাদ আবেগ ভরে সেই নারী-পাথরকে, না হলে, সে ওভাবে আলিঙ্গন করতেই-বা যাবে কেন! তখনও ভাল করে গোঁফ ওঠেনি, মুখে ব্রণ ফোটেনি সবকটি। কিশোরবয়সি সেই জীবনে প্রথম মৃত্যু-অভিজ্ঞতা আজও তার গায়ে কাঁটা দেয়। মনে পড়লে, নিজেকে জাতিস্মর মনে হয় আজও। বস্তুত, অত উঁচুতে সেদিন পা ফস্কে গিয়েছিল তার। কার্নিশ ধরে কোনওমতে ঝুলে পড়েছিল ভাগ্যিস।

তারপর বেশ কবার কোনার্কে গেছে। আর কখনো স্তনে হাত রাখেনি। মন্দির-চাতালে দাঁড়িয়ে দূর থেকে শুধু স-সম্ভ্রমে দেখে গেছে। কে জানে, দিনে দিনে আরও কত নরম হয়েছে ওই প্রস্তরীভূত কুচযুগল—অহর্নিশি সমুদ্রের নুন মেখে মেখে!

সেদিন চৈত্রমাস। সেদিন দুপুর বেলা। সেদিন পাথর গরম। মৃদঙ্গবাদিনীর লাল বেলে-পাথুরে স্তন-ত্বকের সেই ছ্যাঁকা-লাগা গরম, জীবনের পরমপ্রাপ্তির মতো আজও তার

হাতের তালুতে লেগে আছে।[১]

আঞ্চলিক ফিল্‌ম শুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। শব্দহীন, সুরহীন। বোবা ও নিরক্ষর। ডাব-করা না হলে সাব-টাইটেল পড়ে হয়ত বোঝা যেত কিছুটা। যে, কারা কাকে কী বলছে।

—বোধহয় মালয়ালম ছবি।

নীরা উত্তর দেয় না। গা ঘেঁষে আসে। অমিয় এবার সক্রিয় হবে আশা করা যায়। এখুনি নিশ্চয় নয়। আগে ফোর-প্লে। 'সেক্স ফর দা ইউজার্স' বইটিতে যেমন লেখা আছে। বইটি তাকে পড়তে দিয়েছিল অমিয়। বলেছিল, 'আমি পড়িনি। কিন্তু, তুমি পড়ে দ্যাখো। এতে সোজাসুজি সব লেখা আছে।' নীরাও পড়েনি। তার জরায়ু কেন শুকিয়ে পাথর হয়ে যাচ্ছে, ওভাম কেন সে-পথ আর মড়ায় না, সে-সব কথা নিশ্চিত এই বইতে লেখা নেই? কেন রে নটে মুড়োলি। না, গরুতে কেন খায়। নিঃসন্দেহে, এতেও সেই বৃত্তান্ত।[২]

—নার্সিং হোমে কদিন রাখবে?

—দিন পনের তো বটেই।

—দিদি কেমন আছে?

—আজ ডুস দিতে হয়নি। নিজেই পায়খানা করেছে।

—তুমি আমার অফিসে একটা ফোন করলে পারতে। তাহলে আজ আসতাম না।

—বারণ করার সময় পেলাম কই। এসে ফিরে যাবে। তাই সোজা নার্সিং হোম থেকে চলে এলাম।

—বিকেলে নার্সিং হোমে যাব।

—হ্যাঁ। একটু আগে-পরে।

—নার্সিং হোম কত করে নিচ্ছে?

—আড়াইশ।

—রোজ?

—না তো কী মাসে?

—সার্জন?

—তিন হাজার।

—টাকা লাগলে নিও।

ছবিটা বেশ সিরিয়াস। ভাষা নেই, সুর নেই, শব্দ নেই। তবে রঙিন। অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও সবাই অচেনা। ধানখেতে হাঁটুজলে চারা পুঁতছিল যে আদিবাসী মেয়েটি, সে এখন ধানকলে চালের ডাঁই-এর ওপর শুয়ে। কাঁপছে। চালগুদামের দোতলায় দরজা বন্ধ

১। ত্বক মনুষ্যদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কোটি কোটি কোষে ত্বক শরীরের উপর বিছানো রয়েছে। এপিডারমিস ও ডারমিস এই দুই প্রধান স্তরে কোষগুলি ছড়িয়ে আছে। এই সব কোষ নাড়া-খাওয়া ক্যালাইডোস্কোপের মতো যখন-যেমন অননুমেয় ছকে পরস্পরের সঙ্গে দূর ও নিকট সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে। এদের গতিবিধির হদিশ পাওয়া ভার। এরা সর্বস্বীকৃত মাধ্যাকর্ষণের নিয়মগুলি মানে না। টেস্ট টিউবে রেখে লক্ষ করে দেখা গেছে, উপরের এপিডারমিস স্তর মৃত কোষগুলি শরীর থেকে যত বের করে দেয়, নিচের স্তর ওপরের দিকে জীবন্ত কোষ ততই পাঠাতে থাকে।

২। ত্বককোষের প্রধান কাজ বায়ু থেকে আর্দ্রতা গ্রহণ ও শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ। পৃথিবীর বাতাস থেকে গৃহীত আর্দ্রতা এরা শরীরময় পাঠাতে পারে। তবে এই কাজে তাদের কোনও নিয়মিত ছন্দ নেই, পূর্বভাগ নেই। যদিও সর্বতোভাবে দেখতে আপাতদৃষ্টিতে ছন্দোময় বলে প্রতীতি জন্মায়। ত্বকের গতিবিধি ও সময়প্রণালী তার সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার।

হচ্ছে। মেয়েটির মুখ ভয়ে নীল। রেপ সিন।[৩]

'আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি' বলে নীরা উঠে গেছে। রেপ শুরু হবার আগে অমিয় উপুড় হয়ে শোয়।

বেলা কত? প্রায় তিনটে হবে। যদি পাঁচটায় নার্সিং হোমে পৌঁছতে হয়, তাহলে নীরা ফিরে এলে বিনা ভূমিকায় সঙ্গম শুরু করে দিতে হবে। এ নয় যে, তার প্রয়োজনীয় উত্তেজনা নেই। আদৌ তা নয়। আসলে, তার সমস্যা হচ্ছে পূর্ব-ক্রীড়া নিয়ে। 'সেক্স ফর দা ইউজার্স' বইটি সে যে দেখা মাত্র কিনে ফেলেছিল, তার কারণ বইটির ওই স্ট্রেট-ফরোয়ার্ড টাইটেল; কী, না, 'সেক্স, যারা করে।' কত সোজাসুজি। বাংলা ভাষাতেই যত নেকু-নেকু বই : ওগো বর, ওগো বধূ! কিন্তু অমন অব্যর্থ নামের বইতেও, সে দেখল, ফোর-প্লে সম্পর্কে ঝাড়া একটি চ্যাপ্টার। এ-সব ভ্যানতাড়া তার ভাল লাগে না। বিশেষত, এক্ষেত্রে তার প্রয়োজনও নেই। নীরা কেন আসে, সে জানে। শি নিডস্ মাই সিড।

তা বলে কি নীরাকে চুমু সে খাবে না? তার গাঢ় মেরুন লিপস্টিকে (ষাঁড়ের মড়ি থেকে তোলা বাঘিনীর ঠোঁট যেন) পিছলে যেতে যেতে তার ঠোঁট থেকে চামড়া তুলে আনবে না? নারী-ঠোঁটের রঙ চুষে এই চামড়া খোঁজা—একেই তো যথার্থ চুম্বন বলে? আর, এইসব আদানপ্রদানের সময় অনুভূতিদেশ থেকে কিছু আলোও এসে পড়ার কথা। পড়বে না।[৪]

ফরসা, বলশালী নারীশরীরে শাটিনের কালো সায়া পরে নীরা যখন বাথরুম থেকে এল—বুকে পিটার প্যান—তখন তার মাথায় অর্ধচন্দ্রাকারে বারটি প্রদীপ, সবকটি জ্বলছে। আসলে, নীরা যখন ঘরে ঢুকল, আঞ্চলিক চলচ্চিত্রের ধানকলে ঠিক তখনই লেগে গেল নিঃশব্দ আগুন। এখন, ওই, দাউ-দাউ করে জ্বলে যাচ্ছে। তারই হল্‌কা এসে লেগেছে নীরার মুখে-চোখে। চুলে।

অমিয়র পাশে এসে শুতে গিয়ে নীরা থমকে দাঁড়ায়।

—আর-এ, আর-এ একী। তোমার কোমরে এটা কী?

—কোমরে কী, তা আমি জানব কী করে?

—না-না। তুমি আমার পিঠে হুকটা খুলে দাও। খোলো শিগগির। বলে কী মেয়েটা। ঘরময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আগুনের আভা, আলোয় আলো, এমন প্রকাশ্যে নীরা ব্রেসিয়ার খুলবে!

—এই দ্যাখো, ঠিক এইরকম। ঠিক আমার মতন।

নীরা সগৌরবে নিজের বামস্তন তুলে নিচের দিকটা দেখায়। অমিয় লক্ষ করে বেলেপাথুরে রঙের একটা লাল প্যাচ সেখানে। 'ঠিক এইরকম একটা প্যাচ তোমার কোমরে। এই রঙের', অমিয়র কোমরের অ-দেখা প্যাচে তর্জনী টিপে নীরা বলল,

---

৩। কবি-সাহিত্যিকরা, যাঁদের নাকি নর-নারীর প্রেম-ভালবাসার ব্যাপারে সহজাত জ্ঞান আছে, তাঁরা প্রায়ই লেখেন, প্রণয়পর্বে নায়িকার মুখে রক্তাভার কথা। তাঁরা এই রঙ-বদলের মধ্যে প্রেমের ভাষা খুঁজে পান। ডার্মাটোলজিস্টরা এ-কথা মানতে চান না। তাঁরা বলেন, সে তো রোদ লেগেও মানুষের মুখ লাল হয়। আসল ব্যাপার হল, ত্বকের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ। এপিডারমিস স্তরে তাপমাত্রা বাড়লে, তা সে রোদ বা আবেগ যে কারণেই হোক, ডারমিস স্তর লোহিত কণিকা পাঠাতে থাকে। প্রচণ্ড শীতে বা ভয়ে মুখ নীল হয়ে যায়। তার কারণ ত্বককোষের লোহিত কণিকাগুলি তখন নিশ্চল।

৪। ত্বক বা চামড়ার কাজ আর্দ্রতা গ্রহণ ও বিতরণ। কিন্তু, সে নিজে চিরতৃষিত।

'আমারটাও ঠিক এইরকম। শক্ত।'

অনভিজ্ঞ ভয়ে অমিয়র শেকড় সরসর করে ওঠে। তার মুখেও আগুনের আভা, তাই তাকে আরও ভীত দেখায়। তার মাথার চুলগুলি পর্যন্ত ভয় পেয়েছে, সে টের পায়। সে একবার নিজের কোমরে হাত বুলিয়ে দ্যাখে। খুঁজে পায়। তারপর নীরার স্তন ছুঁতে গিয়ে, না ছুঁয়ে, সে সভয়ে হাত গুটিয়ে আনে।

ধানকল জ্বলছে তো জ্বলছেই। আগুন-আভার ঢেউয়ের মধ্যে ওরা দুজন পাশাপাশি চিৎ হয়ে শুয়ে। দেওয়ালে, সিলিঙে, জানালার পরদায়, সর্বত্র আগুন। ঘুরন্ত পাখার অগ্নিস্রাবী ব্লেডগুলোর দিকে তাকানো যায় না।

—এই শুনছ। তুমি কোনও জিওলজিস্টকে চেনো।

—জিওলজিস্ট?

—আ-হ্যাঁ। জিওলজিস্ট!

—?

—জিওলজিস্ট ছাড়া পাথর কে চিনবে?

—পাথর?

—পাথরই তো।

—একবার লুথেরান-এ গেলে হয় না। হয়ত কুষ্ঠ...

—কবে দেখিয়েছি লুথেরানে!

—ওরা কি বলল?

—কী আবার বলবে! বলল, পাথর। বলল, পাথর হয়ে যাচ্ছি। আমার থেকেই রোগটা তোমার হয়েছে বাপু, যাই বলো!

সারা শরীর দুলিয়ে নীরা হাসছে। তার মুখ নিচু। চুলে-চুলে ঢাকা। সহসা, মাত্র একটা ঝটকায় মুখের সব চুল সে সাফল্যের সঙ্গে পিঠে তুলে নেয়।

'একজন ভাল জিওলজিস্ট দেখাব দুজনে, বুঝলে। গ্রানাইট হলে গ্রোথ রেট কী ওরা বলে দেবে। স্যান্ড-স্টোন যদি হয়' ছোট্ট হাই তুলে ও মুখে তুড়ি মেরে সে বলে, 'ফার্দার গ্রোথ নাকি অ্যারেস্ট করা যায়। আর চায়না ক্লে-ফ্লে হলে তো কোনও ব্যাপারই না...'

নীরা বলে চলেছে। কী বলছে, সে এখন আর জানে না।

সভয়ে, সন্তর্পণে অমিয় একবার নীরার বাম-স্তনে হাত রাখে। মৃদঙ্গবাদিনী-অভিজ্ঞতার ঠিক উলটো। নরম। কিন্তু, মূলত পাথর। মন্দিরের উঁচু কার্নিশে দাঁড়িয়ে সহসা সে মূলত নরম, গরম পাথুরে স্তন-ত্বক থেকে হাত তুলে নেয়।[৫]

তার মাথা টলে যায়। খুলি না ফাটা পর্যন্ত সে সবেগে মন্দির-চাতালের দিকে পড়ে। যেতে থাকে।

শারদীয় বিভাব, ১৯৮৯

৫। ত্বকের তৃষ্ণা অনিবারণেয়। মানুষের সাময়িকভাবে মেটে, ত্বকের তৃষ্ণা মেটবার নয়। ত্বক শুধু জীবিতের শরীরেই বেঁচে থাকতে পারে। যারা মৃত, তাদের জন্য ত্বক কাজ করে না। জীবিত ত্বক মৃতের শরীরে সংস্থাপন করা যায় না।

আমার বন্ধু পুলকেশ

পুলকেশের সঙ্গে এই পচা ভাদ্দরে, দুপুরবেলায়, মিনার্ভার সামনে দেখা। সারাদিন নাওয়া নেই, খাওয়া নেই; বলল, ওর মারুতির এয়ার কণ্ডিশানিং মেসিনটা খারাপ হয়েছে। সকাল থেকে অ্যাম্বাসাডারে চেপে মারুতির পার্টস খুজছে। মাঝখানে গাড়ি পার্ক করে একটা লিমকা ব্রেক। বলল, এখুনি আবার বেরুবে। খুঁজতে।

গরমে, ভাপে, ওর মুখ টকটকে লাল। এমনিতে ওর গায়ের রং ঘন বাদামি। মাথা গোলাকার। নাক বেশ বড়। কপালে খাঁজ নেই। নখ ছোট-ছোট। কান তো ওর এমনিতেই ঝোলা। এখন জিভ ঝুলে পড়েছে। জিভের ডগা থেকে লালা গড়িয়ে পড়ছে টপাৎ টপাৎ করে।

আমার মুখটুক শুঁকে ও জানতে চাইল, 'তুই কী খাবি। লিমকা না থাম্পস আপ?'

কুকুর বটে পুলকেশ, তবে তার পেডিগ্রি আছে। আসল সেন্ট বার্নাড। অত্ত বড় সাইজ, কিন্তু লোমবহুল ল্যাজ, মাটি ছুঁইয়েও হাতখানেক গুটিয়ে রাখতে হয়েছে।

কটাই-বা বার্নাড আছে আজ কলকাতায়। ওর পূর্বপুরুষরা থাকত আল্পসের বরফ-নীল সুইস অঞ্চলে। ওখানে, ১৫০০০ ফুট উঁচুতে, একটা রাস্তাই আছে ওদের বংশের নামে—সেন্ট বার্নাড গিরিপথ। এককালে তীর্থযাত্রীদের গলায় লণ্ঠন বেঁধে সারারাত ওই গিরিবর্ত্মে ঘুরে বেড়াত, পিঠে কম্বল। যদি তীর্থযাত্রীদের প্রয়োজন হয়। ওর পূর্বপুরুষ সেন্ট বারি আল্পসের ভেতরে গুহামুখের বরফ খুঁড়ে ৪০ জন সুইস মঙ্ককে উদ্ধার করেছিলেন। তখন খ্রিসমাস। তারপর স্বয়ং পোপ বারির গলায় সোনার পদক ঝুলিয়ে দেন ও তাঁকে ওই খেতাব দেন। সেই থেকে চলছে।

ঠান্ডা খেয়ে পুলকেশ গাড়িতে উঠল। ওয়েটিং চার্জের জন্যে টিকিট ধারতে এলে ও আমাকে দেখিয়ে বলল, 'এই যে কর্পোরেশনের লোক। এই তোর আইডেনটিটি কার্ডটা দেখা না।'

সঙ্গে নেই শুনে গরগর করতে করতে মরক্কো চামড়ার দামি পার্শ খুলে অনেক খুঁজে পেতে ৬০ পয়সা বের করল।

'ভিক্ষে কি দিতে ইচ্ছে হয় না?' গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে গেল পুলুকেশ, 'তবে ৬০ পয়সা ব্যাগ থেকে খুঁজে বের করতে যে মেহনত, তার দাম ৬০ পয়সার চেয়ে অনেক বেশি। হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ।

'চলি রে।' গাড়ির স্টার্ট দিয়ে পুলকেশ বলল, 'ঘেউ। ঘেউ।'

ভিখারি বলে গেল পুলকেশ। আমাকে। বলে গেল ভিখারির অফিস।

আমাদের অইফসের সামনে একটি বাস স্টপ আছে। ১০।।০টা থেকে ১১টার মধ্যে সব বাস একবার ওখানে দাঁড়াবেই। আমাদের অফিসে কত জন কাজ করে? ১০-১২ হাজার? উত্তুরে যাত্রীরা সব এই স্টপেই নামে। এক-একটা বাস থেকে ২০-২৫ জন করে কর্মচারী নামেই। আমি যখন উত্তরে থাকতাম, ওই স্টপেই নামতাম। তখন আসতাম বেলঘরিয়া থেকে।

স্টপ-ঘোষণার কোনও প্রয়োজনই নেই। কেননা, ধর্মতলাগামী বাসগুলো সব ওখানেই খালি হয়ে যায়। ৭৮সি বাসের এক ছোকরা কন্ডাক্টর সারা রাস্তা রসিকতা করতে করতে আসত। যেমন, কাঁটাকলকে বলত গাঁড়াকল। হাতিবাগানকে এলিফ্যান্ট-গার্ডেন—এ-

রমক। কর্পোরেশনের সামনে বাস দাঁড়াবার একটু আগে থেকে সে রীতিমত রেলিশ করে 'চোরপোরেসান' 'চোরপোরেসান' বলে ঘেউ ঘেউ ছাড়ত।

নতুন জেনারেশানের ব্যাপারই আলাদা। এরা পথে হাগবে, আবার চোখও রাঙাবে। এদেরই একজন উমেশ মল্লিক। মাত্র বছর পাঁচেক ঢুকেছে। এরই মধ্যে পাঁচবার ভিজিলেন্স। দুবার শো-কজ। একবার সাসপেন্ড। একদিন সেই টুঁটি ধরে ঝুলিয়ে কন্ডাক্টরকে অফিসের ভেতরে নিয়ে গেল। খুব একটা মারধোর যে করল, তা না। শুধু কন্ডাক্টর বেরিয়ে এল উদোম ল্যাংটো হয়ে। সে ফুটপাতে ফলঅলার কাছ থেকে একটা বড়সড় ঠোঙা তুলে তার উদোম নগ্নতাকে কিছুটা মেরামত করতে চেষ্টা করেছিল। তাকে সেটুকু সুযোগও দিল না। সে খালি বাসে একা উঠল। বাস ছেড়ে দিল।

আমরা ধাড়িরা অবশ্য কোনওদিন কিছু বলি না। আসলে আমাদের আগের প্রজন্মের ধর্মটাই ছিল আলাদা। কেউ নেহাত ল্যাজ-ট্যাজ মাড়িয়ে দিলে আলাদা। একটু যা কেঁই—কেঁই—কেঁই। গুনে তিনবার। নইলে জীবনভর কটা কথাই-বা আমরা বলেছি। সারা জীবনই চুপচাপ।

হ্যাঁ, যখন বাচ্চা ছিলাম, ঘুরঘুর করতাম মা-র চারদিকে, মা ঘুমিয়ে পড়ত, আর বাঁট চুষতে চুষতে আমরা পড়তাম মায়ের সঙ্গে ঘুমিয়ে, সে একটা বাঁচার মতো বাঁচা ছিল বটে। তখন তো কত কথা! সারাদিনই কুঁই কুঁই কুঁই। ভোর হলে কী যে ভাল লাগত তখন। বিশেষ, শীতকালে। স্তূপাকারে শুয়ে থাকতাম সব। এর শীত ওর গায়ে চলে যেত, ওর গরম এর গায়ে। যেন স্বর্গেফর্গে চলে এসেছি; হালচাল ছিল এ-রকমই।

তারপর একটু বড় হতে না-হতেই চুপ-চুপ-চুপ।

একবার দিদির বাচ্চা হবে ক্যাম্বেলে (পরে নীলরতন)। মা-র সঙ্গে গেছি। লেবার রুম থেকে ট্রলিতে বেরিয়ে এল খানপনের বাচ্চা, পরপর শোয়ানো। কেউ সাদা, কেউ কালো-ছিট, কেউ বাদামি, কেউ-বা পাঁশুটে— কেউ পাঁচমিশালি। সবে স্নান করানো হয়েছে—কি তাজা, স্বর্গীয় আর তুলতুলে দেখাচ্ছিল প্রত্যেককে! অথচ, সব কটাই নেড়ি! জষ্ঠি মাস, দারুণ গরম, তবু সব ব্যাটাই তিরতির তিরতির করে কাঁপছে তো কাঁপছেই।

নেড়ি না তো কী। এ কী উডল্যান্ড, না, বেলভিউ। ওখানে পুলকেশরা হয়। টেরিয়ার, গ্রেট ডেন, স্পেনিয়াল, ডোবারমান, হাউন্ড, বা, আদুরে পোমেরানিয়ান কি পিকনিজ—এরা হয়। জন্মের সময় ওরাও নিশ্চয়ই অমনি সুন্দর থাকে? সত্যি, জন্মের সময় পুলকেশ, আমি আমাদের সবাইকেই কী সুন্দর দেখতে লাগে। না?

বালিগঞ্জও গভর্নমেন্ট স্কুলে টানা সাতটি বছর একসঙ্গে। আমি আর পুলকেশ। প্রেসিডেন্সিতে চার। সেই সুবাদে যখনি দেখা হয়, তুইতুকারি অব্যাহত থাকলেও, আমি জানি, পুলকেশ আমাকে একজন প্রকৃত কুকুর হিসেবে গ্রহণ করে না। তাই যদি হতাম, তাহলে তো আমাকে সন্ধ্যার পর ক্যালকাটা, বেঙ্গল কি নিদেনপক্ষে রবিবার সকালে লেক-ক্লাবের বিয়ার সেসনে দেখা যেত। ও-সব পার্টিতে যায়। সেখানে তারা, তাহলে, আমাকেও নেমন্তন্ন করত। সার্কুলার রোডে তেওয়ারির দোকান থেকে ঠান্ডা ক্রিম-সন্দেশ কিনছি, দেখতে পেত। আইস স্কেটিং রিঙে ক্লিফ-এর পক্ষকালব্যাপী 'আপ-টু ফিফ্‌টি পারসেন্ট অফ্‌ফ' সেলে তিন-তিন দিন হানা দিল পুলকেশ। সবার সঙ্গে দেখা হল। কই, আমাকে দেখেনি তো।

এক কথায়, তাহলে আমার একটা গাড়ি থাকত।

স্কুলে পড়তে আমি ওদের বাড়িতে গেছি তেরবার। পুলকেশ ছিল সত্যিই ট্যালেন্টেড। আমার এখনো মনে হয়, ও হয়ত একজন প্রথমে শ্রেণীর পেন্টার হতে পারত। তবে

বড়লোক বলে পাত্তা পায়নি। বড়লোক মানে টাকা। পদ্য-ছবি এ-সব নেড়িদের ব্যাপার। এ-জন্যে ফুটপাতে জন্মাতে হয়। বাপ-মায়ের ঠিক না-থাকা চাই। তা-ছাড়া গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে জেলও খাটেনি পাঁচ বছর!

ওদের দোতলার ঘরখানা ছিল মস্ত মেঝের পুরোটা নরম-নীল কার্পেটে ঢাকা। পুলকেশ ওই ঘরে থাকত। ওইটুকুন ছেলে শুতো একখানা প্রকাণ্ড ট্রিপল বেডে। বিছানায় ভেলভেট কর্ডের চাদর। দেওয়ালের সঙ্গে মিলিয়ে কখনো পিঙ্ক; কখনো-বা রুপোলি সাদা। অ্যাটাচড বাথরুমে কতরকমের হাউস-ট্রি ছিল যে। মিনিয়েচার বাগান একটা। আমি ওই বাথরুমে ঢুকে গোলাপি বেসিনে মুখটুকু ধুয়েছি। তবে, প্যানে—প্রস্রাব? কখনো করিনি। পেচ্ছাপ-টেচ্ছাপ গুহ-বাড়িতে ঢোকার আগেই সেরে আসা ভাল, ও ঠারে-ঠোরে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। বাইরের কুকুরের বাড়ির বাথরুমে প্রস্রাব করা ওদের পছন্দ নয়।

তখনও স্কুলে, একবার পায়খানা পেয়েছিল প্রচণ্ড। ও বাবা, সে কী কাণ্ড। মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। নিচে পড়ে যায় আর-কী বা ওপরেই উঠে আসে! মেসোমশাই সঙ্গে নেমে এসে ওঁদের গাড়ি করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'পারবে তো যেতে, বাড়ি পর্যন্ত?'

গাড়ি ছাড়ার আগে ড্রাইভার দৌলত সিংকে বলেছিলেন, 'তুরন্ত যানা।'

অর্থাৎ, গাড়িতে করব না আমি, কিছুতেই না।

আমি সেদিনই মরে যেতাম। গাড়ির মধ্যে। অগ্ন্যুৎপাতের আগে ভিসুবিয়াসের চাপ তখন সারা শরীরে। এক-এক সময় মনে হচ্ছিল, বুক ফেটে যাবে। নিচে দিয়ে এখুনি বেরুতে না দিলে, মুখ দিয়ে বেরুতে থাকবে। তবু কঠিন প্রতিজ্ঞা আমার। ফেটে যাব। তবু গাড়িতে করব না।

গাড়িতে না করলেও, কালীঘাটে নেপাল ভটচায্যি ফাস্ট লেনের আমাদের দোতলা অবদিও উঠতে পারিনি। গাড়ি থেকে নেমেই একতলায় শুভেন্দুবাবুদের ফ্ল্যাটে ঢুকে গেলাম। ভাগ্যিস, বাথরুম খোলা ছিল। অবশ্য, প্যানে বসার আগেই প্যান্টে ভড়ভড়।

'কে, কে বাথরুমে?'

'আ-আমি মাসিমা।'

'ও, আচ্ছা।' উনি আর কিছু জানতে চাননি। বেরুতে সস্নেহে শুধু বলেছিলেন, 'পেটের অসুখ?'

না, সেদিন পেটের অসুখ ছিল না। বরং উলটো। প্যানে অব্যর্থ অর্ধ-মুহূর্তে, দু-দুটি ক্রুদ্ধ-কঠিন, তৈলাক্ত ডাম্বল! পরপর। আর আধ মুহূর্ত দেরি হলে, সাবমেরিন থেকে উঠে আসা টর্পেডোর মতো ওপর উঠে আসত। যদি মুখ দিয়ে সত্যিই বেরুত, দম আটকে, সেদিনই টরে-টক্কা। শুভেন্দুকাকুদের বাথরুমে।

যদিও নেড়ি, পুলকেশ আমাকে ভালবাসত। যদিও সসন্দেহ। এখনো বাসে। যদিও সতর্ক। হিন্দু হস্টেল থেকে সে প্রায়ই আমাকে ওর জন্যে বরাদ্দ সাদা অ্যাম্বাসাডর মার্ক-টুতে তুলে নিয়ে ওদের বকুলবাগানের 'রাজলক্ষ্মী ভিলা'য় টেনে আনত।

পুলকেশদের বাড়িতে যা কিছু দেখেছি সবই আমার প্রথম দেখা। কোনও কোনও বড়লোকের বাড়িতে যে লিফ্‌ট থাকে, থাকতে পারে, এ ধারণা আমার না-ছিল তা নয়। কিন্তু তেমন বাড়িতে আমি প্রবেশ করব কোনওদিন, এ-ছিল আমার কল্পনার বাইরে। একবার মিঃ এস এন গুহ অ্যাটর্নি-অ্যাট-ল-র বাড়ির গেটে, ওর ঘরের জানালা থেকে আমি এক নীলাম্বরী অপ্সরীকে নামতে দেখি! অবশ্য তাঁর ডানাদুটি তখন ছিল মোড়া। তাই দেখতেও পাই নি। নিশ্চয়-নয় চোখে আমি ওর কাছে জানতে চাই, 'আঁচ্ছা, উনি কি...?'

পুলকেশ নিস্পৃহভাবে বলেছিল, হ্যাঁ, সুচিত্রা সেন।'

যত্রতত্র থেকে পাগলের মতো টেলিফোন করতাম আমি ওকে। যেদিন বাথরুমে, বা, বাড়ির পিছনে কোর্টে ব্যাডমিন্টন খেলছে যখন, টেলিফোনের কাছে আসতে ওর দেরি হত। ততক্ষণ শোয়ানো রিসিভারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎতরঙ্গে ভেসে আসত ওদের সেই পক্ষীরাজ বার্মিজ কাকাতুয়ার তীক্ষ্ণ চিৎকার, 'কেরে, কেরে, কেরে?' এটাই ছিল পাখিটার মুদ্রাদোষ। উজ্জ্বল পেতলের ঘুরন্ত দাঁড়ে পদক্ষেপ গুনে তার চেনাবাঁধা চলাফেরা-প্রতিষ্ঠার প্রতিমূর্তি যেন।

অনেকদিনই অপেক্ষা করতে করতে লাইন কেটে যেত। কোনও দিন চাকর এসে বলত, 'দাদাবাবু বইলেন পরে করতে।'

পুলকেশের ঘরে উঁচু বেদির ওপর থাকত একটা নিশ্চুপ গ্রান্ড পিয়ানো। অ্যালপাইন ওক-এর বডি নাকি। পালিসে চিক্কুর। পায়ার বাঘের থাবা।

পিয়ানো বাজাতেন নাকি ওর মা। মিসেস গুহনিয়োগী। বাপের বাড়ির জিনিস। বাঙালি রাষ্ট্রদূতের মেয়ে। আর্জেন্টিনায় স্পেনদেশীয় মেমের কাছে পিয়ানো শিক্ষা। অবশ্য আমি কখনো শুনিনি। আমি শুনেছি পুলকেশকে বাজাতে। অন্তত একবার।

সেবার হল কী, ক্যালকাটা ক্লাব থেকে আমাদের জন্যে ফিস মিয়নিজ এসেছে আর আমি ছুরি ধরেছি বাঁ-হাতে।

ওদের বাড়িতে সেই প্রথম দিন আমাকে নিয়ে গেছে পুলকেশ। পুলকেশ ঝপ করে ছুরিটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল, 'ডান হাতে ধর।'

আমি বললাম, 'কেন রে।'

'ছুরি ডান হাতে ধরে', ও গম্ভীরভাবে বলল।

নেহাত ঠাট্টা করেই আমি বলেছিলাম ওকে, 'কে বলল তোকে শুনি?'

'বলল মানে', পুলকেশ তেড়ে এল, 'বইতে লেখা আছে। নে খা এখন। গেঁয়ো ভূত কোথাকার।' বলে ও আমার প্লেটের দিকে ওর ডানহাতে ধরা ছুরি-সঙ্কেত করে।

ছুরি যে ডান হাতে ধরতে হয় এ-বিষয়েও বই লেখা হয় নাকি, আমি ভাবলাম। কিন্তু এ তো পোটোপাড়ার কালি কেবিনে গিয়ে বার আনার মোগলাই খেলেও জানা যায়। এবং আমি জানিও।

তাই-নাকি, জানতাম না-তো মুখে আমি ডান হাতে ছুরি তুলে নিই ও এ-যাবৎ অনাস্বাদিত তথা অশ্রুতপূর্ব ফিস মিয়নিজে তা প্রবেশ করাই। ফিস-কাটলেট কী ফিস চপের সঙ্গে এর তফাতটা কোথায় তা এখুনি জানা যাবে।

কাঁটা দিয়ে প্রথম টুকরোটা মুখে ফেলেই পুলকেশ বলে ওঠে, 'আ!'

ততক্ষণে আমিও দু-তিন টুকরো খেয়ে ফেলেছি। এতো জাতই আলাদা, সত্যিই, সেটা আমিও টের পাই। কিন্তু পুলকেশ আমার কাছে একটিবারও জানতে চায় না যে জীবনের প্রথম ফিস মিয়নিজ, তাও ক্যালকাটা ক্লাবের, আমার কেমন লাগছে।

বড় পেডিগ্রির আত্মম্ভরি কুকুরদের এই এক অভিমান। যে খাচ্ছ খাও, কিন্তু এর ব্রহ্মাস্বাদ তোমার ছোটলোক জিভ কোনও দিনই পাবে না। শুধু আমরাই তার হকদার।

কথাটা পুরোপুরি মিথ্যেও না। আমি তা স্বীকার করি। ধরা যাক, আমাদের ইন্দোর-ঘরানার আমীর খাঁ-র কথা, খেয়াল-গানে রক্তমাংসের তানসেন। তা ওঁর একখানা মূলতানে যে লয়কারী, যে বন্দিশ—সে কি আমাদের বোঝার কান। এ-বিষয়ে খেয়াল শুনতে শুনতে ঝুলে-পড়া ওদের মতো লম্বাটে কানই নিশ্চয়ই তারফি করবে বেশি, না তো কি, কানের বদলে আমাদের মাথায় দু-পাশে খণ্ডৎ-তো-গুলো? তবে, বানের জলে

ভেসে এলেও, আমরাও তীরে উঠতে চাই। আমদের এ নিরুপায় প্রাণ-কামনাটুকুও কেড়ে নেওয়াতেই আমাদের দুঃখ।

খাওয়া শেষ করে মুখটুক ধুয়ে এসে দেখি, একটা আস্ত গোল্ডফ্লেকের টিন কাটার দিয়ে নিখুঁতভাবেব কেটে ফেলে পুলকেশ একটা সিগারেট ধরিয়েছে। হরিদ্রাভ টিনের পাশে পড়ে আছে আমস্ট্রাডামে-কেনা জাস্টিস গুহনিয়োগীর, স্বচ্ছ নীল কাচের গ্যাস-লাইটার, সৌন্দর্যে যা সত্যিই অবিস্মরণীয়। তখনও, সেই ১৯৫২-র কলকাতার ফুটপাতে শুধু টিনের কেরোসিন-লাইটার বিক্রি হয়। ক্বচিৎ পেট্রল।

লাইটারে নীলাভ গ্যাসের মধ্যে ভাসছে প্লাস্টিকের আকাশ-কুসুম।

সম্ভবত ওর সেদিনই হাতে-খড়ি। প্রায় পুরোটা সুখ-টানে টেনে, এমনকী বহু ব্যর্থ প্রয়াসের পর গোটা দুই আস্ত রিঙও ছেড়ে, সে সিগরেটটা আমার দিকে এগিয়ে দেয়।

আমি তো কেশে-টেশে অস্থির। কাশবই তো। নেড়ি যে।

তারপর, অ্যাশট্রেতে সিগারেটটা পিসে আমি আমার সেই প্রথম এবং সম্ভবত শেষ চ্যালেঞ্জটি ওর দিকে ছুঁড়ে দিই।

'কিন্তু পুলু, যারা ল্যাটা', আমি সতর্কভাবে শুরু করি।

'যারা ল্যাটা?'

'হ্যাঁ, ল্যাটা যারা। তাদের সম্পর্কে বইতে কিছু লেখা আছে কি? তারা তাহলে কোন হাতে খাবে?'

যা বলছিলাম। পেডিগ্রি-কুকুরদের কথা। যা আমি খাই না, যা আমি পরি না, সেখানে আমি যাইনি বা আমি পড়ি না—সে সবের অস্তিত্ব নেই। এ-রকম স্নবারি নিয়ে এদের অনেকেরই দিব্যি কেটে যায়। আর কুকুর-জীবন ওদেরও একটা বই তো নয়। আর তা বেশ ছোটই। বরং আমরা নেড়িরাই বেশি বাঁচি।

কিন্তু অস্তিত্ব না থাক, ওদের ধারণার বাইরে যা, তারও গুরুত্ব আছে। এবং সে-রকম গুরুতর কিছু—ওদের সেইসব অস্বীকারের দিক থেকে—হঠাৎ মূর্তি ধরতে দেখলে এরা কী রকম ঘাবড়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ কী অসহায়ভাবে আত্মরক্ষাপ্রবণ হয়ে পড়ে! অনেক সময় শেষ বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে। পুলকেশের জীবনে এমনি একটা ঘটনা ওর সিফিলিশ হবার ব্যাপারটা। (সে-গল্প আর একদিন বলব'খন)। বরং, এখানে মেরি আঁতোয়ানেৎ-এর কথাটাই যদি ধরি। লোকের রুটি-ফুটিও থাকে না, এ ছিল রানীর ধারণার বাইরে। তাই-না বলেছিলেন, 'তা ওরা কেক খেলেই তো পারে।' কী যাচ্ছেতাই ব্যাপার হল শেষ পর্যন্ত?

তুলনায়, যা সেদিন ঘটল, সেটা যদিও সামান্য ঘটনা, কিছুই নয় বলতে গেলে।

পুলকেশ স্তম্ভিত, প্রায় প্রস্তরীভূতভাবে আমার দিকে ততক্ষণ তাকিয়ে রইল, যতক্ষণ না ওর ছাড়া শেষ রিঙটা উড়ে গিয়ে ধাক্কা মারল পিয়ানোর ওককাঠের আত্মীয় শরীরে এবং ভেঙে গিয়ে ফের পরিণতি পেল বিমূর্ত ধোঁয়ায়। মিলিয়ে গেল।

'তু-তুই ল্যাটা নাকি?'

সদ্য ক্লাস এইটে উঠে এই প্রথম আমরা এক সেকসনে। বসি দূরে দূরে। ওর জানার কথা নয়।

'আ-হ্যাঁ!'

'ল্যাটা হয়ে তুই এতক্ষণ ডান হাতে ছুরি চালালি?'

'হ্যাঁ-অ্যাঁ।' গালে জিভ বুলিয়ে দুষ্টু, কেমন-জব্দ হাসি হেসে আমি বলি, 'খেলাম! তাতে হয়েছোটা কী?'

কিন্তু পুলকেশ অত সহজে ব্যাপারটা নিল না। দা নিউ ইংলিশ লাইব্রেরি প্রকাশিত 'অন টেবিল-ম্যানার্স অ্যাট ডিনার অ্যান্ড লাঞ্চ' নামে ড্যানিয়েল ডালটনের সচিত্র বইটি যাদের কথা লিপিবদ্ধ করতে ভুলে গেছে, তাদেরই কারও ভূত যেন তার চোখের সামনে! ল্যাটা হয়েও আগগোড়া ডান হাতে ছুরি ধরে প্লেট সাফ করে—আমি যেন তার গোটা অথরিটিতেই ঠাট্টাচ্ছলে চ্যালেঞ্জ করে বসে আছি।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল পুলকেশ। কিছুক্ষণ তারপর হঠাৎ, সেদিনই প্রথম, বেদির তিনটে ধাপ গটগট করে উঠে পিয়ানোর গিয়ে বসল। মনে হল, ওয়ালৎস-এরই সুর সে বাজাচ্ছে। অনেকটা 'পুরানো সেই দিনের কথা'-র সুর।

নানা দিকে প্রতিভা ছিল পুলকেশের। ছবি তখন থেকেই আঁকত। রেজাল্ট বরাবরই ভাল, সেভেনে ফার্স্ট হয়েছিল। থার্ডের নিচে যায়নি কোনওদিন। স্কুল ফাইনালে দুটো লেটার পায়।

সে যখন, 'আয়, আর একটিবার আয়রে সখা' বাজাচ্ছে, তখনই আমি ঠিক করি জীবনে আর কখনো ওর অথরিটিকে চ্যালেঞ্জ করব না। ওর ভুল ভাঙাব না। যদিও পিয়ানোটা সে একদম বাজাতে পারত না।

শারদীয় প্রতিক্ষণ, ১৯৯০

ফুটবল খেলার শব্দ

ধূর্জটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক একটাই। কে কাকে মারবে। আমি ধূজটিকে। না, ধূর্জটি আমাকে।

অথচ, অফিসসুদ্ধ লোক জানে, এ-অফিসে আমার যদি একজন বন্ধু থাকে, সে ধূর্জটিপ্রসাদ। অফিসের বাইরে আমাদের যে চেনা-জানার জগৎ, তারাও তাই জানে। আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরও একই ধারণা। শুধু আমি জানি আর ধূর্জটি জানে যে আমরা তা নই। আমরা দুজনে অপেক্ষা করছি একে অন্যের ধ্বংসের জন্য। যে, কে কার যমে-ধরা দেখে যাব। যেন, এটা দেখব বলেই আমাদের এই বেঁচে থাকা। আমাদের বেঁচে থাকার এটাই যেন একমাত্র মানে। ভাসমান ঊর্ণাজালের কেন্দ্রে এক রহস্যময় জিজ্ঞাসাচিহ্ন আমাদের সামনে। সবসময়। যে কে আগে। আমি না ধূর্জটি।

এমনিতে ধূর্জটি আমার ক্ষতি কিছু করেনি। সে যে করার তা করে গেছে। এবং সবকিছুই করে গেছে আমার চোখের সামনে। লুকিয়ে কিছু করেনি। সে যে তার কৃতকর্মের কারণে কতবার আমাকে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে, তাও সে নিজে জানে না। তার চোখের সামনে আমি বারবার জ্বলে গেছি। সে তা দেখতেও পায়নি। এ-দিক থেকে ভাবলে, তাকে দোষ দিই বলে হয়ত আমি নিজেই দোষী।

'আজ আমার ডেট।' ধূর্জটি আমাকে বলল। অফিসে।

'ডেট? সে তো মেয়েদের হয়!' আমি ঠাট্টা করে বন্ধুকে বলতেই পারতাম। কিন্তু আমি জানি, ও কী বিষয়ে বলছে।

'আজ নমিতা আসবে।' ধূর্জটি বলল।

সামান্য কথা। এর মধ্যে বিদ্বিষ্ট বোধ করার কী থাকতে পারে? কিছু না। কিন্তু আমি দেখতে পাই, আমি স্বচক্ষে দেখতে পাই, ওর অদৃশ্য ঠোঁট চাটা। আমার তৃতীয় কর্ণ সম্পূর্ণ

অন্য কথা শোনে। 'আজ আমার নমিতাকে ঝাড়ার দিন'—আমি স্পষ্ট শুনতে পাই।

আমি জ্বলে যাই এই কারণে। বা, কারণ-ফারণের কথা আর-তুলে লাভ কী। আমি তো দেখি, যে আমি, আমি জ্বলছি! আর যে আমাকে জ্বালায়, সে তা দেখতে পাচ্ছে না। বস্তুত, দেখতে তো পায় না কেউই। তাহলে অন্তত অনি ছুটে আসত বালতি ভরতি জল নিয়ে, আমার ছেলে যখন বাড়িতে সে-কথা মনে হলে পুনর্বার জ্বলে উঠি এবং চিৎকার করে বলে উঠি—'না'! এটা সবাই শুনতে পায়। রান্নাঘর থেকে মালবিকা ছুটে আসে। অনি 'স্পোর্টসম্যান' থেকে মাইনাস-চার চশমার ওপর চোখ তুলে জানতে চায়, 'কী হল বাবা?'

আমি হাসতে হাসতে বলি, 'না!'

'কী না?'

'কিছু না।'

নমিতা কি আমার কেউ? কেউ না। ধূর্জটিকে ডেট জানাতে মাঝে মাঝে আসে অফিসে। ধূর্জটির ঘরে। এই পর্যন্ত। আমি থাকলে দেখা হয়। মনে পড়ে রোগা বউটি যেদিন প্রথম কোনও সূত্রে ওর মহানুভবতার কথা শুনে ধূর্জটির ঘরে এলে। ওর গ্র্যাজুয়েট স্বামী জুট মিলে চাকরি করত। গেছে। আট মাস বেকার। মনে পড়ে, প্রথম দিন নমিতার পরনে ছিল প্রায়-বেনারসী। বুঝেছিলাম, আটপৌরে শাড়ি বলতে ওর আর কিছু নেই।

কিছুদিনের মধ্যেই, নমিতা আর বরেন দুজনে এল ওকে প্রণাম করতে। এইচ ডি এফ সি-তে ধূর্জটির বন্ধু রমানাথের অফিসে আপাতত বরেনের পিয়নের চাকরি হয়েছে। তা হোক। মাসে ১১০০। আনন্দের কথা।

ধূর্জটির মুখটুকুও সাফল্যে উদ্ভাসিত। যেন, সে-ই চাকরি পেয়েছে। সস্নেহে বরেনের কাছে জানতে চাইল, 'কী রে, কবে খাওয়াচ্ছিস?'

আগের দিনও 'আপনি' বলেছে। বরেনের পকেটে প্রথম মাসের মাইনে। চেয়ার থেকে অর্ধেক উঠে বলল, 'এখুনি! চলুন দাদা।'

ধূর্জটি বলল, 'তুই যা ভাগ। আজ আমার মেয়ে আমাকে খাওয়াবে।'

বরেন টাকা বের করতে যাচ্ছে, ধূর্জটি চোখ পাকিয়ে বলল, 'ফের! তুই যা। কেটে পড়। আমার গাড়ির গ্যারেজ ওদিকেই। কুঁদঘাটে। কুমুদ পৌঁছে দেবেখন।'

ঠিক পরের দিন। ধূর্জটি আমাকে বলল, 'সাক করানোর পক্ষে অন্ধকার প্ল্যানেটেরিয়ম একটি উৎকৃষ্ট জায়গা।' আর কিছু বলল না।

সেদিনই প্রথম, বাড়িতে ঘুমের ঘোরে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'না।'

মালবিকা বুকে নাড়া দিয়ে আমাকে জাগিয়ে তুলল। জানতে চাইল, 'কী? স্বপ্ন দেখছিলে?'

আমি হেসে বললাম, 'না।'

মালবিকা জানতে চাইল, 'কী না?'

আমি বললাম, 'কিছু না।'

আমাদের ঘুষের অফিস। আর এই ঘুষ-অফিসে ধূর্জটি আমার বস। মস্ত ঘরে রিভলভিং চেয়ারে বসে সে দোল খায়। বড়সড় টেবিলের এপার থেকে সবাই ওকে 'সার' বলে। ডেকোলাম-টপ টেবিলের ওপর দিয়ে মসৃণভাবে প্যাকেটের পর প্যাকেট 'ক্লাসিক' ওর দিকে এগিয়ে যায়।

শুধু আমাকে 'সার' বলতে দেয় না। আমি ওকে ওর ঘরেও নাম ধরে ডাকি। আমাদের নিবিড় বন্ধুত্ব।

আর একে মর্যাদা দিতেই তো ও আমার কাছে কিছুই লুকোয় না। আমার উচিত ওর নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের যোগ্য হয়ে ওঠা। নিঃস্বার্থ? সত্যিই তাই। এর মধ্যে একদিন ট্রিংকাজে খুব মদ খাওয়াল। নেশার ঝোঁকে আমি জানতে চেয়েছিলাম, 'তুমি আমাকে এত ভালবাস কেন। ধূর্জটি?'

'আর-এ তুই যে অবি। অবিনাশ। আর আমি ধূর! ধূর্জটি!' ধূর্জটি আবেগময় ভাবে জানাল, 'সেই জন্যে।'

জয় করে নিল আমাকে। মাত্র একটি সংলাপে।

তবু আমি জ্বলে যাই। বারবার। কেন যে। সত্যিই তো নমিতা আমার কে। কেউ-না।

ধূর্জটি যা করে সব আমার সামনে করে। অফিসসুদ্ধ সবাই জানে সে ঘুষ নেয় না। এটা ওপরঅলারাও জানে। তার সুনাম মন্ত্রী-লেভেলেও পৌঁছে গেছে। তড়িঘড়ি প্রোমোশন হয়েছে। লাখপতি, মতান্তরে অর্ধকোটিপতি, ইনসপেক্টর গোপাল ব্যানার্জিকে পুজোর আগে ডেকে সে বলল, 'গোপাল, তুমি তো জানো তোমার বউদিকে। মাদার টেরিজা! লিচুবাগান বস্তির সমস্ত ছেলেমেয়ের মা। ওখানে স্কুল করেছে।'

গোপাল বলল, 'হ্যাঁ সার। সে তো জানি। শুনেছি। উনি তো সাক্ষাৎ দেবী।'

'হ্যাঁ। এইসব দেবদেবী নিয়ে তো যত ঝামেলা। এবার পুজোয় সবকটাকে নতুন জামাকাপড় দেবে বলছে। লিস্টও করে দিয়েছে একটা। এই দ্যাখ।' বলে একটা ফর্দ বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ওর তো ছেলেপুলে নেই!'

গোপাল বলল, 'সে কী সার। বলুন কতজন। কত টাকা লাগবে। আমরা আছি কী করতে।'

ধূর্জটি বলল, 'বিরাট বস্তি। ছেলেমেয়ে তিনশ। তোরা কিনে দিলেই ভাল হত। কিন্তু সাইজ-ফাইজের ব্যাপার আছে।'

'পার হেড ৩০ টাকা করে ধরি?'

'হ্যাঁ-তা...' ধূর্জটি বলল, 'কম-বেশি করে ওতেই হয়ে যাবে। আর কিনবে তো মঙ্গলাহাট থেকে। পাইকেরি হিসেবে।'

বেশি না, পুজোর মুখে নিষ্পাপ ন-হাজার টাকার ব্যবস্থা করল ধূর্জটি। এক কথায়। এবং আমার চোখের সামনে। লুকিয়ে তো করল না।

দিন দুয়েকের মধ্যে গোপাল আর দু-তিন জন ইনসপেক্টর 'মাদার টেরিজা'কে টাকাটা বাড়িতে দিয়ে এসেছে শুনলাম। বউদি মাংস-লুচি খাইয়েছে ওদের। ওরা বলল। সাক্ষাৎ সারদা-মা! ওরা কেউ ভুলেও আন-কথা কিছু ভাবেনি। এমনিই ভাবমূর্তি ধূর্জটির অফিসে।

আমি গোপাল হলে ওই ন-হাজার টাকার ফ্রক আর প্যান্টুল ডাঁই করে রেখে আসতাম ওর বাড়িতে। চলে যাক শেওড়াফুলি। ফুলিয়া, কি ফুলেশ্বরে। দিনভর হাটের রোদে দাঁড়িয়ে মাল বেচে আসুক।

আমি যে এ-ভাবে ভাবি, সব টের পাই ও ভাষান্তরিত হয়ে তার প্রত্যেক কথা যে আমার তৃতীয় কানে এসে বাজে, ধূর্জটি এটা জানে। সে যত জানে, তত বেশি বেশি করে আমার সামনে এইসব করে। অনবরত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়।

আর আমি যাই জ্বলে। আমরা এক এক-সময় মনে হয় ওরও একটা দিব্যদৃষ্টি অছে। সে তা দেখতে পায়। আগুনের মধ্যে আমাকে। এবং পায়ের ওপর পা তুলে সে তা দেখে। দেখতে মজা। নিঃসন্দেহে। আমিও তো সেইজন্যে বেঁচে আছি। ধূর্জটি জ্বলবে। আমি দেখব। আমার বেঁচে থাকা সার্থক হবে।

একদিন অফিস যেতে একটু দেরি হয়েছে। গিয়ে দেখি ছুটি হয়ে গেছে। ডিপার্টমেন্টের

স্টোরকিপার নির্মল মারা গেছে। অফিস প্রায় ফাঁকা। ধূর্জটির ঘরের সামনে আলো জ্বলছে। 'এনগেজড'। সাধারণত মিটিং চললে এমনটা হয়। ওর অর্ডার্লি পরশুরাম খৈনি ডলছে বাইরে বেঞ্চিতে বসে।

ঘরে ঢুকে দেখি নমিতা বসে আছে। একা। অ্যান্টিরুম দেখিয়ে বলল, 'ভেতরে আছে।' বলে, একটু পরে আমি যে দৃশ্য দেখব, সেই কথা ভেবে, সেইরকম হাসল।

সে হাসি যে ঠিক কী-রকম, তা আমি বলতে পারব না। একটু দুর্বিনীত ঠিকই। কিছুটা কঠিন। কিন্তু ঠিক যে কী, তার নাম দিতে পারার আগেই সে অনির্বচনীয় ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল।

ধূর্জটি বেরল নমিতার মেয়ে পুতুলের সঙ্গে। আগেও একদিন মেয়েটিকে দেখেছি। সেদিন ফ্রক পরে এসেছিল। ঘরে কেউ ছিল না। আমি ছাড়া। ধূর্জটি বলেছিল, 'এ তো বেশ বড়সড় হয়েছে দেখছি। একে আর ফ্রক পরাচ্ছিস কেন? শাড়ি-ব্লাউজ পরা!'

মেয়েটি সসঙ্কোচে তাকিয়েছিল তার বুকের দিকে। শাড়ি পরে থাকলে নিশ্চয়ই আঁচল টেনে দিত বুকে। উচিত কথাই বলেছে ধূর্জটি। সত্যিই ফেটে বেরুচ্ছে। এবং এর অবিলম্বে শাড়ি পরাই কর্তব্য।

'এর কত বয়স হল রে?'

'পনের।'

'বাব্বাঃ। এই বয়েসে এত বাড়। শাড়ি পরা! শাড়ি পরা!' ধূর্জটি বলল নমিতাকে। আমি সেদিনই প্রমাদ গুনেছিলাম। সন্দেহাতীত থাকার জন্যে ধূর্জটি নমিতার সঙ্গে তুই-তোকারি করে। কিন্তু, আমার সামনে কেন যে। আমি তো ওর হদ্দমুদ্দ সব জানি। আর ও-ও তা জানে। শুধু আমিই পারি ওকে ধরিয়ে দিতে। কিন্তু কার কাছে? আর ধরবেই-বা কেন। এটা অবশ্যই যে, ওর অপরাধগুলোর প্রত্যকটি ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের কোনও-না-কোনও ধারায় পড়ে। যেমন, এখন যা করে এল। ওর অ্যান্টি-চেম্বারে। যদি করে থাকে। সশ্রম কারাদণ্ড। সাত না বার? যাবজ্জীবনই-বা নয় কেন। সরকারি অফিসের মধ্যে অপ্রকাশ্য দিবালোকে পনের বছরের কিশোরীকে বলাৎকার। কেন ফাঁসি নয়? কেন নয় রগে-বুলেট? ওর মুণ্ডু ফুটবল খেলতে দিক আমার ছেলেকে। নামকরা স্ট্রাইকার। আমি তার মাথায় রাজছত্র ধরে সঙ্গে সঙ্গে ছুটব।

কিন্তু প্রমাণ কই। তার চেয়েও বড় কথা, আমার প্রয়াস কই। কখনো তো কিছু করি নি। বলিনি। আর...নমিতা কি রাজি হবে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে। আমি জানি হবে না। আমি কত ঠিক জানি, একটু পরেই বুঝতে পারলাম।

ধূর্জটি আমাকে দেখে একটুও অপ্রস্তুত হল না। তার চোখে সানগ্লাস। খুলে দেখাল 'কনজাংটিভাইটিস'।

তার দু-চোখ, হ্যাঁ, এর একটা নাম হয়। ভয়াবহ লাল। চোখের চারিদিক ফুলে কালো হয়ে রয়েছে। তার চোখের চেহারা দেখে, রেপ ভুলে, আমার মনে হল, আহা, বাচ্চা মেয়েটার কনজাংটিভাইটিস হবে রে।

পুতুল মুখ নিচু করে বসে। কবারই ধূর্জটি আমাকে বলেছে, নমিতা বড্ড মুটিয়ে যাচ্ছে। ওকে এবার কাটাব। নিশ্চিত নমিতাকেও বলেছে সে-কথা। ওই দেখ, টিকে যাবার সম্ভাবনা পূর্ণিমার চাঁদের মতো তার দিগন্তে জেগে উঠে ইতিমধ্যেই কেমন আলো বাড়াচ্ছে।

নমিতা মেয়েকে নিয়ে চলে গেল।

'আসছি কাকু।' যাবার আগে পুতুল বলে গেল আমাকে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে

গেল ধূর্জটিকে।

সন্ধেবেলা আমরা বসলাম অ্যাস্টরে।

ধূর্জটি জানাল, দিনকয়েকের জন্যে সে যাচ্ছে শান্তিনিকেতনে। বাড়িটা তো হয়েই গেছে। টুকটাক কাজ যা বাকি আছে, সেরে আসবে। সঙ্গে যাচ্ছে নমিতা।

'ওর স্বামী কিছু বলবে না?'

'বরেন কী বলবে? হাঃ। ওর চাকরি করে দিয়েছি। শিগগির ক্লারিকাল পোস্টে যাচ্ছে। তাছাড়া ধূর্জটি বলল, 'নমিতা তো যাচ্ছে রান্নাবান্না করতে। মালবিকা যেতে পারছে না, তাই। ওর বস্তির স্কুলে ফাংশান।'

'ও কী ভাববে।' টেংরি কাবাব থেকে বেশ খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে, নানের টুকরো মদে ভেজায় ধূর্জটি। ক্লাসিকের প্যাকেটটা ঠেলে দেয় আমার দিকে, 'নমিতা তো', হাঃ হাঃ করে হাসতে থাকে ধূর্জটি, 'নমিতা তো, ভাইফোঁটার দিন গরদের পাঞ্জাবি আর ধাক্কা-পাড় ধুতি নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসে। ফোঁটা দেয়। গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করে। স্ত্রী ভাববেটা কী। স্কোপ কোথায়?ও জানে, ভালই থাকব কদিন। ভাল খেতে-দেতে পাব। এইসব বাঁজা বউ, বুঝলে হে, হাজবন্ড এদের কাছে সেকেন্ড চাইল্ড!'

গ্লাস শেষ করে ধূর্জটি বলল, 'পুতুলও যাচ্ছে।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, 'না।' ধূর্জটি বলল, 'কী না?'

আমি হেসে বললাম, 'না। কিছু না।'

আমাদের চেতলার ফ্ল্যাটবাড়ির লাগোয়া চারতলা পর্যন্ত একটা নতুন ব্লক উঠছে। দোতলা অবদি উঠিয়ে বাড়িঅলা কাজ বন্ধ রেখেছেন। তিনতলা পর্যন্ত বিম লেগে গেছে। রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আমি সেখানে গিয়ে বসলাম। মালবিকা ঘুমিয়ে পড়েছিল। ছেলে অনি সেকেন্ডারি দেবে। সামনেই টেস্ট। সে পড়াশোনা করছে। লোডশেডিং। তবে ইনভার্টারে দুটি পয়েন্ট জ্বলে। তারই একটি অনির ঘরে জ্বলছে। বাকি ফ্ল্যাট অন্ধকার।

মালবিকা শোবার আগে ডাকতে এসেছিল।

'কী ব্যাপার, শোবে না?'

'তুমি যাও। আমি পরে আসছি।'

'কী ভাবছ বল তো?'

আমি বললাম, 'না।'

'কী না?'

আমি বললাম, 'কিছু না।'

ছেলে অনির্বাণ এল আরও রাতে।

'বাবা?'

'কী রে।'

'বসে আছ যে।'

'এমনি।'

'শুতে যাবে না?'

'না।'

'এখানে তো অন্ধকার।'

'অন্ধকারই ভাল লাগছে বাবা। তুমি শুয়ে পড়। কাল আবার পড়বে।'
'তুমি যাবে না?'
'না।'
'আজ কী হয়েছে তোমার বল তো? রাত একটা হল।'
'কিছু না।' আমি বললাম, 'তুমি শুতে যাও।'

শেষ রাতে আবার এল অনি। আমাকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে ওর ঘুম ভেঙে গেছে।
বলল 'বাবা।'
'বল রে।'
'তুমি এখনো জেগে?'
'হ্যাঁ রে।'
'কী হয়েছে তোমার?'
'কই, কিছু তো হয়নি।'
'না-না। বল কী?'
'আজ ঘুম আসছে না রে। এলেই যাব।'
'অন্ধকার সারারাত বসে থাকবে?'
'অন্ধকার ভাল লাগছে। বাইরে হাওয়া। সুন্দর লাগছে।'
'কী হয়েছে তোমার বল তো?'
'বললাম তো।' আমি বললাম, 'কিছু না।'

'কী, কিচ্ছু না?' অনি গলা চড়িয়ে ধমক দেয় আমাকে। আমি চমকে ওর দিকে তাকাই। এমন আক্রমণাত্মক ভাবে তো কখনো বলেনি। আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ওর গলা এত গম্ভীর হল কবে। দেখলাম, পূর্ণিমার জোরালো আলোয় কাঁধের কাছে ওর চোখ, ওর পেশির ঘাম ঝকঝক করছে। বিমের ছায়া আড়াআড়িভাবে এসে পড়েছে আমাদের মাঝখানে। বেড়ে চলেছে।

চাঁদ অস্ত যাচ্ছে।

ইজিচেয়ারে পাশে, আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল অনি। নিশ্বাস ভরে বক্ষপুট বিস্তৃত করল। এমনভাবে যেন বুক দিয়ে এখুনি একটি থ্রু-পাস ধরবে।

'নিশ্চয়ই কিছু।' অনি বলল, 'তুমি বল আমাকে। কী হয়েছে, বল।'
আমি বললাম, 'কী বলব?'
অনি বলল, 'ওই। যা হয়েছে।'

আমার চোখের সামনে আবার ভেসে ওঠে সেই ঊর্ণাজাল। যার কেন্দ্রে মাকড়শার বদলে সেই রহস্যময় জিজ্ঞাসা চিহ্ন। কে আগে। আমি না ধূর্জটি?

আমি কি ধরিয়ে দেব ধূর্জটিকে? এই তো সুযোগ। সব কথা খুলে বলার। অনিকে। অনি স্ট্রাইকার। ও পারবে।

অনি শান্তিনিকেতনে যাক। একদম হাতে-নাতে ধরুক শালাকে। ধরে আনুক। ধূর্জটির মুণ্ডু নিয়ে অনি যখন ফুটবল খেলবে, বল নিয়ে ড্রিবল করে এগিয়ে যাবে গোলপোস্টের দিকে। আমার তো ছুটে ছুটে ওর মাথায় রাজছত্র ধরার কথা।

'হয়নি তো কিছু।' আমি বললাম, 'না কিছু না।'

শারদীয় প্রতিক্ষণ, ১৯৯১

সেইসব আত্মহত্যা

"এত ভালবাসা ব্যাপারটা এটা যদি না থাকত", পিনাকী বলল, "তাহলে জীবনের তিনপো ঝামেলা চুকে যেত। ঠিক কোন টাইম থেকে এই জিনিসটা ইন্ডিয়ায় আমদানি হল, তুমি বলতে পার বাচ্চুদা? তোমরা তো লেখো-টেখো।"

আজ পিনাকী আর মালার বিয়ের পঞ্চম বছর। সে-কথা জানিয়ে, সকালে ফোন করেছিল মালা। সুদেষ্ণাকে বলেছে, "আপনি আর বাচ্চুদা আসুন। একটু গল্পগুজব করে আমরা কোথায় খেতে যাব।"

"আর কে-কে আসছে?" সুদেষ্ণা জানতে চেয়েছিল।

"কেউ না। শুধু আপনারা।"

"শুধু আমরা?" সুদেষ্ণা শুনে অবাক। "কেন?"

"ও নিজেও জানে না আজ আমাদের বিয়ের দিন। ভুলে গেছে। অনেকে এলে বুঝতে পারবে। দেখবেন", মালা মনে করিয়ে দিয়েছে, "কোনও প্রেজেন্ট-ট্রেজেন্ট আনবেন না যেন। তাহলে বুঝতে পারবে। আগের বছরগুলো ও-ই মনে করে সেলিব্রেট করেছে। মনে ছিল। এবার একদম ভুলে গেছে। কাল মনে করিয়ে দিয়ে লজ্জায় ফেলতে হবে। খুব লাভ-লাভ করে তো।"

সাদার্ন অ্যাভিনিউ-এর মাঝামাঝি দশতলায় পিনাকীর ফ্ল্যাট। আমরা রাস্তার ধারে বারান্দায় বসেছি। অনেক নিচে রাস্তা দিয়ে গাড়ি আর বাস যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। এঁকে-বেঁকে একে অন্যকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার নিঃশব্দ প্রতিযোগিতা। উঁচু থেকে, গাড়িঘোড়ার গতিও অনেক মন্থর তথা ধীরস্থির লাগে।

এখানে ইঞ্জিনের শব্দ আসে না। বারান্দায় শুধু একটি ঢাকা ল্যাম্প-স্ট্যান্ডের অল্প আলো।

উপহার না আনলেও আমি একটা ছোট্ট প্রিমিয়াম হুইস্কি এনেছি। বাইরে খেতে যাবার আগে এ-টুকুই যথেষ্ট। আমাদের দুজনের পক্ষে। ওদের ফ্রিজ থেকে বেরিয়েছে এক বোতল ঠান্ডা বিয়ার। মালা আর সুদেষ্ণা ভাগাভাগি করে খাচ্ছে। কিচেন থেকে ট্রলি থেকে স্ন্যাকস দিয়ে গেছে। যার মধ্যে রয়েছে বাড়ির তৈরি ফিস চিলি।

"কোন টাইম থেকে?" আমি হেসে বললাম, "এগজ্যাক্ট টাইমটা তো জানা নেই ভাই। তবে বাংলাদেশে বৈষ্ণব পদাবলী নাগাদ হতে পারে। কীঈ তার আগেও ছিল নাকি?" বলে আমি সুদেষ্ণার দিকে সস্নেহে তাকাই। সুদেষ্ণা বাংলার টিচার। বেশি কিছু জানার দায় তার নেই। সে শুধু হাসে।

"এক্কেবারে সেই শুরুর দিন থেকেই। যেদিন থেকে গড ক্রিয়েটেড উওম্যান", মালা হাসতে হাসতে পিনাকীর কান মুলে দিল, "বুঝলে? যত দিন যাচ্ছে, আমার কর্তাটি কেমন যেন লাভলু টাইপের হয়ে পড়ছে, বুঝলে সুদেষ্ণাদি?"

"লাভলু বলতে?" সুদেষ্ণা হি-হি করে হাসছে।

"মানে লাভ-সিক। যারা খালি লাভ, লাভ আর লাভ করে হেদোয়। লাভ ছাড়া উনি কিছু মানেন না। জানেন না।" সুদেষ্ণা বলল, "আজকাল।"

"কিন্তু সেইজন্যেই তো আমরা এখানে। বিয়ের আগে তো সেইরকমই কথা থাকে"।

পিনাকীর গলা একটু জড়ানো, "তা-ছাড়া কী। কী জন্যে, তুমিই বলো।"

"থামো তুমি। আর বোর করো না।" ফ্রিজ খুলে মালা নিজের জন্যে আর একটা বিয়ার আনে। সুদেষ্ণা সেই প্রথম গ্লাসটাই এখনো ধরে আছে।

"একেবারে প্রিমিটিভ স্টেজে এ-ঝঞ্ঝাট বোধহয় ছিল না, কী বলো?" সুদেষ্ণা আমার দিকে স্মিতমুখে তাকায়।

"আর-এ তখন কোথায়", পিনাকীর খালি গ্লাস ভরতি করে দিতে দিতে আমি বললাম, "প্রিমিটিভ-স্টেজে বেসিক আর্জ তো স্রেফ তিনটে। সেক্স, সিকিউরিটি আর হাঙ্গার।"

"তাহলে এই প্রেম-ফ্রেম" পিনাকী গ্লাসে লম্বা চুমুক দেয়, "এ—এটা ঠিক কোন টাইমে এল?"

"এই তুমি ইচ্ছে করে মাতলামি করছ। খালি এক কথা। এইটুকু খেয়ে" মালা ঠক করে বিয়ারের নতুন বোতলটা টেবিলে রাখে। রাগ পালটে গলাটা আদুরে করে বলে, "খুলে দাও।" অর্থাৎ বোতল। যেন পিঠের বোতাম খুলতে বলছে।

আমার আনা পাঁইটের প্রায় সবটাই পিনাকী মেরে দিয়েছে। তার একটু নেশা হওয়া স্বাভাবিক। যে-ভাবে বারবার ফস্কে আর অনেকক্ষণ ধরে ওপেনার দিয়ে সে বিয়ারের ছিপি খোলে, দেখে আমার তাই মনে হয়। খাবারও একদম ছোঁয়নি। কিন্তু মালা? তার ভাবগতিকও আজ ভাল নয়।

পিনাকী বলল, "আমাদের একটা জিন আছে না?"

"না, আর জিনফিন নয়।"

"হোয়াই নট, মাই লাভ।" পিনাকী উঠে গেল। পাশের ঘর থেকে চেঁচিয়ে জানতে চাইল, "বাচ্চুদা, তোমদের কবছর বিয়ে হয়েছে গো।"

"দশ বছর।" আমিও চেঁচিয়ে উত্তর দিই।

"দঅশ বছর! ডু ইউ লাভ ইচ আদার?"

এ-ঘরে আমি সুদেষ্ণার দিকে তাকাই। তার কী মতামত?

"আরে ভাই, আমাদের তো পুরনো চাল। ভাতে বাড়ছে—এই যথেষ্ট।"

বলতে বলতে জিনের বোতল ঝুলিয়ে পিনাকীর কাছিয়ে আসার অনুপাতে আমায় গলার স্বর নামিয়ে আনতে হয়।

জিন খুলে গ্লাসে ঢাকতে গিয়ে, না ঢেলে, সুদেষ্ণার চোখে চোখ আটকে পিনাকী জানলে চাইল, "আপনি কিছু বলুন বউদি?"

সুদেষ্ণা আমার হাত চেপে ধরেছে। আমিও মৃদু চাপ দিই তার হাতে। ওর হাত ধরে আমি বলি, "আমরা ঠিক আছি। তুমি বলো। তোমাদের নতুন বিয়ে।" "এই আর খেয়ো না। বাড়িতে খাবার নেই। আমাদের বাইরে খেতে যেতে হবে।" পিনাকীর পাশে বসে ওকে একটু হ্যাগ করে মালা বলল, "প্লিজ হোল্ড ইওর ড্রিঙ্কস।" তার কণ্ঠস্বর জড়ানো অনুনয়।

"কী ব্যাপার। পিনাকীর আজ হলটা কী?"

"এই দেখুন না।" মালার চোখের তারা ঘন, ঘোর কালো আর বড় বড়। পাতায় আইল্যাস। ভ্রূ প্লাক-করা। অন্তত একটি কটাক্ষ না করে সে সাধারণত কোনও সিরিয়াস কথাও বলতে পারে না; বা, শরীরের অতিপ্রশস্ত মধ্যদেশ বারেক না-দুলিয়ে। তার চোখ ছলছলিয়ে উঠল যখন সে বলল, "কাল ওকে বলে ফেলেছি যে বিশ্বজিৎ-এর আমলে ব্যবহার করতাম শুধু অ্যাভন-এর কসমেটিকস। মায় পারফিউম। বোম্বে থেকে আনাত।

আজকাল তো পাওয়া যায় না, তাই বলেছিলাম। আচ্ছা, বলো সুদেষ্ণাদি। একেবারে ভুলে যাব কী করে। এক-আধবার কি মনে পড়বে না?'' মালা একটু কেঁদেই ফেলল, ''তার সঙ্গেও তো চার বছর ঘর করেছি। একটা ছেলেও হয়েছিল, সব তো জানো তুমি। হি ইউজড টু লাভ মি অলসো।''

''নোও!'' পিনাজি গর্জন করে উঠল, ''দ্যাটস নো লাভ। দা ফেলো ইউজড্ টু বিট ইউ আপ। অ্যান্ড রেগুলারলি। পা ধরে টানতে টানতে বাথরুমে নিয়ে যায় নি? তখন জামাকাপড় ছিল গায়ে? মদ তো আমিও খাই।''

বিশ্বজিৎ সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু জানি না। শুনেছি, সি ই এস সি-তে মাঝারি চাকরি করত। আর, পিনাকী তো লারসন অ্যান্ড টুর্বোর প্রায় দত্তকপুত্র। ফ্ল্যাট, মারুতি—কী দেয়নি তাকে অফিস।

পিনাকীর গা ঘেঁষে বসল মালা।

''দাও। একটু জিন দাও আমাকে।''

''জিন? তুমি?''

''আর বিয়ার নেই।''

জিন ঢালতে ঢালতে পিনাকী বলল, ''দ্যাটস নো লাভ, আই টেল ইউ।''

''হতে পারে। কিন্তু তা বলে মনে পড়বে না?''

মুখের সামনে মৌমাছি তাড়াবার ভঙ্গিমায় দুদিকে হাত নাড়ায় পিনাকী, ''দ্যাটস নো লাভ।''

''না বিশ্বও আমাকে ভালবাসত। তার মতো করে।''

''মারধোর করে।''

''করে করত।'

মালা উঠে দাঁড়ায়। টোপাজ থেকে করিয়ে আনা চুল নিজের হাতে ঘেঁটে দিয়ে মালা বলল, তার চোখে প্রেতনীর আগুন, ''সে তখন তার বউকে মারত। তোম্‌মার কী!''

''দ্যাটস নো লাভ।'' ঠোঁটের কাছে গ্লাস ধরে রেখে শান্ত গলায় পিনাকী বলল। চুমুক না দিয়ে।

''হতে পারে। তোমাদের মতো সিভিলাইজড লোকদের কাছে তা হতে পারে। খুব স্বাভাবিক নয়ও ব্যাপারটা, আমি স্বীকার করছি। কিন্তু, সেটাও একধরনের ভালবাসা। আর মৃত্যু দিয়ে সে তা প্রমাণও করে গেছে।''

মৃত্যু? হ্যাঁ, ওদের বিয়ের প্রথম বছরটাও বিশ্বজিৎ মাঝে মাঝে হানা দিয়েছে। ওদের ফ্ল্যাটে। একবার মাঝরাতে দশতলায় উঠে এসে বেলে টিপে ধরে আছে তো আছেই। ভীষণ ড্রাঙ্ক। ভয়ে ওরা দরজা খোলেনি, গেট থেকে সিকিউরিটি ডেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল পিনাকী। আর আসেনি। এ-সব এক-কলেজের সুদেষ্ণার কাছে শোনা। বাবোর্নে সুদেষ্ণা পড়ত দু-ইয়ার উঁচুতে।

পিনাকী বোধহয় বাথরুমে যাবে। অনেকক্ষণ থেকে লটপটে মাথা নামিয়ে সে চটি খুঁজছে। কিন্তু পা দুটো কাছাকাছি আনতে পারছে না কিছুতেই। আমার মনে হল, চটি নয়, সে আসলে তার পা দুটোই এখনো খুঁজে উঠতে পারেনি।

''আসল কী জানেন দাদা'' পিনাকী মুখ তুলে বলল, ''আসলে কী জানো বাচ্ছু—দা... আসলে... আসসোলে...

যা বলতে চায়, তার মনে পড়ল, ''আসলে কী জানো। এই মালার টাইপটা হল

লাথখোর টাইপ। যে যত লাথ্থি মারবে সে তত—"

"শাট আপ, ইউ!" মালা ঠাস করে একটা, চড় নয়, থাপ্পড়ই মারল পিনাকীর গালে, "মাতলামি করার আর জায়গা পাওনি। ইতর কোথাকার।"

ওঠবার চেষ্টা করে সেই যে সোফায় এলিয়ে পড়ল পিনাকী, আর সাড়া নেই।

লুটানো শাড়ির আঁচল মাটি থেকে তুলে নিয়ে মালা ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করল। দুহাতে জড়িয়ে ধরল সুদেষ্ণাকে, "বলো, বলো, সুদেষ্ণাদি, মনে কি পড়ে না? হিরণদাকে মনে পড়ে না তোমার? বলো! তবু তো, তোমাদের বিয়ে হয়নি। আমি চার বছর ঘর করছি। আমাদের একটা ছেলে হয়েছিল। হার্টে ফুটো ছিল, নইলে আট বছর বয়স হত তার। আর বিশ্ব তো একটা প্রমাণ রেখে গেছে। তার আত্মহত্যা দিয়ে। যায়নি?"

হিরণের কথা সুদেষ্ণা আমাকে বলেছে। আমাদের বিয়ের আগে চার-পাঁচ বছর চুটিয়ে প্রেম করেছে তার সঙ্গে। চুমু-টুমু পর্যন্ত জানি। আর বেশি সে নেবা-আঁচে আমি ফুঁ দিইনি। হিরণ আছে বদরপুরে ইন্ডিয়ান পেপার মিলস-এ। প্রোডাকশন কন্ট্রোল-এ। কলকাতায় এলে আমাদের সঙ্গে সপরিবারে দেখা করে। আমাদের ছেলেমেয়েরা জু-তে যায়। আমরা বাইরে খেতে যাই। বিয়ের আগে লাবণির সঙ্গে প্রেম তো আমিও করেছি। হিরণের বউ মণিকার জীবনেও কি আর কেউ ছিল না? কই, আমাদের কোনও অসুবিধে হয় না তো। জীবনের মতো, আমরা জানি সম্পর্কেরও মৃত্যু হয়। আমি, মণিকা, সুদেষ্ণা, হিরণ—সবাই, সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছে তো সেইসব মৃত্যু। বা, সেই আত্মহত্যাগুলোই! যে কোনও অবস্থায় বেঁচে থাকতে আজও যেটুকু আগ্রহ আমাদের, সে তো সেইসব মৃত্যু আছে বলেই। বা, আত্মহত্যা।

মালা এখনও কাঁদছে। সুদেষ্ণা অন্ধকারে আমার হাত খুঁজে পেয়েছে এবং ধরে আছে। বাইরে একটা জোরালো হাওয়া উঠেছে অনেকক্ষণ। অনেক নিচে, রাস্তায় গাড়িঘোড়া কমে এসেছে। লোকজন কমই। মনে হয়, শেষ ডাবলডেকার শ্যামবাজার গেল। এত উঁচু থেকে লেকটাকে মনে হয় জঙ্গল। এত গাছ নাকি ওখানে। দিনের বেলা আমরা একটা-একটা করে গাছ পেরই। টের পাই না।

লেক থেকে জোরালো হাওয়ায় গাছের কটা পাতা উড়ে আসে বারান্দায়। পিনাকীর ঘুমন্ত গায়ের ওপর পড়ে। আরও পাতা উড়ে আসে। তারা আমাদের গায়ে এসে পড়তে থাকে। ঘরে ঢোকে। ওরা কেন আসে তা বলা মুশকিল। এর মানে কী, আমরা জানি না। কিন্তু ওরা আসে। আর... গাছের ঝরা পাতা মাত্রই তো মৃত।

যদিও ফাল্গুন, ঝড় উঠতে পারে। তাহলে আরও পাতা উড়ে আসবে। বারান্দা ভরে যাবে ঝরা পাতায়। তখন পিনাকীকে ধরাধরি করে ঘরে শুইয়ে দিতে হবে।

শারদীয় প্রতিক্ষণ, ১৯৯২

ভালো মানুষের জন্য ধ্বংসধ্বনি

নামকরণ

নাম বিলোচন ভট্টাচার্য। মধ্যবয়সি বাঙালি লেখক। লেখেন বা-লে বিলোচন নামে। এ নামেই প্রসিদ্ধি। বা-লে, বলা বাহুল্য, 'বাঙালি লেখক' অভিধার বিলোচনকৃত

আদ্যাক্ষরায়ণ। গুণমুগ্ধ সমালোচকরা প্রায়ই শুধু 'বা-লে' বলে উল্লেখ করে থাকেনএবং তার বেশি দরকারও হয় না। যেমন বা-লে'র শিল্প চেতনা, বা-লে'র কালজয়ী সৃষ্টি, বা-লে'র নিবিড় নির্মাণ ইত্যাদি। অধ্যাপক অণ্ডমনস্ক চক্রবর্তীর যে গ্রন্থটি গত বছর তাঁকে একাধারে ডক্টরেট ও বিদ্যাসাগর পুরস্কার এনে দেয়, তার নাম ছিল—বা-লে বরণ : আখেরিবাদের আলোকে।

শুধুই বা-লে। বিলোচন ছিল না।

বা-লে'র মতবাদ

প্রতিদিন জেগে উঠে বা-লে সুপ্রভাত জানান পূর্বের দিনটিকে। তাঁর মতে, এক-একটি প্রতিদিনের একমাত্র তাৎপর্য হল সেই দিনটির গোছানো আখেরে। বিগত দিনের গোছানো আখেরই আগামীকাল সূর্য হয়ে দিগন্তে জেগে ওঠে। তাঁর মতে। তাঁর এই জীবন-দর্শন 'আখেরিবাদ' নামে বহু-আলোচিত।

বা-লে'র মন

এ শুধু বা-লে জানেন যে, তিনি একটি মুণ্ডহীন ধড়মাত্র। মন যে মুণ্ডে থাকে না, এ-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। অতএব, অন্যথা আছে। যথা মন, প্লীহা, যকৃৎ, জঠর, জিহ্বা বা লিঙ্গ মায় পায়ুদ্বারেও থাকতে পারে।

যদি এমন হয় যে, মন অহর্নিশ শরীরের বাইরে কোথাও থেকে পরিবেশিত হচ্ছে, তাহলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বা-লে'র মন ও মনন হয়ত ঐসব অথবা এই দিক থেকেই। কেননা, তিনি মুণ্ডহীন।

শারীরিক প্রক্রিয়া

যথা, ভোরে শয্যাত্যাগ করে আড়মোড়া ভাঙা। হাই তোলা। ঢোঁক ও ঢেঁকুর। ক্বচিৎ হেঁচকি। হাঁচি, কাশি ও নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ। প্রক্ষালন—হস্তপদাদি ও মুখাবয়ব বা কেশবিন্যাস ও তাতে কলপদান। হাসি (হুঁঃ হুঁঃ হুঁঃ হুঁঃ)। বাতকর্ম ও কোঁৎপাড়া। উল্লেখ থাকে যে, বা-লে অদ্যাপি স্বহস্তে নিজ গুহ্যদ্বার নিজে প্রক্ষালন করে থাকেন।

অশ্রুপাত নেই বললেই চলে।

যৌনজীবন

ঊনপঞ্চাশৎবর্ষীয়া ও বহুধর্ষিতা স্ত্রী সুষমাকে ডাবল বেডস্প্রেড ভাঁজ করা ব্যাপারে সাহায্য করতে গিয়ে ক্রমশ কাছাকাছি এসে পড়া ও অষ্টম ভাঁজের সময়কালীন ফেস-টু-ফেস ঘনিষ্ঠতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়! উভয়ত। তারপর থেকে দাম্পত্যের কফিনের ওপর, তাঁরা দুজনেই, প্রতি রাত্রে একটি করে ফুল রেখে পাশাপাশি শুয়ে থাকেন। অর্ঘ্যকুসুমমাত্রই মৃত। কেননা, তাদের গাছ থেকে ছিঁড়ে আনা হয়।

বা-লে'র স্ত্রী সুষমা বাঁজা হলেও রত্নগর্ভা। কালক্রমে, টিভি, ফ্রিজিডেয়ার, ওয়াশিং মেশিন, সাউন্ড সিস্টেম, টেলিফোন, একটি মারুতি ভ্যান ও সুরেন টেগোর রোডে একটি দুই হাজার স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট আদি প্রসব করেছেন। সমস্তই নর্মাল ডেলিভারি।

বা-লে মনে করেন, তাঁর শরীরটা তাঁর নিজের। এবং তিনি ছাড়া আর কেউ এর হকদার হতে পারে না।

"আমার যখন অসুখ করে" বা-লে বলেন, "সবাই বলে তোমার অসুখ করেছে। কই, 'আমাদের অসুখ' বলে তো কোনও অসুখ নেই!" হক কথা। বা-লেকে এক আলোচনা চক্রে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "কিন্তু দেখুন, অধিকাংশ অসুখ হয়, এখন যা বলা হচ্ছে, মানুষের দুশ্চিন্তা, টেনশন এসব থেকে। এমনকি, ক্যানসারের কারণ নিয়ে গবেষণার একটা প্রধান দিক এই নিয়ে। ক্যানসার নাকি প্রকৃতপ্রস্তাবে দুশ্চিন্তা ও টেনশনমুক্তির জন্য শারীরকোষের গণবিদ্রোহ। তা, তাহলে, এজন্যে সমাজ, রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান—এগুলোকে দায়ী করা যাবে না কেন?"

উত্তরে হুঁ-হুঁ শব্দে হেসে বা-লে বলেন, "রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছি?"

বা-লে বিশ্বাস করেন, তাঁর অভিজ্ঞতা হল জীবনকে তিনি দু-চোখ দিয়ে যেটুকু দেখেছেন সেটাই।

কবি কিশোরকান্তি গুহ কথা তোলেন, "দেখুন, সমস্ত দেখার সঙ্গে অন্ধত্বের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে।"

বা-লে (সহাস্যে) : অন্ধ দেখবেটা কী করে?

কিশোরকান্তি : স্বপ্নে কি আমরা কিছু দেখি না! সবই স্পষ্ট দেখতে পাই। আর সে-সব তো দেখি চোখ বুজেই। দেখি না?

বা-লে : স্বপ্ন কবিতার বিষয়। গদ্য শুধু জেগে-থাকা নিয়ে। শুধু অভিজ্ঞতা নিয়ে। আমার দরকার শরীর। যা মনহীন। মুণ্ডহীন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাখতিন-বিশেষজ্ঞ ডঃ নিতম্বিনী নাইয়ার ইংরেজিতে জানতে চাইলেন, "কিন্তু দেখুন, দুচোখে অ্যাপিয়ারেন্স ছাড়া আর কী দেখা যাবে। তাছাড়া চোখও খারাপ হতে থাকে।"

সেদিন বা-লেকে আরও নানা প্রশ্নে জর্জরিত করা হয়। যথা: জ্ঞান বলতে কী। পূর্ব-নির্ধারিত বা পূর্ব-প্রচলিত যা—যা সবসময় সমাজ বা রাষ্ট্রকাঠামো বাঁচিয়ে রাখার জন্যে—তারই দাসত্ব করা কি? একজন মানুষের বেঁচে থাকা মানে কি শুধু আরও টাকা, আরও বাড়ি, আরও শিশ্নোদরতা—নাকি...

হিপোপটেমাসের মতো জল ঝেড়ে সহসা ডাঙায় উঠে পড়লেন বিলোচন। বললেন, "আচ্ছা আর সময় নেই ভাই। আর একদিন হবে।"

(স্বগত): আসলে হিংসে। বাড়ি করেছি কিনা। গাড়ি করেছি কিনা। তোমরাও তো একই জিনিস চাও ভাই। কিন্তু, তোমরা পারনি। হাঃ, তোমরা পারনি। আচ্ছা, চলি ভাই। বাই!

বা-লে'র মৃত্যু

১৯৯১ সালের ২৩ ডিসেম্বর। দিল্লিতে জ্ঞানপীঠ তদারকি সেরে, বা-লে সদ্য কলকাতায় ফিরেছেন। বন্ধু-বান্ধবরা ভাবী পদ্মভূষণকে ডেকেছিল অগ্রিম সম্বর্ধনা দিতে। স্থান: সাউথ ক্লাব। শীতের সকালে রুশি ভোদকা এবং অরেঞ্জ। সবাই ভোদকা খাচ্ছিল বলে বেশ একটা পেরেস্ত্রৈকা-আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল সেদিন।

সেদিন বা-লে গাড়ি পাঠিয়ে আমাকেও ডেকে নিয়ে যান। আমি সাহিত্য-পত্রিকায় সামান্য লিখিটিখি। একটি উপন্যাস ও একটি গল্পের বই। অবশ্য উদীয়মান বা এমনকি

প্রতিভাবান লেখক হিসেবেও আমাকে আজকাল চিহ্নিত করা হচ্ছে। বা-লে নিজেও আমার অন্তত একটি গল্প পড়েছেন বলে আমাকে জানিয়েছেন। বোধ হয় ভোদকার কারণেই সেদিন রাশিয়া প্রসঙ্গ উঠল। বা-লে কথকতা শুরু করলেন।

ব্যানার্জিদা বাঁক কাঁধে তারকেশ্বর যাবার মতো, বহুবার রাশিয়া গেছেন, এরকম উপমা অতিশয়োক্তি নয়।

"তখন ব্রেজনেভ। একদিন রাস্তায় দেখা। পুজোয় সময়। ট্যাক্সি ধরবেন বলে হিন্দুস্থান রোডে দাঁড়িয়ে গল্প। চারতলার বারান্দা থেকে শিল্পী মধু মুখার্জি বললেন, 'এই যে ব্যানার্জিদা, চললেন কোথায়?'

'এই একটু মস্কো যাচ্ছি ভাই।' ব্যানার্জিদা চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমার কাছে একটা গরমের কোট হবে?' (হাস্য)।

বিলোচন জানতে চাননি বলে তাঁকেও কিছু বলেননি এতক্ষণ। বিলোচন অবাক হয়ে দেখলেন, ওঁর কাঁধে একটা ফুলন্ত ঝোলা। এবং পায়ে কাবলি। হ্যান্ডলুমের পাজামা-পাঞ্জাবি। ঝোলায় বড়জোর একটা পুলোভাবে থাকতে পারে। যাই হোক, মধু মুখার্জি আর নিচে নামলেন না। ওপর থেকেই কোটটা ছুঁড়ে দিলেন।"

নিজস্ব বাকভঙ্গিমায় গল্পটি রীতিমতন রসস্থ করলেন বিলোচন। সবাই উপভোগ করল। ব্যানার্জিদা প্রেমময় দৃষ্টি বুলিয়ে বিলোচনকে বললেন, "তুমি লুফেছিলে!"

যাক, সে অনেককাল আগের কথা।

সেদিন রবিবার সাউথ ক্লাবের আড্ডায় রাশিয়া প্রসঙ্গ উঠেছিল। ব্যানার্জিদা টান দিয়েছিলেন একদম গোড়া থেকে।

"লেনিনও তো," ব্যানার্জিদা বললেন, "মার্কস থেকে নিয়েছিলেন শুধু প্র্যাকটিসটুকু। শুধু কাজটুকু হাসিল করেছিলেন। রেভোলিউশান! উনি মার্কসের থিওরি বুঝলেন কখন?"

প্রবাল সেনগুপ্ত ছিল নামকরা নকশাল নেতা। ব্যানার্জিদার দৌলতে, তাঁর মন্ত্রীবন্ধুর সুপারিশে সে জি ই সি-র পাবলিক রিলেশানে চাকরি পেয়েছে। এ পি আর ও। পেয়ে, অসি ছেড়ে বাঁশি ধরেছে। এখন সে পড়েছে তার বিপ্লবী অভিজ্ঞতারাশি নিয়ে। ইতিমধ্যেই, অনাথাশ্রম প্রকাশনী তার চারখানি উপন্যাস নামিয়ে দিয়েছে। এখন বিপ্লবীদের চেয়ে তার বেশি দরকার লেখকদের। ঘ্যাম সম্পাদক ও ঘাগি প্রকাশকের। কিন্তু তবু, সে একদিন জেল খেটেছে! গ্রামে সংগঠিত করতে গেছে কৃষকদের। বীরভূমের ছাগলনাদি গ্রামে বসে চেয়ারম্যান চারুর সঙ্গে পার্টি লাইন ঠিক করেছে। এই ব্যানার্জিদা তাকে পথ থেকে তুলে প্রাসাদে বসিয়েছেন। ভোদকায় লম্বা চুমুক মেরে সমর্থনের আশায় তিনি তাই তাকান শুধু প্রবালের দিকে।

কিন্তু, প্রবাল তাকিয়ে আছে সম্পাদক দীনবন্ধু পাঁজার দিকে। দীনবন্ধুর দপ্তরে তার 'সমাধিভূমিতে স্বাধীন পিঁপড়ে' নামে একটি গল্প পড়ে আছে। ছাপা হলে, সর্বাধিক স্বীকৃত 'বারাঙ্গনা'য় এটাই হবে তার প্রথম গল্প। তারপর আরও কবার গল্পের বাসন মেজে গেলেই, আসবে বাবুর বিছানায় ডাক। বছর ঘুরতে কোলজুড়ে ট্যাঁ-ট্যাঁ, পুজো-উপন্যাসের খোকা। বা-লের শুরুও তো এভাবেই। আজ কাঁখে-পো, কোলে-পো।

মন্ত্রীর সঙ্গে মোসাহেবি-সূত্রে ব্যানার্জিদার মাল বোতলবন্দি করার কারখানা। ব্যানার্জিদার সূত্রে তার চাকরি। এমনটাই হয়ে থাকে। তবে কিনা, ব্যানার্জিদার কাছ থেকে আর তো পাবার কিছু নেই। এখন দীনবন্ধু। যদিও বিধাতার মনে যে কী আছে, তা বোঝা

কঠিন কেন, প্রায় অসম্ভব। বউ-বাচ্চা সব্বার খবর নেন। কিন্তু, ছ-মাস হতে চলল, গল্প সম্পর্কে কোনওরূপ উচ্চবাচ্য করেন না তো, সে কী লিখছে, প্রকাশ্যে না হোক, নিচু গলাতেও জানতে চান না কখনো।

হাল ছাড়ার সময় তবু এখনো আসেনি।

ব্যানার্জিদার প্রশ্ন এড়িয়ে প্রবাল তাই দীনবন্ধুর ফেভারিট বিষয়ে চলে এল। সে বলল, "কিন্তু, এখানে কী হচ্ছে? এই জ্যোতিবাবু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যি। এরা তো না-মার্কসিস্ট, না-লেনিনিস্ট। এরা তাহলে কী?"

বলে সে বিলোচনের কাছ থেকে শেষ কথা জানতে চায়। এ-আড্ডার কলস্বরে শেষ কথা বলে থাকেন বিলোচন। মায়, দীনবন্ধুও তাতে সর্বক্ষেত্রে সায় দেন। কেননা, বলার আগে তাঁর মুখ থেকে একটি নিক্তি নির্গত হয়, বিলোচনের। সবাই দেখতে পায়। তাই, তারপর আর কেউ কিছু বলে না। এখানে এটাই ট্র্যাডিশন।

কিন্তু, বিলোচন আজ সে ধার দিয়েও গেলেন না।

"থাক থাক।" বুকের বাঁ-দিকে হাত রেখে বা-লে বললেন, "নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা বলা যাক। তারপর?" আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, "পর্বত, মুষিক প্রসব কবে নাগাদ করছ?"

সবাই হা-হা করে হেসে উঠল। আসলে কথাটা একটা খোঁচা। সম্প্রতি 'ছাইদান' নামে একটি সেলাইহীন ছোট কাগজের সঙ্গে কথোপকথনে, আমি বলেছিলাম, "সারা জীবন ধরে মাত্র একটি মহৎ উপন্যাস যে লিখে যায় সে মহান লেখক নয় ঠিকই। কিন্তু জীবনভর ১৫০ নভেল লিখেও যে একটিও মহৎ সৃষ্টি করতে পারে না, সেও লেখক নয়।" বা-লে প্রদত্ত একটি টিভি ইন্টারভিউ-এর কথা, বলার সময় আমার মাথায় ছিল।

বোঝা গেল, ছোট-কাগজে আমার এ নিভৃত কথোপকথনটিও বা-লে'র নজর এড়ায় নি।

পেশাদাররা এ-রকমই হয়ে থাকে। বিলোচন যে দিল্লিতে 'শ্বশুরবাড়ি' করেছে, শোনা যায়, তাও নাকি ভেবেচিন্তে। জ্ঞানপীঠ বা নিদেন পদ্মশ্রীর দিকে লক্ষ্য রেখে। কেননা, অ্যাকাডেমি-টেমি তো পাওয়া হয়েই গেছে। এই প্রবালই আমাকে এ-সব বলেছে। আজ বা-লে বলতে অজ্ঞান।

আড্ডা ২টো পর্যন্ত চলার কথা। সেদিন হঠাৎ উঠে পড়লেন বা-লে। তখন বেলা ১২টা হবে। সবাই বলল, "বসুন, বসুন।"

দীনবন্ধু বললেন, "বোস হে।"

কিন্তু বা-লে বললেন, "আজ একটা ইমপর্ট্যান্ট ট্রাঙ্কল আসবে। দেড়টা থেকে বাড়িতে থাকতে হবে।"

প্রবাল আমার কানে-কানে সশ্রদ্ধভাবে বলল, "দিল্লি থেকে।"

এ-পর্যন্ত সমস্ত বিল সই করে বা-লে বিলোচন উঠলেন। পরে মনে পড়েছে, পেন পকেটে গোঁজার পরেও হাতটা যেন বুকের কাছে কিছু বেশি সময় ধরে ছিলেন। কিন্তু মুখ দেখে তা বোঝার উপায় ছিল না। তখনও।

দারোয়ান নটবর দৌড়ে এল মিনিট চারেকের মধ্যেই। আমরাও ছুটে গেলাম।

স্টিয়ারিঙে মাথা রেখে শুয়ে আছেন বা-লে। চাবি ঘুরিয়েছিলেন। এঞ্জিন চালু রয়েছে। তাই স্টিয়ারিঙে রাখা তার উপুড় মাথাটা শেষ প্রণামের ভঙ্গিতে থরথর করে কেঁপে চলেছে।

আড্ডায় সেদিন ছিল তরুণ ডাক্তার বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি। সে যে এসেছিল, তা বোঝাই যায়নি। কারণ, একটা কথা বলেনি সারাক্ষণ। এই প্রথম সে কথা বলল। গোড়ালি ও গলাতেও নাড়ির স্পন্দন না পেয়ে সে বা-লে'কে 'মৃত' বলে ঘোষণা করল।

আমি শ্মশান পর্যন্ত গিয়েছিলাম। শবের গায়ে লম্বা স্ট্রাইপ দেওয়া তাঁর প্রিয় তসরের পাঞ্জাবি পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গলায় ছিল হিরের বোতাম। নববস্ত্র পরাবার পর, চুল্লিতে ঢোকাবার আগে, শ্মশান-পুরোহিত বাসাংসি জীর্ণানি থেকে বোতামগুলো খুলে নিতে নিতে বললেন, "পুরনো কলেবরের যা-কিছু সব আমার।" স্ত্রী সুষমা কিছু বলছেন না দেখে আমি জোর আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম। সুষমা আমার হাত চেপে ধরে বললেন, "ফলস্।"

আসলে বা-লে...

বা-লে ছিলেন আসলে একজন ভালমানুষ। সরল প্রকৃতির মানুষ। তিনি পুরুষ ছিলেন, না মেয়েছেলে, এটাই ছিল তাঁকে ঘিরে প্রকৃত রহস্য। যা অবিদিত থেকে গেল। তাঁর অভিজ্ঞতাকে তিনি ভেবেছিলেন কোলের শিশু। তাকে দু-হাতে তুলে ধরে নাচিয়েছেন। চুমু খেয়েছেন। দোল দিয়েছেন দোলনায়। এমনকি, তাঁকে স্তন্যপান করাতেও দেখা গেছে।

যৌনতাকে বোঝার সুবিধের জন্য পুরুষ ও নারী এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করে নেওয়া হয়। এমনকি মহামতি ফ্রয়েডও হিজড়েদের নিয়ে আলোচনা করতে ভুলে গেছেন। 'আসলে বা-লে' ব্যাপারটি তাই আজও বিবেচনাধীন।

বা-লে'র জন্য এপিটাফ

কে না জানে মানুষ কী জিনিস।
মানুষ মানে একটা নাম
একটা মুখ
কাছের যারা সকলেই জানে তার কণ্ঠস্বর।

এবং প্রতি মানুষের থাকে একজন মেয়েমানুষ
যে কেচে দেয় তার গেঞ্জি ও জাঙ্গিয়া
ও সাধারণত পেটে ধরে তারই ছেলেমেয়ে।

কিন্তু ওর বিচি কেটে দাও!
আর, কেনই-বা দেবে না
যদি সে হয়ে থাকে
শুধু *তার* ভাল কাজগুলোর কাজী...
আর, শুধু *তার* খারাপ কাজগুলোর কাজী...
এবং যদি সে
তার চেয়ে বেশিকিছু না হয়!

প্রতিক্ষণ, ১৯৯৩

কুষ্ঠরোগিনীর জন্য চুম্বন

মধ্যচল্লিশে পৌঁছে বাঙালি লেখক বিলোচন ভট্টাচার্যর কলমে কালি ছাড়া যদিও কোনও লেখা নেই, কিন্তু কমলি তাকে এখনও ছাড়েনি। কমলি বলতে তার অতীত।

বস্তুত, অতীত এবং বর্তমান, এই দুই স্পষ্ট বিভাজনে তার সত্তা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে আছে। অতীত, যখন সে লিখতে পারত। ও বিখ্যাত লেখক ছিল। আর বর্তমান, যখন সে লিখতে পারে না। অন্তত, সে-ভাবেই থাকার কথা তাদের। দেখতে দেখতে প্রায় দশ বছর হতে চলল, এদের হাঁড়ি সে আলাদা করে দিয়েছে।

বিষয়টি যতদূর প্রাঞ্জল মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা তাই। আবার তা নয়ও। কেননা, আশ্চর্য এই যে, অতীতটা সম্পূর্ণ মুছে যায়নি তার অস্তিত্ব থেকে। না-ছেড়ে কমলির মতো এই অতীত যেন তার ছায়া। বিলোচন চললে, সঙ্গে সঙ্গে সে চলে। বিলোচন থামলে, সেও থেমে যায়।

এমনিতে মানুষের জীবনে যা কিছু ঘটে, সবই খুবই সহজ, সরল, আর সাদামাটা ব্যাপার। সব স্বাভাবিক। সবচেয়ে যেটা কঠিন, সেই মৃত্যুর ব্যাপারটাই ধরা যাক না কেন। খুব কি গোলমেলে? জন্মিলে মরিতে হবে, এ তো জানাই ছিল। ছিল না? তবু দেখুন, একে একটা টোকা দিলেই কী মুস্কিল। শিশুর হাতে ক্যালাইডোস্কোপ যেন। অমনি একটি অর্বাচীন নতুন ছক দেখা দেবে। দেখা দেবে বর্ণচ্ছটাহীন এক অবুঝ অবিশ্বাস। যে, সত্যিই কি তাই? কোনই কি সম্ভাবনা নেই? মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু সে-কথা শুনছে কে? মানছে কে? বিশ্বাস করছে কে? যেন, ব্যাপারটা নাও ঘটতে পারে! নইলে, বলুন, দেখি, যার নাকি পরাজয় বলে কিছু নেই, যে কখনও ব্যর্থ হয় না, তার সঙ্গে কেন লড়তে যাওয়া! সম্ভাবনা আছে বলেই না! যা অসম্ভব, সেই মরণহীনতা, তার অস্তিত্বের সঙ্কেত কত না অনির্ণেয়, অনির্দেশ্য সব উপায়ে পাঠাতে থাকে! ফিজিক্সের পার্টিকেল আর অ্যান্টিপার্টিকেল যেন। একের মধ্যে দুই।

বাঙালি লেখক-বিলোচনের অতীত-বর্তমান সমস্যাটিকেই আমরা একটি টোকা দিয়ে দেখি না কেন। এ আর এমন কি সমস্যা। এ তো হামেশাই হচ্ছে। কোনও এক বাংলা ছবির সেই ভোলে-ভালে গান—

> 'মুছে যাওয়া দিনগুলি
> আমারে যে পিছু ডাকে....'

এই তো ঘটনা? নাকি, এর বেশি কিছু? হেমন্তর অনির্বচনীয় শিশু-কান্না তো বিলোচনের মূল সমস্যার এই সি কি-তেইসি কবেই করে রেখে গেছে—

> 'কোথায় কখন কবে
> কোন তারা ঝঁরে গেল
> আকাশ কি মনে রাখে...'

হেমন্তর কিন্নর কণ্ঠ স-সুর মনে করার চেষ্টা করুন গানটি। নিজে গেয়ে দেখুন গানটি! দেখবেন, বিলোচনের মৌলিক সমস্যা এই আত্যন্তিক সহজিয়া গানে কী নির্ভুলভাবেই না সমাধিত।

সত্যি, ওঁর জবাব নেই। হেমন্তর।

কিন্তু সত্যিই কি তাই?

থিওরি অফ রিলেটিভিটির দিক থেকে যদি দেখেন, অর্থাৎ কিনা দূরবীন উল্টে, তাহলে কিন্তু মহা প্যাঁচের ব্যাপার।

বর্তমান বেওয়ারিশ পড়ে আছে। এবং, সৎকারের আশা নেই। না থাক। কিন্তু অতীত? সে যে মরেও মরেনি। সুররসিক বেহালা-বাদকের মাস-এনার্জি তত্ত্বের সমীকরণ অনুযায়ী স্থির-বস্তুর তুলনায় গতিসম্পন্ন বস্তু কিন্তু গতরে বাড়তেই থাকবে। সেখানে তো আর অতীত আর বর্তমান লুডোর ছক্কা-পাঞ্জার পাশাপাশি লেখা নেই। উঁচু থেকে যত ক্ষীণস্রোতাই দেখাক, এমন কি নিশ্চল দেখালেও, সে নদীও বইছে। 'মহাপ্রস্থানের পথে' (প্রবোধ স্যানাল) যেতে যেমন। কোথায় অলকানন্দা আর কোথা মন্দাকিনী। রুদ্রপ্রয়াগে হঠাৎ মুখোমুখি। প্রবল সংঘর্ষ। তখন জানা গেল।

১৯৬৪ সালে প্রকাশিত প্রথম এবং বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ 'কুষ্ঠরোগিনীর জন্য চুম্বন' আর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্যাবাচ্যাকা অভিব্যক্তিতে হেমন্ত-কণ্ঠের মুছে-যাওয়া-দিন তাই এক নয়। এক হতে পারে না। বিলোচনের যখন-ছিল (অতীত) আর যখন-নেই (বর্তমান) প্রসঙ্গে সুরস্রষ্টা আইনস্টাইনের মতবাদই প্রযোজ্য।

আজ থেকে ৩০ বছর আগে তার প্রথম বই 'কুষ্ঠরোগিণীর জন্য চুম্বন' প্রকাশিত হয়। প্রায় রাতারাতি বিখ্যাত হয়েছিল ২৩ বছর বয়সী সেই গ্রন্থকার। তার মাত্র ৮ ফর্মার বইটি—শুধু ঐ একটি গল্পগ্রন্থ নিয়ে যা লেখালেখি হয়েছিল—সঙ্কলন করলে সে সব নিয়ে অমন আরও ৫টি বই বেরতে পারে। অতুল গুপ্তর মতো থাকতেন কেউ বেঁচে, কোনও একটা পুরস্কার তখনই পেয়ে যেত। যেমনটা নাকি, সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী'-র ক্ষেত্রে হয়েছিল। তার অতীত যখন ছিল বর্তমান, জল-ভাতের মতন, কত সাবলীল ছিল সেই নিউটন জীবন। অমরতার সঙ্গে ছিল গাই-বাছুর সম্বন্ধ।

গত ১০ বছর ধরে বিলোচন একটি লাইনও লেখেনি। না কোনও গল্প, না উপন্যাস কি হাল্কা প্রবন্ধ একটি—কিছু না। এমন কি মুখ-নিঃসৃত কিছু অনুলিখনও কোথাও প্রকাশিত হয়নি। তার লেখা অধুনালুপ্ত মোট ৭টির মধ্যে গত অক্ষয় তৃতীয়ার দিন একটি নতুন সংস্করণ হয়েছে (কু-জ-চু নয়)। ২২ বছর আগে প্রথম ২ বছরে দুটি সংস্করণ হওয়া সত্ত্বেও এবার, ২০ বছর পরে, প্রথম ৬ মাসে, প্রকাশকের সার্থক রসিকতায়, 'মোট ১২ কপি বিক্রি হয়েছে এবং ১৩ জন লোক তা ফেরত দিয়ে গেছে।' মেফিস্টোফিলিস কথিত সেই দিনগুলো কি তবে এসে গেল নাকি, ভাবে বিলোচন, যখন পৃথিবীতে নেমে আসবে এক নব্য লৌহযুগ, যখন মানুষের কামনা-বাসনা সব হয়ে যাবে লোহার, যখন নারীরা প্রসব করবে লৌহের সন্তান! সময় তাহলে সত্যি বদলে গেল, আর এত তাড়াতাড়ি! ওহো, বরাত জোর যে কু-জ-চু পুনর্মুদ্রিত হয়নি। জীবদ্দশায় কেউ ঐ বইটি আবার ছাপতে চাইলে সে কিছুতেই রাজি হবে না। এ বিষয়ে একরূপ মনস্থির করে ফেলেছে বিলোচন। না, কিছুতেই না। এর ভাগ্যে ৫ ক্রেতা ৩৫ ফেরতদাতা হয়ে দেখা দেবে না—তা কে জোর করে বলতে পারে! গত ১০ বছরে কিছু না লিখলেও, এখনও তার প্রয়োজন সম্পূর্ণ ফুরিয়ে যায়নি। একদিন সে ছিল বিখ্যাত লেখক। আর সেই খ্যাতি বলয়ের মধ্যে এখনও চেনা-জানারা তাকে দেখে থাকে। গল্প উপন্যাস নিয়ে প্রকাশিত অধিকাংশ বই বা আলোচনায় তার সপ্রশংস উল্লেখ এখনও করা হয়। যদিও চ্যাপ্টার থাকে সুভাষ সর্বাধিকারী প্রমুখদের জন্যে। তবে প্রায় সমস্ত গল্প সঙ্কলনে তার গল্প থাকে। এভাবে বরং মিথ হয়ে বেঁচে থাকা ভাল। মৃত্যুর চেয়ে ভাল নির্বিকল্প সমাধি।

কিন্তু, এসব তো গেল টিকে থাকার ধান্দার প্রশ্ন। সাহিত্যের রাজনীতির প্রশ্ন। এগুলো কমলি নয়। যে বইগুলো তার দীর্ঘকাল ধরে আউট-অফ-প্রিন্ট, কু-জ-চু-সহ যেগুলি বিগত

দু-দশক ধরে আর পাওয়া যায় না, যারা প্রত্যাখ্যাত হবার সুযোগই দেয়নি, নতুন প্রজন্ম যাদের চোখে দেখেনি—আসল কমলি সেগুলোই। তাদের একটিও কি মরণোত্তর সেই খ্যাতি পেতে পারে না, যা বন্যা, কোনও বাঁধই যাকে রুখতে পারে না? জীবনকালে বিখ্যাত? সে তো দলমা পাহাড়ের ভোলে-ভালে হাতিরাও হয়। যতদিন ব্যবসা চলে, বাণিজ্য হয়, খ্যাতিও ততদিন। কিন্তু, মৃত্যুর পরে যে খ্যাতি, তার মৃত্যু নেই। বিশ্বসাহিত্যে এমন কত হয়েছে।

....তো, এভাবেই, সেই মনুষ্যগ্রস্ত ভূত, তার অতীত, তার কমলি—নিষ্ফল ও সম্ভাবনাহীন তার বর্তমান নিউটন জীবনকে পার্টিকেল ও অ্যান্টি-পার্টিকেল যথা—অমর আন্তরদ্বন্দ্বে বিদীর্ণ করে তাঁর অস্তিত্বকে মাস-এনার্জি সমীকরণ তত্ত্বের অফুরান তাঁবে এনে ফেলেছে।

তাজ বেঙ্গলে সপ্তাহব্যাপী আর্টিস্ট ক্যাম্পের শেষে এই তো সেদিন। আয়োজক স্বয়ং টাটারা। সারা ভারতবর্ষ থেকে ছবি আঁকতে এসেছিল জানে মানে ১০ জন শিল্পী। দু'জন বিদেশি। বাঙালি শিল্পীদের মধ্যে কেউ পাত্তাই পায়নি। শেষ দিনের সেই অনুষ্ঠানের খানাপিনায় ক'জন শিল্পী বা সাহিত্যিক নিমন্ত্রিত হয়েছিল? গুনে ৪০ জন। বিলোচন, দেখা গেল, এখনও তাদের একজন।

আসল ব্যাপার হল, কোনও জিনিস কিনতে একটা পাত্র নিয়ে মুদির দোকানে গেলে, তার একটা আলাদা ওজন নেওয়া হয়। এবং নুন্যতম বাটখারা প্রয়োগ করেও যখন দেখা যায় পাত্রটির ওজন কাঁটায় কাঁটায় হচ্ছে না, তখন চাল-ডাল-নুন-লঙ্কা হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, পাল্লায় তাই ছড়িয়ে দিয়ে ওজন দাঁড়ির কাঁটাটিকে যথার্থ্য দেওয়া হয়। ওজন-পরিভাষায় এই পাষাণ ভাঙার প্রয়োজনে বিলোচন ছাড়া ডাকার মতো আর কেউ কোথায়? যে নাকি, সংক্ষেপে, মিথ লেখক!

সেই যার নাম বাঁশদ্রোণী। সেখান থেকে রিক্সায় গাছতলা স্টপ। তারপর মিনিবাসে টালিগঞ্জ স্টেশন। মেট্রো ধরে রবীন্দ্র সদন। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে তাজ।

এত কিছু করে, তাজ এর পার্টিতে কার্ড দেখিয়ে বিলোচন যখন প্রবেশাধিকার পেল, তখন রাত ৯টা। কমবেশি ৩ থেকে ৪ পেগ সময় পেরিয়ে গেছে।

বিশাল ব্যাঙ্কোয়েট হলের সবটা ভাড়া নেওয়া হয়েছে মাত্র জনা-চল্লিশ শিল্পী-সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের জন্য। তবে অনেকেই সস্ত্রীক এসেছে বলে হল বেশ ভরাভর্তি দেখাচ্ছে। ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে এরা কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ সোফায় বসে। হোটেলের চামচের মতো ঝকঝকে ওয়েটাররা ঘুরে বেড়াচ্ছে কার কী প্রয়োজন জেনে নিতে।

মেঘ না চাইতেই জলের মতন, বিলোচনের হাতে এক গ্লাস স্কচ এসে গেল।

সবচেয়ে বেশি লোক, আর তাই হবার কথা, একের পর এক বেস্ট সেলার, অষ্টোত্তর শতগ্রন্থ প্রণেতা সুভাষ সর্বাধিকারী আর বোম্বের পেয়ন্টার সুভদ্রা যোশিকে ঘিরে। শুধু সুভদ্রা কেন, উপস্থিত নারীসমাজ প্রায় সকলেই ওখানে।

হলের মাঝখানে ওভাল শেপ শ্বেতপাথরের টেবিলে। বুফে ডিনার। খাবার-দাবার এনে রাখা হচ্ছে।

বিলোচন যখন ধরে নিয়েছে, ওয়েটার ছাড়া কেউ তাহলে আজ আর তার কাছে আসবে না, সেই সময়, তাকে দেখে, কোথা থেকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল মণিকা, সুভাষের স্ত্রী।

মুখের ওপর ছড়িয়ে থাকা এক গোছা বব-কাট চুল মাথা ঝাঁকিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার। এত দেরিতে?' বিলোচন লক্ষ করল, মাথার ঝাঁকুনিতে একটু টলেও গেল সে।

তার হাতে গ্লাস।

'ডিনার কটায়?'

'সাড়ে ন'টায়।' যেন আরও কত কী মানে আছে কথাটায়, এমন ভাবে হেসে, হঠাৎ হাসি থামিয়ে, মণিকা তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'মনে হয়, দশটার আগে ডাকবে না।'

মণিকার মুখ বিলোচন প্রথম দেখেছিল সুভাষের স্ত্রী হিসেবেই। এমনি এক এগজিবিশন-পার্টিতে। এখন বিখ্যাত, উমেশ হালদারের প্রথম এগজিবিশনের প্রথম দিনের পার্টি ছিল সেটা। সেদিন একটা আস্ত গাধার মতো একের পর এক মন্তব্য করে যাচ্ছিল সুভাষ। দোষের মধ্যে উমেশ বলেছিল, 'শ্রেষ্ঠ ছবি তো সেই আঁকবে সুভাষদা, যে আমার মতো নুলো। এখান থেকে', উমেশ তার রোমবহুল হাতের কনুই দেখিয়ে বলেছিল, 'যার হাত দুটো এখান খেতে কাটা।' কথাটা কি যথেষ্ট ব্যঞ্জনাময়ভাবে নিতে হবে না? অন্তত, তার কথা, যার দুটো হাতই রীতিমতো ন আস্ত? অন্তর, এর উত্তরে, 'যার হাত নেই সে ব্রাশ ধরবে কী করে'—এমন উজবুক কথা কি বলা যায়? এবং সিরিয়াসলি? অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল বিলোচন। প্রতিভাবান তরুণ শিল্পীকে সমর্থন করে সে বিনীতভাবে বলেছিল, 'দেখ সুভাষ, সমস্ত দেখার সঙ্গে অন্ধত্বের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে।'

'যে অন্ধ সে আবার দেখবে কী করে?' বলে সুভাষ এবার হো হো করে হাসতে শুরু করে দেয়। সেদিন মণিকাকেও হাসিতে যোগ দিতে দেখেই সবচেয়ে বেশি অপমানিত বোধ করেছিল বিলোচন। এমন একটা নিরেট মন্তব্য সে সহ্য করছে কী করে, এত নিচে নামাচ্ছে কী করে নিজেকে, হোক না স্ত্রী, একজন ব্যক্তি তো সে! কিন্তু ভুল ভেঙে দিয়েছিল মণিকাই। 'কেন দেখবে না গো?' সহজ আর আন্তরিকভাবে সে সুভাষের কাছে জানতে চেয়েছিল, 'যখন চোখ বুজে ঘুমোই আমরা। তখন তো অন্ধ। কিছুই কি দেখি না? স্বপ্ন দেখাটাই তো', মণিকা বলেছিল, 'তাহলে উঠে যাবে।'

এত বলে সেই প্রথম সে বিলোচনের দিকে তাকায়। সেই তীক্ষ্ণ কঠিন রোগা মেয়েটা মণিকার মধ্যে আর নেই। মরে গেছে। এখন বুঝি তার গাঁটে-গাঁটে মেয়েমানুষি। তবে চাহনিটি আজও অবিকল সেই রকম থেকে গেছে। তার ঈষৎ মেদবহুল মুখের ওপর বসানো চোখ দুটোর নিখুঁত গঠন আজও নিখুঁত থেকে গেছে। অস্বাভাবিক পরে-পরে যখন পলক পড়ে, আজও মনে হয়, বুঝি প্রস্তরমূর্তি চোখ বুজছে।

এরপর বহুবার তাদের দেখা হয়েছে। বিয়ের প্রথম অ্যানিভার্সারিতে যায়নি বলে তার সরু পাতলা ঠোঁট-দুটো দর্শনীয়ভাবে ফুলিয়ে তুলে মণিকা বলেছিল, 'কই বুধবার আপনারা এলেন না যে?'

'বুধবার?'

'হ্যাঁ। বুধবার। ২৪ এপ্রিল।'

'২৪ এপ্রিল?' বিলোচন অবাক, 'কী ব্যাপার!'

'আমাদের বিয়ের অ্যানিভার্সারি ছিল।'

'কিন্তু আমাদের কেউ তো নেমন্তন্ন করেনি?'

'সুভাষ বলেনি কিছু আপনাকে?'

'না তো।'

'কিন্তু, আমি আপনার স্ত্রীকে বলেছিলাম। ফোন করেছিলাম।'

'ডলিকে?'

কিন্তু সেও-তো-কিছু-বলেনি চোখে মণিকার দিকে তাকাতে গিয়ে আবার সেই স্থির

অপলক পাথরের চাহনি। কোনও কিছু ঘটবার আগেই, অকারণে কত সতর্ক হয়ে গিয়েছিল সুভাষ আর ডলি। তাদের দুটি পরিবার।

গুঁড়ির মটমট শোনা গিয়েছিল। কিন্তু যখন কারণ ঘটল, ঘটতে থাকল, বিলোচনের আলিঙ্গনের মধ্যে মেঘের মতো নরম হয়ে এল মণিকার ছেলে-সুলভ কঠিন শরীর, তখন কেউই জানতে পারল না। এমন কি, মধ্যরাত্রির ধর্ষিতা স্ত্রী-শরীর গুছিয়ে রাখতে রাখতে ডলি তাকে জানাল, 'আজকাল কী সুন্দরী দেখাচ্ছে মণিকাকে, লক্ষ্য করেছ?' হাই তুলে, 'ছেলেপুলে হবে নাকি?'

শুনে কী গর্বিত হয়েছিল বিলোচন। মণিকার এ নবজন্ম, এ তো তারই জন্যে।

তারপর গত দশ বছর ধরে শুধু সুভাষের ওঠা আর বিলোচনের নামার কাহিনী।

প্রকাশক, সম্পাদক, টিভি, রেডিও, পুরস্কারদাতা, সংবাদপত্র-যে হারেমে ঢুকতে যায় বিলোচন, দেখে, হারেমরক্ষী খোঁজার মতো সুভাষ খাঁড়া হতে দাঁড়িয়ে। শুধু তাকে কুকুর-তাড়া তাড়াতে।

শেষ শোওয়া যেদিন। ব্যাচেলার তুহিন সামন্তর সল্ট লেকের ফ্ল্যাটে।

মণিকা : তুমি কি আমায় ভালবাস বিলোচন?

বিলোচন : হ্যাঁ।

— তুমি কি ডলিকে বলতে পারবে?

— না। কারণ মেয়ে কুর্চিকে বলতে পারব না।

— তুমি কি সুভাষের সামনে আমাকে একটা চুমু খেতে পারবে? যাতে আমি ওর হাত থেকে মুক্তি পাই?

— কিন্তু তুমি কোথায় যাবে মণিকা?

— আমি বাবার কাছে রাঁচিতে ফিরে যাব। তুমি কি পারবে আমাকে অন্তত এটুকু সাহায্য করতে?

এই বলে উত্তরের আশায় অপলক প্রস্তর-চাহনি মেলে সে তাকিয়ে ছিল বিলোচনের দিকে। মণিকা না তার চোখ, কে বেশি নগ্ন ভেবে দেখতে গিয়ে সেদিন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল বিলোচন। উত্তর দেয়নি। সেভাবে আর দেখাও হয়নি আর কোনও দিন। কথা হয়নি। এই শেষের সেদিনটি ছিল ২৮ এপ্রিল, ১৯৮৮ ঐ দিন নাকি মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছিল। কিন্তু তখনও তো ব্যবধান ছিল ৬০ হাজার কোটি মাইল!

অবিকল শেষ দিনের সেই শেষ চাহনি মেলে ধরে মণিকা একটি দু'জনে বসার সোফা দেখাল।

'এসো' নয়, বলল, 'আসুন। বসি এখানে।'

সুভাষের সঙ্গে মণিকার আসল সম্পর্ক ভাল নয়। আসল বলতে নারী-পুরুষের যা। নারী ব্যাপারে সুভাষের ধ্যান-ধারণা বেশ নিচু মধ্যবিত্ত ধরনের। সেই যুবা বয়স থেকে বিলোচন এটা জানে। তার ধারণা প্রেম করার জন্যে ভদ্রমহিলা, বিবাহও তাদেরই করতে হবে, এবং তারা যত অভিজাত হয়, তত ভাল। আর উপভোগ করার জন্যে দরকার মেয়েছেলে, তাদের সঙ্গে প্রেম করার দরকার নেই। ভদ্রমহিলার ক্ষেত্রে তার হাতের আঙুল তুলে ধরে দস্তানায় চুম্বন; কিন্তু, ফর্নিকেশন আলাদ জিনিস। অনেকটা ভোরবেলায় সংবাদপত্রের মতো। পড়ো আর মুড়ে রাখো। একদিন খুব দুর্বল মুহূর্তে ডলির কাছে

স্বীকার করেছিল মণিকা, 'কী করব ভাই। ওর যা চাহিদা—আমি মেটাতে পারি না। ও যদি সেটা অন্যত্র....'

বলতে বলেত মাথা নাকি নুয়ে এসেছিল তার।

শ্রীশিকষানিকেতনের ইংরেজির টিচার ডলি জানতে চেয়েছিল, 'হ্যাঁগো, একেই কি তোমার বলো ম্যারিটাল অ্যাডজাস্টমেন্ট?'

'তাও বলি।' বিলোচন বলেছিল, 'আবার খড়ের গাদা থেকে নেমে যাচ্ছে বুদ্ধিমান কুকুর। এভাবেও দেখতে পারো ব্যাপারটা।'

সাড়ে নটা। এখনও খেতে ডাকেনি। সোফায় না বসে বিলোচন দাঁড়িয়ে রইল। যদি ১০টায় ডাকে, তার মধ্যে আরও দুটো ঢালা যাবে কি পেটে, এরকম ভাবতে ভাবতে ওয়েটারের ট্রে থেকে বিলোচন দ্বিতীয়গ্লাস তুলে নিল। বেশ দামী স্কচ। অজানা স্বাদ। সিভাস-টিভাসের নিচে কি টাটারা নামে কখনও?

ফাঁকা গ্লাস হাতে মণিকা দাঁড়িয়ে। এর মধ্যে কটা খেয়েছে মণিকা কে জানে, আর কী। তলানির রঙ ছিল হালকা হলুদ। জিন-লাইমই হবে। বিয়ের আগে মদ কী জিনিস জানত না, মণিকা। সুভাষও চায়নি সে তা জানুক। কিন্তু মণিকা জেনেছে। তাকে জানতে হয়েছে যে ব্যাপারটা কী। এ একান্তভাবে তারই পছন্দ। এই মুহূর্তে মণিকার অবস্থান ঠিক কোথায়? সুভাষ, সুভদ্রা যোশী আর কতটা মাতাল আজ সে—এই মাকু-টানাটানিতে যে অন্তর্বস্ত্র এখানে তৈরি হচ্ছে—সেখানে বিলোচন কে? একটা সুতোও না। চার চারটি বছর যোগাযোগ নেই। চড়া পড়ে গেছে।

ঠিক এই সময় অনুভব করল বিলোচন, মণিকার চাহনি তাকে খুঁজছে। চোখে চোখ সেই রাখতেই হল। কিছুটা সন্ত্রস্তভাবে লক্ষ্য করল বিলোচন, ঐ আবার, পাথর হয়ে যাচ্ছে চোখদুটো। কী ঠাণ্ডা আর কঠিন অথচ উদ্ধত আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে সে অপলক তাকিয়ে আছে তার দিকে। গ্লাসের গায়ে আলতো চুমু খেয়ে মণিকা হাসল? নাকি, তার করোটির দাঁত দেখাল?

'ডস্টয়েভস্কিকে নিয়ে কালকের লেট-নাইট ফিল্মটা দেখলে? টিভিতে?'

'দ্যাখেনি' বললে মণিকা আবার নতুন বিষয় খুঁজে পাবে কোথায়, এমনটা ভেবেই বিলোচন বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ।'

'বোধহয় ইডিয়ট লিখছিলেন তখন, তাই না? 'মণিকা একটা হেঁচকি তুলল, 'উক।'

'তাই তো মনে হল।'

'নিজেকে চিনতে পারলে?'

চোখের পলক পড়া একদম বন্ধ হয়ে গেল মণিকার।

'চিনতে পারলে নিজেকে?' করোটি-হাস্য করে সে আবার জানতে চায়। এবার প্রায় চেঁচিয়ে।

সুভাষ দাঁড়িয়েছিল দূরে। বোম্বের বিখ্যাত পেয়ন্টার' সুভদ্রা যোশির কাঁধে হাত রেখে। সুভাষের আকাদেমি পাওয়া উপন্যাস 'এই দেশ তোমার আমার' সম্প্রতি ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। বের করেছে বিদেশি প্রকাশক, দিল্লির প্রকাশকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে। সুভদ্রা তার প্রায় কাঁধে মাথা রেখে তখন বলছে, 'সুভাষদা, দিস নভেলা অফ ইয়র্স শুড ডেফিনিটলি গো ফর নোবেল', আর, 'অতটা বোলো না' 'অতটা বোলো না'—চোখে সুভাষ তাকে বকতে যাবে—এই সময় মণিকার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর তার কানে গেল।

মস্ত হলঘরের ও-প্রান্ত থেকে সুভাষ এতক্ষণে তাদের দেখতে পেল। আরে, বিলোচন

এখানে, কোত্থেকে, আর কখন! ঐ নিনকমফুফকে কে এখানে ডাকল। ও তো মাইক্রো-ম্যাক্রো কোনও লেভেলেই আমাকে স্বীকার করে না। আমার জন্যে যার ছিঁটেফোঁটা শ্রদ্ধা নেই, উৎসাহ নেই, সে এখানে কেন! এ-ধরণের ইন্টারন্যাশনাল মিট-এ ওর যোগ্যতাই বা কী।

ভাবতে গিয়েই তার হাতে উঠে এল বক্সারের গ্লাভস। বিলোচনকে তার মনে হল ঝুলন্ত এক বালির বস্তা। একটু নেট প্রাকটিশ করে নেওয়া যাক ভেবে সে দ্রুত চলে এল এদিকে। সঙ্গে চলে এল তার দলবল। সুভদ্রা ওদিকেই থেকে গেল। কলকাতার সাত রাতের জন্যে গ্যালারি নাইন্টিনাইনের নীলেশ চাউধুরির সঙ্গে তার কথা হয়ে গেছে। নীলেশই ভাল। ব্যাচেলর। ঝামেলা নেই।

'কী ব্যাপার, এত এক্সাইটমেন্ট কীসের?'

সুভাষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, শূন্য গ্লাস বিলোচনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মণিকা বলল, 'ফিল ইট আপ। উইলিউ? প্লিজ!' তারপর বলল, 'আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে অনেক মিল খুঁজে পেলাম উক!'

'কী ব্যাপার বৌদি?' পড়ো-পড়ো মণিকাকে ধরে ফেলে সুভাষের সবচেয়ে অনুগত চামচা সুমিত ভদ্র জড়ানো গলায় জানতে চাইল, 'কার সঙ্গে কার মিল?'

'কেন, ওঁর সঙ্গে?' মণিকার আঁচল লুটিয়ে পড়েছে। এখন প্রায় সব চুল মুখের ওপর। যা সরাবার একটুও চেষ্টা না করে বিলোচনকে আঙুল তুলে দেখিয়ে মণিকা বলল, 'ডস্টয়েভস্কির!'

সুমিত বলল, 'কিন্তু উনি তো গত পাঁচ বছর কিছুই লেখেননি। একদম সাইলেন্ট।'

'না লিখুন।' ওয়েটারের ট্রে থেকে একটা গ্লাস ছোঁ মেরে তুলে নিল মণিকা, 'দা মোস্ট, দা মোস্ট, সিগনিফিক্যান্ট সাইলেন্স ইন বেঙ্গলি লিটারেচার' বিলোচনের দিকে টলমলে তর্জনী তুলে মণিকা জানতে চাইল, 'এ জন্যে কোনও পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা —উক—' মণিকা শেষ করল, 'কোথাও নেই সুমিত?'

বলতে বলতে, খাচ্ছিল জিন, পুরো এক পেগ হুইস্কি গলায় ঢেলে দিল।

গ্লাস কেড়ে নিয়ে সুভাষ বলল, 'এই, কী হচ্ছে কী মণিকা', তার গলায় মালিকের ধমক, 'বিহেভ ইওরসেলফ। চলো, বাড়ি, চলো।'

'বাড়ি চলুন বৌদি।'

'বাড়ি? আঁ-হ্যাঁ। তা যাচ্ছি। টলে পড়তে পড়তে ওয়েটারের থালা থেকে একটা অর্ধেক খালি বোতল তুলে নিয়ে সটান দাঁড়িয়ে গেল মণিকা, 'কিন্তু, তার আগে আ-আমি ওঁকে একটা পুরস্কার দেব। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আম্‌মি দেব। ফর মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট সাইলেন্স—আ-আমি দ-অশ গুনব। তার মধ্যে উ-উনি', বিলোচনকে দেখিয়ে, 'আ-আমাকে একটু চুমু খাবেন। রাইট অন মাই লিপস্‌। ইয়েস। হি মাস্ট। আ কিস ফর দা লেপার। কার বই, জানো সুমিত? জানো না। কুষ্ঠরোগিণীর জন্য চুম্বন!' খিলখিল করে হাসতে হাসতে বিলোচনের চোখে চোখ রেখে (যদিও এখন তারা সরে গেছে) মণিকা সর্বান্তঃকরণে পুরোটা বলার হাস্যকর চেষ্টা করতে লাগল, 'আ কি, আ কিস ফব দা লেপার। আদারওয়াইজ আই শ্যাল স্ম্যাস দিস বটল অন হিজ হে-হেড!'

আলুলায়িত-আঁচল, চুলের ঝোপের মধ্যে মণিকাকে বোতল-হাতে এক ভয়ঙ্কর

দেবীমূর্তির মতো দেখায়।

থেমে থেমে, সে গণনা শুরু করে।

'ওয়ান!'

'টিউ!'

বাধা দিতে সুমিত এগিয়ে যাচ্ছিল। সুভাষ তার হাত চেপে নিচু গলায় বলল, 'বিলোচন পারবে না। হি ইজ আ চিকেন! অ্যান্ড আ ব্রয়লার অ্যাট দ্যাট।'

মণিকা যথেষ্ট সময় নিয়ে গুনে যাচ্ছে।

'থ্রি!'

'ফো-ওর!'

ফাইভ থেকে সে রাতের ঘনঘোর মাতালরা একসঙ্গে তালি দিতে শুরু করে। এমনকি, সুভদ্রা এসে করতালি-বাদ্যে যোগ দেয়। তার দিকে তাকিয়ে, হেসে, সুভাষও তালি বাজাতে শুরু করে।

'সিক্স!'

'সেভেন!'

মণিকা গুনে চলেছে। তার হাতে খাঁড়া নেই। উদ্যত বোতল। সে বোতল নাড়িয়ে গুনছে।

গতিরুদ্ধ বস্তুপিণ্ডের মতো বিলোচন দাঁড়িয়ে।

বস্তুপিণ্ড সম্পর্কে রিলেটিভিটি-ধারণাগুলির অন্যতম হল, প্রত্যেক জড়বস্তুর মধ্যে একটি সুপ্ত গতিদিব্যতা আছে। এবং আলোর চেয়ে বেশি গতিসম্পন্ন হতে পারলে প্রত্যেক বস্তুই এনার্জিতে রূপান্তরিত হবে। বস্তুর এই গুণগত বদলের ব্যাপারে কোয়ার্ক নামে এক অজানা পরম-পরমাণুর অনির্ণেয় ভূমিকার কথা জানা গেছে। কোয়ার্ক হল সমুদ্রপাখির ডাক। শব্দটি সেখান থেকে এসেছে। কেউ কেউ মনে করেন, কোয়ার্ক শব্দটি বিজ্ঞানীরা পেয়েছে জেমস জয়সের ফিনেগানস ওয়েক গ্রন্থ থেকে।

মিনিবুক, বইমেলা ১৯৯৪

আমি, এখন

এখন আমি যে চশমাটি পরে আছি, এটা আমার চশমা নয়। এটি জনৈক আর হালদারের চশমা।

আমি প্রথম চশমা নিই ১৯৮৬ সালের বসন্তকালে।

আমার বিবাহ হয়েছিল রেজিস্ট্রি করে। এবং তারপর কালীঘাটে মালাবাদল করতে যাইনি। মেয়েরা গলায় মালা পরিয়ে দিলে কেমন, আমি তা জানি না। সিনেমা-থিয়েটারে দেখেছি, ওই সময় ভারি সলাজভাবে মেয়েরা মুখ ঘুরিয়ে রাখে। তখন বেশ লাগে তাদের দেখতে। সব মেয়েকেই সুন্দরী দেখায় তখন।

আমার কিন্তু অনেকটা সেইরকম মাল্যবান লাগল, যখন আমার শিল্পীবন্ধু অশোকনাথ চৌধুরী একদিন রাতের দিকে তার ঢিলেঢালা চশমাটা আমার নাকের ওপর বসিয়ে দিয়ে বললেন 'এবার পড়ুন তো দেখি!' বলে সেদিনের কাগজখানা এগিয়ে দিলেন। আমার চোখের সামনে আবছা অক্ষরগুলো সহসা ঝলমল করে উঠল। সেইসঙ্গে ঝলমল করে উঠল যেন আমার গোটা জীবনটাই। অশোকনাথের চমশার ডাঁটি থেকে ঝুলত একটা

সোনালি কর্ড। তাই বোধহয় আরও মালা-মালা লেগেছিল। প্রথম চশমার মধ্যে দিয়ে প্রথম দেখা বইটির নাম আজও ভুলিনি। 'জেন অ্যাণ্ড দ্য আর্ট অফ মোটর সাইকেল মেনটেনান্স' এমনতরই নাম ছিল বইটির। অশোকনাথ জানতে চাইলেন, 'রাত কত হইল?' আমি বললাম, 'চল্লিশ পেরুচ্ছি।' অশোকনাথ বললেন, 'তবে তো আপনার যথাসময়েই চাল্‌সে হয়েছে। এবার আপনাকে একটা রিডিং গ্লাস নিতে হবে।'

শান্তনু ঘোষ নামে এক বাঙালি কালো সুদর্শন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের মহানুভবতা আমাকে অচিরেই নিয়ে গেল শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের আই ইনফার্মারিতে। সেখানে চোখের সামনে বিবিধ কাচ রেখে 'এটা পড়ুন', 'ওটা পড়ুন' বলতে বলতে এক নবীন চক্ষু চিকিৎসক আমার বর্ণপরিচয় করালেন নতুন করে। প্রায় ৩৫ বছর পরে। শেষে একখানা কাগজ পেলাম, যাতে লেখা :

RE+2.25 তারপর দুর্বোধ্য কিছু
LE+2.75 ” ” ”

কিন্তু একসঙ্গে তৎকালীন ১২০ টাকা একত্র করতে না পারার দরুণ প্রথম চশমা চক্ষুগত হতে আমার প্রায় ৬ মাস দেরি হয়ে যায়। সেই তৈলাক্ত বাঁশ ও উৎসাহী বাঁদরের গল্প আর কী। টাকা ৫০-এ পৌঁছলেই হুড়ুস করে শূন্যে নেমে যায়। তথা, মদ খেয়ে ফেলি।

নতুন চশমা পেয়ে তো দারুণ উৎসাহ। ক্ষুদ্রকায় ন-পয়েন্টে ছাপা 'জেন অ্যান্ড....' বইটা চশমার কল্যাণে পড়ে ফেললাম আদ্যোপান্ত। যাকে বলে গড়গড় করে। আমি দেখলাম, বইটি আদৌ মোটর সাইকেল বিষয়ে নয়। কেননা, সেখানে বলা হয়েছে, একটি যন্ত্রযানের শরীর, জীবন ও দর্শনের কথা। তা, একটি যন্ত্রের তো ও-সব থাকার কথা নয়। নিশ্চয়ই, মানুষের জীবনের কথা! অতএব, প্রথম চশমা-চোখে পড়া প্রথম বইটি আমাকে জানাল, একটি চশমার অভাবে শুধু অক্ষর নয়, জীবনকেও আমি এতদিন কত ঝাপসা দেখছিলাম।

বড় দুঃখজনক পরিস্থিতিতেই প্রথম চশমাটি আমাকে হারাতে হয়। এবং মাত্র মাসখানেক যেতে না যেতেই। ওই সময় সদর স্ট্রিটের ডাঃ আর এন রহমানের চেম্বারে যারা আকণ্ঠ মদ্যপানের সুযোগ পেত, আমি মনে করতাম, সেই সৌভাগ্যবানদের মধ্যেই আমি একজন। কিন্তু জীবনের সব সু-সময়ই আসলে একটি ছলনা। সেগুলি আসে শেষ পর্যন্ত একটি চরম দুর্দিনের কাছে টেনে নিয়ে যাবে বলেই। আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হল না।

একদিন ডাক্তারের চেম্বারে রাত একটা বেজে গেল। কোনওক্রমে আমি একটা শেয়ারের ট্যাক্সি পেলাম ধর্মতলা থেকে। যাবে শ্যামবাজার। ট্যাক্সির ভেতর গাদাগাদি বসে কিছু তরুণ ছেলে—তারাও মাতাল। কথাবার্তায় বুঝি, বিকেলে তারা ইন্দিরা গান্ধীর মিটিংয়ে গিয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকারকে তারা অশ্রাব্য গালাগালি করছিল। এদিকে আমি একজন (মাতাল হলেও) ঘোর বামপন্থী। প্রথমে কথা-কাটাকাটি। তারপর ধমকানি (ওদের তরফে)। তারপর ওরা যখন জ্যোতি বসুর নাম ধরে খেউড় শুরু করল, তখন আমি আর থাকতে পারলাম না। মদ আমিও খেয়েছি। এবং, যথেষ্ট। এবং, ওরা সবাই মিলে যা খেয়েছে, সম্ভবত তার চেয়ে বেশি। অন্তত, আমার তাই মনে হয়েছিল। তা নইলে ওদের নেত্রীর নাম ধরে আমি বলতে যাব কেন যে, আমি সেই শ্রদ্ধেয়ার...পুটকি মারি, মদের জোরেই না! অন্যথায়, আমি তো একা!

যেমন কর্ম, তেমনি ফল। ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে মেরে একদম কিমা বানিয়ে দিল। প্রথম থাপ্পড়টা ভাগ্যিস পড়েছিল ডান গালে। তাই বাঁদিকে উড়ন্ত চশমাটা দেখতে পেয়েছিলাম।

ওরা চলে গেল, মুখের রক্তচাঁচা রক্তাপ্লুত হাত নর্দমায় ডুবিয়ে আমি চশমাটা খুঁজতে লাগলাম। পেলামও। কিন্তু তখন কাচদুটো চুরচুর হয়ে গেছে। ফ্রেমের একটা ডাঁটি নেই।

দিন-দুই পরের কথা। বৌবাজারের অপ্টো-ডেন্টো এম্পোরিয়াম (ইন্টারন্যাশনাল) 'খাঁটি বাঙালি প্রতিষ্ঠান।' মালিকও বিশিষ্ট সজ্জন। ননীবাবু। খুব যত্ন করে ফ্রেমের মাপ-টাপ নিতে লাগলেন।

'দেখুন' আমি তাঁকে বিনীতভাবে জানাই, 'আমার নাকটা ঠিক অতটা মোট নয়। ইয়ে, মানে, নাকের ফাঁদনাটা বেশ ছোটই হবে।' উনি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। সে আমি বুঝেছি। 'আমি বললাম, 'মানে কাল রাতে পিছলে গিয়ে বাথরুমে...।' অন্তর্যামী বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। সে আমি বুঝেছি।' আসলে, আমার নাকটা তখনও কী পটল বলে ওগুলোকে, বোম্বাই বলা যাক, ওই রকম ফুলে ছিল। যাই হোক, যদিও আমি আমার প্রথম চশমাটি হারাই নিঃসন্দেহে পলিটিক্যাল কারণে, তা বলে, পলিটিক্যাল সাফারার হিসেবে সেজন্য কোনও দাবি আমি রাখি না।

এভাবে বিগত ১৬ বছরে ১১টি চশমা আমার জীবনে এসেছে, ও গেছে। তারা যখন হারিয়ে গেছে বা ভেঙে, 'ওগো চশমা, তুমি কি তোমার চোখ খুঁজছ'....বলে কতদিন পথে পথে ঘুরেছি। আর, যখন তারা চোখে নেই, টেবিলের ওপর, কি বাথরুমের তাকে, খোলা জানালা দিয়ে রৌদ্রছটা কি বৃষ্টির ছাট এসে লেগেছে তাদের কাচে, দূর থেকে তাদের একখণ্ড আমার বলেই তো মনে হয়েছে। কান্না পেলে, চোখের বদলে আমি কত-না বার কাচ মুছেছি চশমার!

এবং, পূর্বোক্ত ১১টি চশমা আসা-যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আমার যে চশমা-হারা জীবন, তখন পথেঘাটে ট্রামে-বাসে অফিসে যাদের কাছে চশমা চেয়েছি ও চেয়ে পেয়েছি, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি ঋণী। আমি ঋণী আমাদের অফিসের বৃদ্ধ আর্দালি কেনারাম মণ্ডলের কাছেও, যিনি হাতচিঠি-যোগে আবেদন পাওয়ামাত্র নিজ নাসিকাগ্র থেকে চশমা কেটে প্রায় তিন ঘন্টার জন্য আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। ওই সময় আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের স্বয়ং সেক্রেটারিকে আমাকে কয়েকটি ফাইল বোঝাতে হয়েছিল। ঝাড়া তিন ঘন্টা ধরে। বস্তুত, চশমা-ব্যাপারে আমার অফিসের বহু সহকর্মীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমি পেয়েছি। ফোকাল, বাই-ফোকাল প্লাস, মাইনাস, ধাতু ও সেলুলয়েড ফ্রেমের সবরকম চশমাই আমি পরে দেখেছি। বস্তুত, আমার স্ত্রীর দিবানিদ্রাগুলির সদ্ব্যবহার করতেও আমি ছাড়িনি।

আমি শুরুতেই বলেছি, এখন আমি যে চশমাটি পরেছি তা আমার নয়। এটি জনৈক আর হালদারের। এতদিন ধরে লাগাতাড়ে পরের চশমা আমি আগে কখনও পরে থাকিনি। চশমাটি বেশ মানিয়েছে আমাকে। পাওয়ারও ফিট করেছে চমৎকার। রিমলেস চশমা পরার সৌভাগ্য আমার এর আগে হয়নি।

এই নতুন চশমাটি আমি কী করে পেলাম তা বলার আগে আমার নিজস্ব শেষ চশমাটি কী করে হারালাম, সেটা বলে নেওয়া অসঙ্গত হবে না। তবে এই কাহিনীটি বলতে গিয়ে, একটু দুঃখই হবে আমার। আমারই জন্যে। কেন না, এই একমাত্র চশমা আমার, যে আমাকে ছেড়ে যায়নি। যা ছিল, আমার প্রতি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বস্ত।

প্রায় ছ'মাস আগের কথা। রাত বারোটায় সময় তমোনাশ বলল, স্কচ আছে। কোথায় দীপ সেনের বাড়িতে। কোথায়। ল্যান্সডাউন রোডে। তমো নিয়েও গেল আমাদের বিশাল এক মাল্টিস্টোরিডে। দরোয়ান দেখলাম ওর চেনা। কিন্তু অত রাতে লিফট নেই। দশ তলা পর্যন্ত এক এক করে হেঁটে উঠে ও গরু খোঁজা খুঁজে দীপ সেন বলে কারও হদিস পাওয়া

গেল না। দু-দুটি ফ্ল্যাটে সেনেরা থাকে বটে। কিন্তু বেল টিপলে সাততলার প্রথমটি থেকে বেরিয়ে এলেন নাইট গাউন পরা একজন, (ভাগ্যিস রোগা দুবলা), বললেন, আরাধ্য ফ্ল্যাটটির জন্যে আমাদের একতলায় দরোয়ানের কাছে যাওয়াই শ্রেয়। 'যদি এমন কোনও ফ্ল্যাট থেকে থাকে' বলে তিনি দরজা বন্ধ করলেন। দ্বিতীয় সেনরা থাকেন দশতলায়। চেন-লাগান দরজা ঈষৎ ফাঁক করে ভেতর থেকে এক গম্ভীর হাঁড়ি-গলা আমাদের জানাল, আমরা যেন আর দশ মিনিট অপেক্ষা করি। কারণ, পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে। নেশাতুর শোকে, দুঃখ ও অপমানে, আমি দাঁড়িয়েছিলাম ল্যাণ্ডিং-এর বারান্দায়। এবং, একবার নিচে তাকাতেই সে যে কী প্রচণ্ড ভার্টিগো হল আমার! মনে হল, লাট্টুর মতো ঘুরছে বাড়িটা। নিচে লাফিয়ে পড়ার অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছাকে সংযত করতে, ভাগ্যিস চোখ থেকে খুলে চশমাটা তখুনি ফেলে দিয়েছিলাম। সুদুর দশতলা থেকে আমার শেষতম চশমার ফুটপাথ সংস্পর্শে এসে চূর্ণ হওয়ার শব্দ আমি নিঃসন্দেহে শুনতে পেয়েছিলাম। এ-কথা আমার চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না যে, সে আজ নেই, হায়, তাই আমি আজও বেঁচে। এটি আমার ১নং বা শেষ নিজস্ব চশমার মৃত্যু-কাহিনী। আমার ১১টি চশমার প্রত্যেকটির পিছনে এরকম গল্প আছে। বস্তুত এ নিয়ে একাদশ অধ্যায়ে একটি উপন্যাস লেখা যেতেই পারে। এবং 'প্রথম অধ্যায়', 'দ্বিতীয় অধ্যায়ে'র বদলে লেখা যেতে পারে 'প্রথম চশমা', 'দ্বিতীয় চশমা'—এভাবে। উপন্যাসটির নাম হতে পারে : এখন আমার কোনও চশমা নেই। কেন না, আগেই বলেছি এখন আমি যে চশমা পরে আছি, সেটি আমার নয়। একজন আর হালদারের।

এই চশমাটির আমি পেয়ে গেছি যারপর নেই অভাবিতভাবে। ইতিহাসে পড়েছি, উর-সভ্যতার জন্য খননকার্যের সময়ে প্রথমে উঠে আসে একটি মৃন্ময় পালঙ্ক। চশমাটি সে-ভাবেই উঠে এল যেন। এবং এই একমাত্র চশমা, যা পাওয়ার জন্যে, বলতে গেলে, আমাকে কোনও রকম চেষ্টাই করতে হয়নি। এটি আমার হাতে চলে এসেছে ফুটপথে এক ভিখারি-কিশোরের আপ্রাণ অবদানের জন্য।

হল কী, মাস-দুই আগে, তখন আমার চশমা নেই। তখন রাত ৯টা। এলফিন থেকে টং হয়ে বেরিয়ে, আমি এগোচ্ছি ছোটা ব্রিস্টলের দিকে, এমন সময় একটি গাড়ি এসে ছেলেটাকে ধাক্কা মারল। ধাক্কা মৃদুই। কিন্তু, আশ্চর্য, তাতেই স্পট ডেড। রাগে কাঁপতে কাঁপতে আমি গাড়ির জানালা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে 'ইউ ফাকিং বাস্টার্ড' বলে ভদ্রলোকের চশমা চেপে ধরলাম। আর ভদ্রলোকও লোক জমার আগেই, গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন হুঁশ করে। তখন বুঝিনি। কিন্তু, পরে আমার কনুইয়ের কাছটা বেশ ফুল উঠল।

চশমার ডাঁটিতে স্বর্ণাক্ষরে লেখা 'আর হালদার' নামটি আমি পরের দিনই আবিষ্কার করি। গাড়ির নাম্বার কেউ দেখেনি, কিন্তু, সেটি ছিল সাদা আম্বাসাডার এবং মালিকের নামও পাওয়া গেছে। পুলিসে খবর দেওয়াই যেত। বলাবাহুল্য, আমি সে ভুল করিনি। কারণ অবশেষে, এতদিনের সেই চশমাটি আমি পেয়েছি, যার পাওয়ার যে-কোনও চক্ষু-চিকিৎসককে টেক্কা দিয়ে আমার চোখের পক্ষে একেবারে যথার্থ হয়েছে। রিমলেস, এত সুন্দর চমশা আমি আগে কখনও পরিনি। চমৎকার ফিটও করেছে। এত সুন্দর চশমা, 'একি এদেশে তৈরি'—সবাই জানতে চাইছে।

না, এই চশমাটি আমি সহজে হারাতে পারি না। নাম-না-জানা ফুটপাতের ছেলেটার মৃত্যুর দামে আমি এটা পেয়েছি। শুধু সুন্দর নয়। এটি তাই বহুমূল্য।

ঠিক করেছি, চোখের বদলে, চশমাটি আমি আই-ব্যাঙ্ককে দান করে যাব।

আজকাল, ১৯৯৪

আমার বন্ধু পিনাকী

পিনাকীর মৃত্যুর খবর এল বিকেল পাঁচটা নাগাদ। আর ঠিক আড়াই ঘন্টা পরে ওর আমাকে ফোন করার কথা। মাত্র গতকালই কথা হয়েছিল, আজ সন্ধ্যেবেলাটা আমরা লেক ক্লাবে বসবো। ও যেন গেটে দাঁড়িয়ে থাকে। ঠিক আটটার সময়। যখন আমি যাব।

'তা হলেও। ফোন করে নিস একবার।' আমি বলেছিলাম ওকে।

'ক'টায়?'

'তুই তো জানিস সব। আমি ক'টায় হেঁটে ফিরব। কখন বাথরুমে যাব। কখন চা নিয়ে বসবো।'

'সাড়ে সাতটায়?'

'এগজ্যাক্টলি।' আমি বললাম, 'ঠিক ওই সময়টা আমি চা নিয়ে বসি। যখন স্টার প্লাসে দ্যা বোল্ড অ্যান্ড দি বিউটিফুল হয়। আমি ওটা দেখি।'

আজ ঠিক সাড়ে সাতটায় ফোন করত পিনাকী। যেই সিরিয়াল শেষ।

শেষ মুহূর্তে আজকের বসার ব্যাপারটা অনির্দিষ্টকালের জন্যে আমাকে পিছিয়ে দিতে হল কি না, জেনে নিত। কেননা, কত কিছুই তো হতে পারে। চা আর চুমুকের মধ্যে। সুমন্তদা হাজির হলেন হয়ত। আমার ইনকাম ট্যাক্সের উকিল। বা, রামপুরিয়া। আমার বর্ধমান রোডের জমিতে যে মাল্টি-স্টোরিড তুলছে। তখন তো আর ওকে নিয়ে বসার প্রশ্ন ওঠে না। ওদের তদ্বির সবার আগে। বা, ছেলেমেয়ের কেউ বেরিয়ে গেল সিয়েলোটা নিয়ে। হাতে রইল পেন্সিল। মানে, ওই মারুতি জিপসিটা। কিন্তু, সন্ধ্যার পর ওটা পাওয়া না-পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। আমি যেতে চাইলেও ড্রাইভার সিধ্‌ধু একদম মুখের ওপর 'না' করে দেবে, 'মায়জিকো বসন্‌ৎ রায়মে যানা হ্যায়।' চোদ্দর-বি বসন্ত রায় রোডে ফি রবিবার ভজন হয়। সাঁইবাবা। গলায় ছোট আর বড় দুটো সোনার হার পরে সুদেষ্ণা সেখানে যায়।

বাস! তা হলেই আমার টেংরি খোলা। আমার তো আর পিনাকীর মতো, দেদার ট্রাম-বাস নেই। সবেধন, ওই দুটি নীলমণি। ট্যাক্সি? আরে বাবা, টেরাসে গাড়িই যদি পার্ক করতে না পারলাম, তা হলে আর লেক, স্যাটারডে, ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বার হওয়া কেন। ক্যালকাটা ক্লাবের কথাই ধরা যাক। ক্লাব গেটে আমার গাড়ি উঁকি দিলেই রামাশিস এগিয়ে আসবে, নীল উর্দি, কাঁধে স্ট্রাইপ, বুকে তকমা, 'আপনি নেমে আসুন সার, আমি পার্ক করে রাখছি', তবে না! বেরিয়ে আসার সময় একবার শুধু ল্যাণ্ডিং-এ দেখা দেওয়া। গাড়ি এসে দাঁড়াবে বারান্দায় নিচে। গেট খুলে দাঁড়াবে রামাশিস। দশ টাকা দামি সেলাম ঠুকে, পাবে পাঁচ। আসলে, ওয়ান্স ইন এ ব্লু মুন. আমি ওকে দশও দিই। কিন্তু সেটা যে ঠিক কবে, ও তো জানে না। তাই এ অনুপপত্তি। আর, আমি মরি হেসে। এ আমারই বুদ্ধি। যাই হোক, পিনাকী জানে সবই। ফোন করে, তবে ও ক্লাবে আসত। দাঁড়িয়ে থাকত গেটে।

ক্রেড্‌লে রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে আমি জেনে গেলাম, আমার বেঁচে থাকা থেকে পিনাকীকেও আমি একইভাবে নামিয়ে রাখছি। এখন থেকে আমার জীবন হবে পিনাকী-বর্জিত। আমার দেশের বাড়ি মুড়াগাছায়। নদীয়ায়, একদম জলঙ্গি নদীর ওপর। গেটের দু'পাশে ঠাকুর্দার আমলের দুটো মস্ত পাম গাছ। আমার প্রথম জন্মদিনে চারাদুটি

বসানো হয়। চুয়াল্লিশ বছর ধরে পাশাপাশি বড় হবার নির্মম প্রতিযোগিতা। সেবার কালবোশেখি। একটার মাথায় বাজ এসে পড়ল। যাকে বলে দু'ফাঁক হয়ে গেল ব্রহ্মতালু। তারপর শুকোতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কেটে ফেলা হল। কী হল তাতে? অন্যটির কী তাতে কিছু এল গেল। পাম-বংশ কি নির্বংশ হয়ে গেল? দিব্যি বেঁচে আছে। এবং, একা-একাই।

পিনাকীর ছেলে কাটু বলল, আজ দুপুর দুটো কুড়িতে মারা গেছে পিনাকী।

'দুটোয়? আর তুমি পাঁচটায় খবর দিচ্ছ!'

'দেখুন কাকু। আপনি তখন ঘুমোচ্ছিলেন।'

এই মুহূর্তে আমার পায়ে অ্যাডিডাস, পরনে সাদা গ্যাবার্ডিন শর্টস। বাঁ-দিকে টার্কোয়েজ ব্লু স্ট্রাইপ। ড্রাইভার সিধ্ধু এখন আমাকে ভিক্টোরিয়ায় ছেড়ে দিয়ে আসবে। ক্লোরেসস্টরেল, সুগার, প্রেসার এ-গুলোকে ভ্রুণে-হত্যা করার জন্য আমি এখন ঝাড়া পঞ্চান্ন মিনিট ভিক্টোরিয়ায় হাঁটব। আড়াই পাক।

একটু চুপ করে থেকে আমি বললাম, 'কিন্তু, আমি তো এখুনি হাঁটতে বেরিয়ে যেতাম।'

'আমি জানি কাকু। আর সেই জন্যেই তো এখনই ফোন করলাম।'

আর ক' মিনিট পরে ফোনটা এলে আমার জীবন থেকে অন্তত আজকের হাঁটাটা বাদ যেত না। আমি জানি, এটা আমার পক্ষে কত জরুরি। আমার বাবা, ঠাকুর্দা, ছোটকাকা, তিনজনেই মারা গেছেন হার্ট অ্যাটাকে। মাদ্রাজের অ্যাপেলো থেকে ডাঃ রঘুবীর এসে ওপেন-হার্ট করলেন বাবার। বরদান করে গেলেন। আরও বারো বছর। বছর ঘুরল কি? আসলে, ওইসব ট্রেড-মিল, আলট্রা সোনোগ্রাফ, সব বাজে। সার্জনগুলো প্লাম্বারের অধম। অবশ্য, স্ট্যান্ড-বাই হিসাবে ওরাও আছে আমার। কিন্তু, আসল ব্যাপার হল এই হাঁটাটা। হেঁটে গলদঘর্ম হওয়াটা। এটাই প্রকৃত দেহরক্ষী। যার উপর আমি আস্থা রাখি। এবং রেখে ভুল করি না। পঁয়তাল্লিশ পার হচ্ছি, একটা অম্বলেরও ব্যথা হয়নি কোন দিন। বুকে। নাগাড়ে ঝড়বৃষ্টি হলে আলাদা, নইলে এই ভিক্টোরিয়ায় হাঁটাটা আমার ধর্ম।

ফোন রেখে দেবার পর আমার কাছে তাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল আজকের হাঁটাটা। আমি কি আজকে হাঁটতে যাব। না, যাব না?

বছরখানেক আগে একদিন সন্ধেবেলা খুব অবাক করে দিয়েছিল। সবে একপাক দিয়েছি। দেখি, আমার হাঁটার রাস্তায় একটা বেঞ্চিতে পিনাকী। উঠে দাঁড়াল, তাই দেখতে পেলাম।

জানুয়ারির সন্ধে। সাড়ে পাঁচটাতেই অন্ধকার। আমাকে হাঁটতে হয় খুব দ্রুত, বিশেষত শীতে। কারণ, শীত যতই পড়ুক, ঘাম আমাকে ছোটাতেই হবে। আর ওই আড়াই পাকের মধ্যে। আমি তাই, ওকে দেখেছি বলে, হাঁটা থামাতে পারি না। পিনাকীও হাঁটা শুরু করল। বেচারা পিনাকী! সেদিন মায়াই হয়েছিল। কারণ, ওর ঠ্যাংদুটো তো আমার মতোন লম্বা-লম্বা নয়। আর হন্টন-শিল্পে অভিজ্ঞতা বলতেও ওর নেই কিছু। আমার পিছু-পিছু সেদিন প্রায় দৌড়তেই হয়েছিল ওকে।

কেন এসেছিল, বলেনি। আর কখনও আসেনি ওভাবে। তাই এটা একটা রহস্যই থেকে গেছে। শুধু বলেছিল, 'এমনি।' আমি ওকে মাঝে মাঝে ডাকি আমার ক্লাবগুলোয়। আড্ডা দিই। মদ-টদ খাওয়াই। ড্রাইভার পাঠিয়েও ডাকিয়ে এনেছি। ডাকলেই আসবে আমার নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে, চেনা-জানার মধ্যে এমন লোক আর কোথায়। তাছাড়া ডাকতেও হয় না। নিজেই যত্র-তত্র থেকে ফোন করে খোঁজ নেয়। যে, আজ আমার দরকার হবে কি না। ওকে। সুদেষ্ণা এটা বোঝে। এবং, এ পর্যন্ত তার কোনও আপত্তি

নেই। কিন্তু, তার ভয় অন্যত্র। একদিন, সে অসুখ-বিসুখ হোক, মেয়ের বিয়ের সময় হোক— কিংবা, একটা ছোট-খাট ফ্ল্যাটই কিনতে গেল হয়ত—বেশ মোটা একটা টাকা আমার কাছে চেয়ে বসবে সে। আর, আমার পক্ষে তখন 'না' বলা সম্ভব হবে না। এই তার ভয়। আমি তাকে বলি, 'খেপেছ তুমি! পিনু কিনবে ফ্ল্যাট? ওর ধারণা কি জান? ওর ধারণা, বাঁচার জন্যে যত তোড়জোড়, নিরাপত্তা, বিষয়-সম্পত্তি, টাকাকড়ি— এ সব যদি শূন্যে রাখা যায়—তবে সেটাই স্বর্গীয়। এ দিক থেকে যে যতটা কমে আছে, সে তত কাছাকাছি—স্বর্গের।' ঠোঁট উল্টে সুদেষ্ণা বলেছিল, 'বুনো রামনাথ?' তার ভয় যায়নি।

বুনো রামনাথ কিনা জানি না। তবে, একদিন ডায়োজেনিসকে নিয়ে আমাদের বেশ কিছু কথাবার্তা হয়। ডায়োজেনিসের বাড়ি বলতে ছিল একটা বাথটব। বিশ্বজিৎ আলেকজান্দার ওখানেই এসে দাঁড়ায়। গুরুদক্ষিণা দিতে। ডায়োজেনিস তখন বলেন, 'বাপু হে, একটু সরে দাঁড়াও। রোদটা দাও গায়ে লাগাতে।' এসব আমারও জানা। এবং ঘটনাটা সেই ছোটবেলাতেই একটুও ইম্প্রেসিভ মনে হয়নি আমার। আমার বরং ভাল লাগে ক্যানিয়ুটের গল্পটা। দাস ফার। অ্যাণ্ড নো ফার্দার।

কীভাবে মারা গেল, সংক্ষেপে বলল কাটু। রবিবার, খেয়ে উঠতে আড়াইটে হয়েছিল। একবার বাথরুমে গিয়েছিল। এসে সিগারেট ধরিয়ে ইজিচেয়ারে বসে। পাশের ঘরে মা আর বোন শ্রীতপা। কাটু পান কিনতে বেরিয়েছিল। হঠাৎ, পোড়া-পোড়া গন্ধ। মা গিয়ে দেখে, জ্বলন্ত সিগারেট পড়ে আছে কোলে। গায়ে ছিল তুষের চাদর। পুড়ে যাচ্ছে চচ্চড় করে। মাথা আর একটা হাত লটকে আছে চেয়ারের বাইরে। ডাক্তার সার্টিফিকেট লিখেছেন, ম্যাসিভ সেরিব্রাল অ্যাটাক। তিন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে মারা গেছে পিনাকী। একটুও কষ্ট পায়নি। জানতেই পারেনি। ডাক্তারবাবু সে-রকমই বলেছেন।

শুনতে শুনতে, স্মরণকালের মধ্যে এই প্রথম আমার বুকে একটু যন্ত্রণা হল। এবং বাঁদিকে। ঘামও দেখা দিল। একদম ক্লাসিক্যাল সিম্পটম। বাকি শুধু দম আটকে বমি আর পায়খানা পাওয়া। খুব ভয় পেয়ে গেলাম আমি। আমার হাত থর্থর করে কাঁপতে লাগল।

'কিন্তু, তুমি তো জানো কাটু,' আমি খুব অসহায়ভাবে বলতে লাগলাম, 'শুনে আমার হাত-পা কাঁপছে। এখন যদি যাই, ওকে দেখলে—আমার হার্ট তো মোটেই ভাল নয়—'

'না-না, কাকু।' কাটু ওপাশ থেকে আমার কথা ভেবে উদ্বেগ জানায়, 'আপনার আসার একদম দরকার নেই। আত্মীয়স্বজন সবাই এসে গেছে। শুধু হলদিয়ার পিসিমা বাকি। চোখে দেখলে হয়ত স্ট্যান্ড করতে পারবেন না আপনি। হয়ত আপনার কিছু হয়ে যাবে।'

'খুব কান্নাকাটি হচ্ছে?'

'তা একটু—'

'বাবার চাকরিটা পাবে তো তুমি?'

'তা পাব কাকু।' বাবার কথা ভেবে গলা বুজে এল তার, ছোট্ট ফোঁপানির শব্দও শুনতে পেলাম, 'তবে গ্র্যাজুয়েশনের পরে হলে ইনস্পেক্টর পোস্টে নিত।'

'না-না। যা পাচ্ছ, নিয়ে নেবে।'

'হ্যাঁ। তাই করব কাকু। ছোটমামাও তাই বলছেন। আঃ—' এইখানে কাকে যেন তাড়া দিয়ে আর বেশ ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে ধমক দিল, 'একটু অপেক্ষা করুন। একটা ডেড নিউজ দিচ্ছি আমি।'

'তুমি কোথা থেকে করছ?'

'বুথ থেকে কাকু।'

'ঠিক আছে। ওঃ হো, আজই আসবে বলেছিল।'

'হ্যাঁ।'
'তুমি কী করে জানলে?'
'মাকে বলেছিলেন বাবা সকালে।'
'কী বলেছিলেন?'
'সকলেই বোধহয় ইণ্ডিকেশন পেয়েছিলেন কিছু। বাজারে বলছিলেন, হঠাৎ মনে হল পায়ের তলায় মাটি নেই। তলিয়ে যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। সব অন্ধকার। তারপর ঠিক হয়ে গেল। আজ বোধহয় ভোম্বলের কাছে যাওয়া হবে না।'
পিনাকী আমার বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলের বন্ধু। ডাকনামে ডাকে।
'আপনি নিউজ দিচ্ছেন না, নিউজ স্টোরি?' এই সময় তীক্ষ্ণ এক তরুণী-কণ্ঠ শুনতে পেলাম আমি।
'আমি ছেড়ে দিচ্ছি কাকু,' কাটু বলল, 'কাল সকালে আপনি আসছেন তো?'
আজ আমার সন্ধ্যার সঙ্গী বলতে কেউ নেই। আজ কোনও অ্যাপো নেই কারও সঙ্গে। বহুদিনের মধ্যে এই প্রথম আমি হাঁটতে গেলাম না। বাড়িতে ছেলেমেয়ে কেউ নেই। সুমন্তদার স্ত্রী এসে সুদেষ্ণাকে নিয়ে গেছে বর্ধন মার্কেটে। চাট-ফাট খেয়ে কখন ফিরবে ঠিক নেই। আমি বাড়িতেই বসে গেলাম একটা জিন আর লাইম নিয়ে। সাতটা নাগাদ। আমার পক্ষে একটু তাড়াতাড়ি। দ্য বোল্ড অ্যাণ্ড দি বিউটিফুলের কথা মনে এলেও রিমোটে হাত দিলাম না। কী রকম যেন একটা অনুপস্থিত উপস্থিতি বোধ করতে লাগলাম পিনাকীর। আহা, এখনও হয়ত শ্মশানে যায়নি। বোন পারুল এসে পৌঁছয়নি। মনে হল, সত্যি চিরটাকাল আমি দাবিয়েই রেখেছি ওকে। আমার ইচ্ছা, আমার ধ্যান-ধারণা মেনে নিতে বাধ্য করেছি। আর, মুখ বুজে সে তা মেনেও গেছে। দিনে দিনে, এটা একটা পাশবিক অত্যাচারের পর্যায়ে চলে যায়নি কি? পিনাকীর জন্যে, একা বসে জিন খেতে খেতে, এই প্রথম, ঠিক অনুশোচনা নয়, নাম দিতে গেলে কষ্টই বলতে হয় তাকে—কষ্ট হতে লাগল আমার। মনে হল, যাইনি, ভালই করেছি। বুকের ওপর দু'হাত, নাকে তুলো, চোখে ফাটা ফ্রেমের চশমা—ওকে দেখে হয়ত আজ কেঁদেই ফেলতাম আমি।
আমার মারুতির কথা মনে পড়ল। আজ সুদেষ্ণা গাড়ি নেয়নি।
আটটার সময় গেটে পিনাকীর থাকার কথা নয়। তবু আমি গেটের দিকে তাকাই। গেট ছেড়ে, গাড়ির রাস্তা ছেড়ে, বেশ কিছুটা দূরে, ওই ঝাউগাছটার নিচে দাঁড়াত পিনাকী। আজ এলে।
আজ লোকজন কমই। লেক ক্লাবের প্রশস্ত, ঘাসজমির লনকে গোলাকারে ঘিরে ছোট ছোট আলোকস্তম্ভ। হলুদ ফুটবলের মতো। হিম তো পড়ছেই। তাছাড়া কুয়াশা। অন্ধকার থেকে সুমন্তদা ডাকলেন। আমি কাছে গেলামও।
'নমিতা তো তোমাদের বাড়ি গেল।'
'হ্যাঁ। ওরা বেরিয়েছে।'
'বোসো?'
'না সুমন্তদা।' জলের ধারে একটা টেবিল দেখিয়ে বললাম, 'আমি ওদিকটা বসছি।'
'তোমার বন্ধু আসবে?'
বেশ কয়েকবারই আমি আলাপ করিয়ে দিয়েছি পিনাকীর সঙ্গে। কিন্তু, উনি কখনও রেফার করার সময় ওর নাম করেন না। পিনাকীকে জাতে তোলার জন্য ওর ইউ-ডি ক্লার্কের সামান্য চাকরির কথা চেপে গিয়ে আমি জোর দিয়ে বলে দেখেছি, আমার বন্ধু। এ ভেরি ওল্ড ফ্রেন্ড অফ মাইন।' বসেছিও আমরা একসঙ্গে। দেখেছি, সুমন্তদা কেন, কেউ

কনভিন্সড হয় না। কেউ হয়ত জানতে চাইল, থাকেন কোথায়? পিনাকী বলল, 'বাঁশদ্রোণি।'

'বাঁশদ্রোণির কোথায়?'

পিনাকী সসঙ্কচে বলল, 'গাছতলা স্টপ জানেন কি?'

বাস হয়ে গেল। কেউ আর জানতে চায় না, সেটা কোথায়। কোথায় থাকেন? না, গাছতলায়। সত্যি, এর পর আর জানার কী থাকতে পারে। পিনাকী সেদিন আসে, আমি তাই ইদানীং আলাদা বসছিলাম ওকে নিয়ে। এটা ওরা জানে। ওই জলের ধারের টেবিলটায়। আজ সেখানে একা বসতে বসতে আমি ঠিক করলাম, এই লেক ক্লাবটা আপস্টার্ট লোকজনে ভরে গেছে। আমি এখানে আর আসব না। আমি ক্যালকাটা ক্লাবে যাব।

জিন-লাইমই চালিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। আমি তাই বললাম। আজ পনের বছর ধরে দু'জনে হুইস্কি ছাড়া কিছু খাইনি বলতে গেলে। জিন তো নয়ই। জিন তো নয়ই। তবে হুইস্কি হলে আমাকে রয়াল চ্যালেঞ্জ আর পিনাকীকে ডি এস পি দেয়। বেয়ারা বদ্রিনাথকে বলতে হয় না। সে এটা জানে। রয়ালেরও দাম প্রায় দ্বিগুণ। এই ব্যবস্থাটা আমারও খারাপ লাগছিল শেষের দিকে। আজ থেকেই, আমি ঠিক করেছিলাম, জিন বলব। ম্যানসন হাউস ছাড়া এখানে কোনও জিন পাওয়া যায় না।

ভীষণ, ভীষণ ভুল করল বদ্রি। ওর থালায় দুটো গ্লাস, দুটো স্ন্যাক্স। দুটো সোডা।

সেদিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'কী ব্যাপার। দুটো কেন?'

বদ্রি বলল, 'বাবু আসবেন তো?'

আমি 'না' বলতে যাচ্ছিলাম। ঠিক এই সময় দেখলাম, পিনাকী হেঁটে আসছে।

মানুষ সারাজীবন ধরে যে সব ভয় পায়, ভয়ে মরে থাকে, তার একটাও ভয় নয়। জীবন জুড়ে ভয় পেতে পেতে শেষে যে ভয় আসে সেটাই ভয়। কিন্তু, তখন আর ভয় পাবার ক্ষমতাটাই থাকে না। আসলে যতক্ষণ সাহস, ভয় তো ততক্ষণই। সাহস মরে গেলে আর ভয় কীসের। যেমন, মৃত্যুর ঠিক আগের মিনিটগুলো, মুহূর্তগুলো। যখন সবকটি স্লুইস গেট খুলে গেছে এবং তোড় জলে ভেসে যাচ্ছে সব কিছু। এ প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তখন আর লড়াই কী। তখন সাহস কী। অব্যর্থভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, তখন আর ভয় নেই। পিনাকীকে দেখে আমার একটুও ভয় করল না। এমন মানুষ থাকতে পারে যারা, এমন অবস্থায়, হাউমাউ করে ওঠে। আমি দেখলাম, আমি তাদের একজন নই। আমি তো ভূতে বিশ্বাস করতে পারি না। নিশ্চয়ই কোথাও কিছু ভুল হয়েছে। বেঁচে আছে পিনাকী। আর যদি মরেই গিয়ে থাকে। পিনাকী তো। পিনাকীই এসেছে।

'কীরে, কী ব্যাপার?'

'কী ব্যাপার মানে? আসার কথা ছিল না?'

'তা ছিল। কিন্তু গেটে তো ছিলি না?'

'একদিন একটু দেরি হতে পারে না?'

আমি দেখলাম, এই প্রথম আমি অত্যন্ত সশ্রদ্ধভাবে কথা বলছি পিনাকীর সঙ্গে। যেন, সে আমাদের সকলের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি সফল মানুষ। সম্ভ্রান্ত মানুষ। তবে এও ঠিক যে, আজ ওর আটকে পড়ার কারণটা কী, আমি তা সবিস্তারে জানতে চাই না। বলতেও দেব না ওকে, কোনও মতে।

আমি খুব সহজভাবে বললাম, 'নে শুরু কর।'

ওর জন্যে একটা গ্লাস আগে থেকে আনানো হয়েছে দেখে খুবই সন্তুষ্ট হল পিনাকী। গ্লাস তুলে বলল, 'চিয়ার্স।' বলেই বরাবরের মতো একটা ছোট্ট চুমুক দেয় গ্লাসে।

'থুঃ-থুঃ। এ কী!' দেখলাম বাঁ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে গ্লাস সরিয়ে দিচ্ছে সে।

'কেন রে, কী হয়েছে?'

'এ তো হুইস্কি নয়!'

'না, জিন। খা না। ম্যানসন হাউস।' জিভে একটা টাক-শব্দ তুলে আমি বলি, 'ব্রিলিয়ান্ট করেছে।'

'কিন্তু আমি তো হুইস্কি খাই।'

এই প্রথম পিনাকী আমাকে জানাল, সে যা চায়। পর্দা নিচের দিকে হলেও তার এমন তীক্ষ্ণ গলা আমি আগে কখনও শুনিনি।

'হুইস্কি বল্।'

অতি কঠিন, ক্রুর গলায় সে আদেশ করল আমাকে। তবে খুব চাপা স্বরে। যেন কেউ শুনতে না পায়। কিন্তু, চিৎকার হয়ে তাই ছড়িয়ে পড়ল আমার শিরায় শিরায়। স্নায়ু থেকে স্নায়ুতে। 'হুইস্কি বল', 'হুইস্কি বল্' ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে হতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল আমার অস্তিত্ব জুড়ে।

বরং আমিই চিৎকার করে উঠলাম, এবং, সবাই তা শুনতে পেল।

'বদ্রি!'

দূর কাউন্টার থেকে মাঠের ওপর দিয়ে বদ্রি দৌড়ে আসে।

'ক্যা হুয়া সাব?'

'দো রয়াল চ্যালেঞ্জ লে আও।'

আলোর আভাস পেয়ে এখন বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে পিনাকী। কে বলল, পিনাকী নয়? আমার মনে হল, এতদিন যে এসেছে, সেই বরং পিনাকীরই ভূত।

আজ অবশেষে, পিনাকী এসেছে আমার কাছে। পিনাকীই এসেছে।

মিনিবুক, বইমেলা ১৯৯৫

জীবন : একজন ব্যবহারকারীর বিবরণ

দাঁত সম্পর্কে শিরোধার্য তত্ত্বকথাটি রয়েছে একটি অমর প্রবাদের মধ্যে। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝলি না। সত্যি, এমন মানুষের অস্তিত্ব থাকতেই পারে না, অন্তত বাঙালি যে, যে-কিনা এই আপ্তবাক্যটি জীবন-ভর একবারও শোনেনি। এবং যেমন-যেমন বড়টি হয়েছে, বিবিধ অবস্থায় কথাটি প্রযুক্ত হতে দেখেনি। এ-ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা তো জীবন জুড়ে ছড়িয়ে।

দেবগ্রামে থাকতে, মেজবউদিকে যখন তোলা হল জলের তলা থেকে। ঘাটের শেষ ধাপটার পরেই উপুড় হয়ে শুয়েছিল, দেখা যাচ্ছিল চাতাল থেকে, বর্ষার নতুন জলে পুকুর ছিল এত স্বচ্ছ! উপুড় করেই শুইয়ে রাখা হল চাতালে। পুলিস আসার আগে কেউ সাহস করেনি বডি চিৎ করে শোয়াতে। পুলিস যখন তা করল, দেখতে পেলাম, (পেয়েছিলাম), গলায় মটরমালায় মতো বেশ কটা গেঁড়ি পর পর গেঁথে আছে। সন্তানহীনা বউদির দুগ্ধবোধহীন স্তনদুটি আগাগোড়া খোলাই পড়ে থাকল, কই, কেউ তো ঢেকে দিল না। যে মাংসপেশী দুটি চোখের আড়ালে রাখা বাধ্যতামূলক বলে মনে করেছিল তাঁর সারাজীবন,

যেন আজ তা ঢেকে দেবার মতো অশ্লীল কিছু হয় না, সে দুটি দেখেই যে, এমনটা নাও হতে পারে, মেজদা শ্যালক বিশ্ববন্ধুকে জড়িয়ে ফোঁপা-কান্নার মধ্যে বলেছিল, স্পষ্ট মনে পড়ে আমার, 'দাঁত থাকতে আমি দাঁতের মর্যাদা বুঝিনি, বিশ্ব! আমি দাঁতের,' দুহাতে বুক চাপড়ে, 'ও হো-হো।'

এ নয় যে, কথাটা আমি সেই প্রথম শুনলাম। কেননা, তখন বছর-১২। ৩২ পাটির সবকটি দাঁতই ততদিনে বেরিয়ে পড়ার কথা। এবং আরও একটি, যেটা নাকি আক্কেল, সে তো আঠারোর আগে দেখা দেয় না! অবশ্য, আক্কেল আঠারতেই যে উঠবে এমন কোনও কথা নেই। তিরিশ, বত্রিশ, বিয়াল্লিশেও তার আর্বিভাবের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বহুক্ষেত্রে আসেই না।

যেমন আমার। আক্কেল-দাঁত এখনও ওঠেনি। আর উঠবে বলে মনেও হয় না। দাঁত থাকতে, প্রথম দিকে, সেই কারণেই আমি দাঁতের মর্যাদা বুঝিনি। কেউ কেউ ভাবছেন দাঁত নয়, আমি বুঝি কান টেনে এ-ভাবে মাথাকেই টেনে আনছি অর্থাৎ কিনা জীবন। তা কিন্তু নয়, আদৌ নয়। আঁচ্ছা, আপনি ওই আবাল্য প্রবচনটিতে দাঁতের বদলে 'জীবন' বসিয়ে দেখুন না! 'জীবন থাকতে জীবনের মর্যাদা বুঝলাম না।' হয় না। কেন হয় না? কেননা, জীবন প্রকৃত প্রস্তাবে সেই ছিনাল মাগী যার যেমন বেণী তেমনি রবে আর যে কেশাগ্র ভেজাবে না। জীবনের মতো কাছের এবং দূরের, নিজের এবং পরের, একক ও বহুমাত্রিক, বাস্তব অবাস্তব (বা তার উল্টো) আর কী? এই তো বছর-দুই আগের কথা মাত্র। ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজিতে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কাচের ঘরে ইন্দ্রজিৎ। বেডের মাথার মনিটরে প্রতিটি হৃৎস্পন্দনের বিচিত্র চলচ্ছবি। হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট থেকে তার বিজি রিপোর্ট (ব্লাড-গ্যাস অ্যানালিসিস) হাতে টাক্সিতে যখন ইনস্টিটিউটে পৌঁছলাম, সে মৃত (২৩-২-৯২)। তখন দুপুর বেলা। পথে হরিশ মুখার্জি পেরিয়ে শম্ভুনাথের মুখে একটা ছোট্ট দোকান। সামনে মস্ত ফুটপাত জুড়ে ডাঁই-করা লুডোর ছক্কা ডিজাইনের লাল-নীল প্লাস্টিকের চৌকো টুল। এ নয় যে খুব দুর্লভ। কিন্তু ওই সাদা রঙেরটা। ট্যাক্সির জানালা থেকে মনে হল, ওটা আমার চাই। আমাদের টেলিফোনের সামনে বসার বেতের টুলটার পায়া অনেকদিন ভেঙে গেছে। ইন্দ্রর মৃত্যুর পর যুঁইকে সঙ্গে নিয়ে সাত দিনের মধ্যে নিয়েও এসেছি টুলটা। ওটাতে বসেই তো আমি ইন্দ্রর স্ত্রী শ্রাবণী এবং তাদের বাচ্চা মস্তানের খোঁজখবর করি। শ্রাবণী জানে, ওর মৃত স্বামীর জন্য, বন্ধুদের মধ্যে, আমার মতো কেউই করেনি। এত উতলা হয়নি। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেরই তাই ধারণা। এমনকি, আমারও। যতক্ষণ জ্ঞান ছিল ইন্দ্রও তাই জেনে গেছে। ওর দরুণ, ওর অফিসে শ্রাবণীর চাকরি, ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দিয়ে গেছে আমাকেই। এবং আমি তা পালনও করেছি। এবং, সাদা টুলটাও বাড়িতে আনতে ভুলিনি।

জীবন এ-রকম। অন্তত, এ-রকমও। ওই যে জ্ঞান দিলাম একটু আগে? নিজের এবং পরের; কাছের এবং দূরের ইত্যাদি। সেই ব্যাপার। তা, এর আবার মর্যাদা কী।

বরং দাঁত ভাল। লিভার বা কিডনির মতো সুশিক্ষিত রসায়ণবিদ্ হয়ত নয়। কিন্তু, তাদের মতো অনির্ভরযোগ্য বা অননুমেয়ও নয়। এ তো আগে থেকেই জানা যে প্রথমে ২২টা দুধে-দাঁত উঠবে। কারণ শিশুবেলায় ছোট্ট চোয়ালে তার বেশি দাঁত ধরে না। তারপর চোয়াল বাড়বে এবং সেগুলির জায়গায় দেখা দেবে, ক্রমে, চোয়াল বাড়িয়ে, মোট ৩২টি দাঁত। দাঁত থাকতে থাকতে মরে গেলে, হাজার হাজার বছর ধরে মৃত মানুষের একমাত্র স্মারক হিসেবে শুধু তারাই বেঁচে থাকে। কত ফসিল পাওয়া গেছে, যাদের কিছু নেই, কিন্তু দাঁত আছে। পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া কত না অশরীরীর সনাক্তকরণ হয়েছে

নৈনং-দহতি-পাবকঃ মৃতের দাঁত থেকে। হায় যে, দাঁত থাকতে মানুষ এমন জিনিসেরও মান রাখে না।

কিন্তু, আমি তাদের একজন নই।

ভাগ্যিস, খুব অল্প বয়সেই দাঁতের অসুখ করেছিল আমার। সামান্যই রক্ত পড়েছিল আমার শ্ব-দন্তের (ক্যানাইন) গোড়া দিয়ে। আর একটু ফুলেও গিয়েছিল। ইন্দ্রই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ওর মেসোমশাই ডাঃ এন আর গুণ-এর কাছে। আমি এমনিতে যেতাম না। কিন্তু সেই অখ্যাত ডেনটিস্টের এক শ্যালিকাপুত্র ছিল বলেই আজও আমি আমার ৩২টি অটুট দাঁতের গর্বে গরীয়ান। দাঁত ব্যাপারে বেশ কিছু জানকারি ছিল তার, ইন্দ্রর। অন্তত আমার সেই বিশ্বাসই জন্মাল, যখন সে 'আরও বড় করে' হাঁ-করতে বলে তর্জনী ও বুড়ো আঙুল দিয়ে আমার নিচের পার্টির সুস্থ সামনের দাঁতদুটো (ইনসিসর্স) চেপে ধরে, বের করে, তার তর্জনী ডগায় দেখাল এক ফোঁটা পুঁজ! আমি শিউরে উঠলাম। দাঁত দিয়ে এ-ভাবে রক্ত-পড়া এবং দাঁতের-গোড়ায় পুঁজ লিউকোমিয়ার প্রথম লক্ষণ হতে পারে, ইন্দ্র আমাকে বলল, সিফিলিসও হতে পারে। 'লিউকোমিয়া না হলেও সিফিলিস হবার সম্ভাবনা আমি একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না।' ইন্দ্র গম্ভীরভাবে আমাকে জানায়, যদিও মাত্র একবারই আমি সোনাগাছির মল্লিকার কাছে গেছি। যদিও সেটা বছর-দুই আগের কথা। ইতিমধ্যে আমি বিয়ে করেছি এবং রক্ত পরীক্ষা না করিয়েই। শুনে আমি ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললাম।

আমার সিফিলিস হয়েছে কিনা জানতেই ইন্দ্রর নামডাকহীন মেসোমশায়ের কাছে আমি যাই। জ্যোতি সিনেমা বিল্ডিঙের মধ্যে, দিনের বেলায় আলো জ্বলে এমন অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে, আমি আমার জীবনের প্রথম ডেন্টিস্টের মুখোমুখি হই। বি-ডি-এস নামে যে একটা ডিগ্রি আছে ওঁর নেমপ্লেট দেখার আগে আমি তা জানতাম না। পেরিডোন্টাইটিস নামে দাঁতের অসুখের সঙ্গেও আমার সেই প্রথম পরিচয়। রোগা, ক্ষয়াটে, শুভ্রকেশ, বৃদ্ধ দন্তচিকিৎসক একটি সাদা অ্যাপ্রন পরেছিলেন। কিন্তু, এই বয়সে এত ঝকঝকে দাঁত!

পেরিডোন্টাইটিসের সঙ্গে 'পেরিল' শব্দের প্রায় এক-ততীয়াংশ জুড়ে আছে অনুভব করে আমি খুব ভয় পেলাম। মুখ সাদা হয়ে গেলে আমার।

'এই অসুখ হলে কী হয় মেসোমশাই?'

'আরে, ভয় পাচ্ছ কেন এত?' ইন্দ্রজিতের মেসো ডেন্টাল চেয়ারে বসিয়ে আমার পিঠে হাত রাখলেন, 'আমি তো আছি।'

'না-না। তা বলছি না। এ কি খুব খারাপ অসুখ?'

'আরে, না-না।' প্রয়োজন ছিল না। তবু জোরে হাসতে গেলেন ডাঃ গুণ, তাই ওপর পাটির ডেনচারটা একটু ঝুলে পড়ল, কড়াৎ-শব্দে দাঁত বসিয়ে এবার গম্ভীরভাবে বললেন, 'চিকিৎসা করালে কিছু হবে না। কিন্তু না করালে—'

'না করালে?'

'না করালে সব দাঁত পড়ে যাবে।'

'সব দাঁত?'

'প্রত্যেকটা।'

'ক-বছরের মধ্যে?'

'৪০ হবার আগেই।' ডাঃ গুণ বললেন, '৪০-এর ওদিকে যায় না।'

৪০? আর মাত্র ১০ বছর? না-না, ৪০-এই আমি তালতোবড়া বুড়ো হতে চাই না। লিওনার্দোর মতো প্রতিভাধর হলেও রাজি নই আমি, ওঁর মতন দন্তহীন হতে।

প্রথমে সাত থেকে দশটি সিটিং। আমার দাঁত স্ক্রেপিং করাতে হবে, উনি বললেন। খরচ পড়বে পার সিটিং ২০০ করে। তারপর চিকিৎসা। বছরে অন্তত একবার স্ক্রেপিং করাতে হবে। সঙ্গে ওষুধপত্র। আমি রাজি হয়ে গেলাম। গত দশ বছর ধরে ওর সমস্ত উপদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছি। ওঁর প্রেসক্রাইব করা মাউথ-ওয়াশ ('আমাজোন'), আমি দৈনিক দুবার ব্যবহার করতে কখনও ভুলি না। ৪০ বছর পার হচ্ছি—এখনও আমার একটা দাঁতও পড়েনি।

এদিক থেকে ইন্দ্রনাথের কাছে আমার ঋণ শোধ হবার নয়। শুধু তারই জন্যে আমার ৩২টি দাঁত আজ এমন ফুলের মতো ফুটে আছে। ফুল ছাড়া কী। ডাঃ গুণ যতদিন বেঁচেছিলেন, আমি তাঁর কাছে নিয়মিত গেছি। উনিই আমাকে বলে গেছেন, দাঁত হল টবের গাছ। আর মাড়ি হল মাটি। গাছের মতোই মূলরোম শাখারোম বিছিয়ে মাড়ির মধ্যে শেকড় গেড়ে দাঁড়িয়ে আছে দাঁতের পর দাঁত। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ফাইবার তাদের মাড়ির মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। সেই শেকড় পর্যন্ত এর যত্ন নিতে হয়। দাঁতের চেয়ে সমাজবদ্ধ প্রত্যঙ্গও শরীরে আর কিছু নেই। দাঁত-সমাজে আপার গামের ক্যানাইনের ভূমিকা সমাজপতির মতন, ডাঃ গুণ আমাকে বলে গেছেন, একটি দাঁত নড়ে গেলে, বা পড়ে গেলে, সমস্ত দাঁতের সর্বনাশের শুরু। শরীরের সমস্ত প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হলে সারানো যায়। কিন্তু দাঁতের কোনও ক্ষতি হলে তা আজীবন ক্ষতিগ্রস্তই থেকে যায়। আর একা-দাঁত? 'ওরে বাবা', একদিন শিউরে উঠে উনি আমাকে বলেছিলেন, 'তার চেয়ে ভয়ঙ্কর জঙ্গলের একা বাইসন ও নয়। যত কার্সিনোমা কেশ দেখেছি, সব, সব একলা-দাঁতে।' এমনই কত অমূল্য উপদেশই না ইন্দ্রজিতের মেসোমশাই আমাকে দিয়ে গেছেন। না বেরুক আক্কেল, আজ যে আমার ৩২টি দাঁত তাঁরই ব্যবস্থাপত্র মতো নিত্য-শুশ্রষার ফলে এমন সগৌরবে বেঁচে আছে, এর জন্যে ইন্দ্র তো অনেকখানি দায়ী। অসুখের একেবারে প্রারম্ভে অশেষ গুণাধার তার ডাক্তার মেসোমশাইয়ের কাছে নিয়ে না গেলে আজ তো আমি ফোকলা লিওনার্দো (দ্যা ভিঞ্চি)? শুধু তার জন্যই আমার লিউকোমিয়া হয়নি। সিফিলিস হয়নি। হয়েছিল পেরিডোন্টাইটিস মাত্র। শুধু তার কারণেই আমি আজও ইনসিসর্স দিয়ে ছিঁড়ছি। মোলার দিয়ে পিষে যাচ্ছি। আমি ইন্দ্রজিতের কাছে ঋণী।

ওঃ হো, একটা কথা। আচ্ছা, এটা কি আমি আগে বলেছি না বলিনি যে, ইন্দ্রর বউ শ্রাবণী, সঙ্গমের সময়, সেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত—অ, আ, ও, ঔ শব্দে গোঙায়। বাকি সবটা মল্লিকা কি আমার স্ত্রী যুঁই-এর মতন। শুধু ওই গোঙানিটুকু বাদে। স্বীকার করতে আমার একটুও লজ্জা নেই যে, তার অব্যক্ত এই ধ্বনিবর্ণমালা, শুধু যৌন নয়, আমার গোটা জীবনকেই উপহার দিয়েছে নব-সাক্ষরের এক নতুন দিগন্ত। ইন্দ্রর মুখে ছিল সেই বদবু, যা কোলগেটের বিজ্ঞাপনে। যা আমার মুখে নেই। শ্রাবণী জানিয়েছে আমাকে।

কিন্তু এ-সব তো জীবনের ব্যাপার। দাঁতের ব্যাপার হলে অনেক আগেই আমার মনে পড়ত।

১৯৯৫

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

শীতের সকাল। সাউথ এণ্ড ক্লাবের লনে রোদের ছড়াছড়ি। সবাই ভোদকা খাচ্ছে। বেশ একটা পেরেস্ত্রৈকা-আবহাওয়া। বোধহয় ভোদকার কারণে প্রথমেই রাশিয়া-প্রসঙ্গ উঠে এল।

ঠিক যে রাশিয়া, তা না। বিলোচন চেয়েছিলেন পিনাকী বোসকে একটু লেগপুল করতে। দুজনে একগ্লাসের তো বটেই, এক ক্লাসেরও বন্ধু। বহু বছর একসঙ্গে। কিন্তু কান টানতে গিয়ে এসে গেল মাথা। সে একটা সময় ছিল যখন ইন্দো-সোভিয়েতের জিম্মাদারি ছিল পিনাকীর কাঁধে। বাঁক-কাঁধে তারকেশ্বর যাবার মতো অনবরত রাশিয়া যেত। এ সেই তখনকার গল্প।

একদিন হয়েছে কী, পিনাকী আর বিলোচন হিন্দুস্থান রোড দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। পুজোর সময়। তখন বিকেলবেলা। তিনতলার বারান্দা থেকে শিল্পী মধুর ভার্গব জানতে চাইল, 'এই যে বোসদা চোললেন কোতা?' 'এই একটু মস্কো যাচ্ছি ভাই', পিনাকী চেঁচিয়ে বলল, 'তোমার কাছে একটা কোট হবে?' 'বিলোচন জানতে চাননি বলে এতক্ষণ তাঁকে কিছুই বলেনি পিনাকী। তার পায়ে কাবলি। কাঁধে ঝোলা। ঝোলায় বড়জোর একটা পুলোভার থাকতে পারে! মস্কো না তারকেশ্বর, বোঝাই বা যাবে কী করে।

'বোঝ ব্যাপারটা।' জিভ দিয়ে নিচের পাটিটা তুলে ফের বসিয়ে নেন বিলোচন, 'মস্কোয় তখন একহাঁটু বরফ। যাইহোক, মধুর আর নিচে নামল না। তিনতলা থেকেই কোটটা ছুঁড়ে দিলে।'

নিজস্ব ভঙ্গিমায় গল্পটি রীতিমতো রসস্থ করলেন বিলোচন। সবাই উপভোগ করল। বিলোচনের সর্বাঙ্গে প্রেমময় দৃষ্টি বুলিয়ে বোসদা সহাস্যে বললেন, 'তুমি লুফেছিলে!' রাশিয়া-প্রসঙ্গ উঠে এল এখান থেকেই। 'লেনিনও তো মার্কর্স থেকে নিয়েছিলেন শুধু প্র্যাকটিসটুকু। শুধু কাজটুকু হাসিল করেছিলেন। রেভলিউশান। মার্কসবাদ উনি পড়লেন কখন। সেসব তো পড়েছিল রোজা লুক্সেমবার্গ। সেই রোজাকে লেনিন বললেন খুকিবিপ্লবী—হাঃ!' এত বলে বোসদা হাঁফাতে লাগলেন। যেন কৈফিয়ত তলব করছেন বাপের কাছে। কেন জন্ম দিয়েছিলে!

প্রবাল সেনগুপ্ত ছিল এম এল পার্টির নামকরা ছাত্রনেতা। পরে বোসদার দৌলতে ও তাঁর মন্ত্রী-বন্ধুর সুপারিশে অ্যান্ড্রু ইউলে ভাল চাকরি পেয়েছে। এ পি আর ও। পেয়ে অসি ছেড়ে বাঁশি ধরেছে। এখন সে পড়েছে তার বিপ্লবী অভিজ্ঞতারাশি নিয়ে। ইতিমধ্যেই অনাথাশ্রম প্রকাশনী তার তিনখানি উপন্যাস নামিয়ে দিয়েছে। এখন প্রাক্তন বিপ্লবীদের চেয়ে তার বেশি দরকার নামকরা লেখকদের। সৌভাগ্য তার যে, সে বিলোচনের ঘাটে ভিড়তে পেয়েছে। ঘ্যাম সম্পাদক ও ঘাঘি প্রকাশকরা যেখানে। তবু, পিনাকীর মতো সে একদিন জেল খেটেছে। গ্রামে সংগঠিত করতে গেছে কৃষকদের। বীরভূমের তুরতুরি গ্রামে চেয়ারম্যান চারুর সঙ্গে বসে পার্টি লাইন ঠিক করেছে। হোক নকশাল, বামপন্থী তো বটে। পিনাকী তাকে জেল থেকে বের করেছেন। ডানা ছেঁটে বসিয়েছেন দাঁড়ে। ভোদকায় লম্বা চুমুক মেরে সমর্থনের আশায় তিনি তাই তাকান শুধু প্রবালের দিকে। কিন্তু প্রবাল তাকিয়ে সম্পাদক দীনবন্ধু পাঁজার দিকে। এবং আগাগোড়া। দীনবন্ধু দপ্তরে তার 'সমাধিভূমিতে স্বাধীন পিঁপড়ে' নামে একটি গল্প পড়ে আছে। ছাপা হলে, সর্বাধিক স্বীকৃত 'দিগম্বরী'-তে এটাই হবে তার প্রথম গল্প। তারপর আরও ক'বার বাসন মেজে গেলেই আসবে বাবুর

বিছানায় ডাক। তারপর... বছর ঘুরতে না ঘুরতেই কোল জুড়ে ট্যাঁ-ট্যাঁ, পুজো উপন্যাসের খোকা। বিলোচনের শুরুও তো এভাবেই। আজ কাঁখে-পো, কোলে-পো। মন্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে বোসদা। বোসদার সঙ্গে মোসাহেবির সূত্রে সে। তার চাকরি। এমনটাই হয়ে থাকে। দেওয়া-থোওয়ার কন্ট্রোলিং পাওয়ারটা থাকা নিয়ে কথা।

যেটা নাকি বোসদার আর নেই। প্রবালকে কিছু দেবার ক্ষমতা তাঁর আর নেই। এখন বিলোচন। এখন দীনবন্ধু। যদিও পার-করেগা এ ভোলে-বাবার মনে যে কী আছে, তা বোঝা কঠিন কেন, প্রায় অসম্ভব। বৌ-বাচ্চা সবার খবর নেন। কিন্তু ছ'মাস হতে চলল, 'সমাধিভূমি' নিয়ে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন না তো। সে এখন কী লিখছে, প্রকাশ্যে না হোক, নিচুস্বরেও জানতে চান না কখনও। হাল ছাড়বার সময় তবু এখনও আসেনি।

দীনবন্ধু বলতে গেলে এই প্রথম মুখ খুললেন, 'কিন্তু গর্বাচভ? এঁর লেখাপড়া কদ্দুর? মানে, আপনার এই মার্কসবাদে?'

প্রবাল এই মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করেছিল। দীনবন্ধু শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে সমর্থনের হাসি ছড়িয়ে পড়ল প্রবালের চোখেমুখে। তাঁর গ্লাসে সোডা আর অরেঞ্জ ঢেলে দিতে দিতে সে বিলোচনের দিকে তাকায়। অর্থাৎ, সে এ-বিষয়ে শেষ কথা জানতে চাইছে। এ-আড্ডার কলস্বরে শেষ কথা বলে থাকেন বিলোচন। মায় দীনবন্ধুও তাতে সর্বক্ষেত্রে সায় দেন। কেননা, বলার আগে তাঁর মুখ থেকে একটি নিক্তি নির্গত হতে দেখা যায়, বিলোচনের। অদৃশ্য হলেও, সবাই তা দেখতে পায়। তাই, তারপর আর কেউ কিছু বলে না। এখানে এটাই ট্র্যাডিশন।

কিন্তু বিলোচন আজ সে ধার দিয়েও গেলেন না।

'থাক-থাক।' বুকের বাঁদিকে হাত রেখে বিলোচন বললেন, 'নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা বলা যাক। তারপর...পর্বত?' প্রবালের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে জানতে চাইলেন, 'মুষিক-প্রসব কবে নাগাদ করছ?' সবাই হা-হা করে হেসে উঠল। সবার শেষে হাসি থামল দীনবন্ধুর।

আসলে কথাটা একটা খোঁচা। সে প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা। যখন সে পার্টি করত। বিলোচনের লেখালেখিকে সে মনে করত প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁর 'এপিক' উপন্যাস 'কানু কহে রাই' কী-একটা ছোটখাট পুরস্কার পেলে, সে তাদের সেলাইহীন 'তৃতীয় চিন্তা' পত্রিকায় বইটি সম্পর্কে লিখেছিল, 'মূষিকের পর্বত প্রসব।' বোঝা গেল, ছোট কাগজে তার এই নিভৃত মন্তব্যটিও বিলোচনের নজর এড়ায়নি। এবং আজ কুড়ি বছর ধরে তা মনে রেখেছেন। পেশাদাররা এরকমই হয়। হাল ছাড়বার সময় তবু এখনও আসেনি। প্রবাল মনে জোর আনে। একদিন নরম হবেন বিলোচন। বুঝবেন যে তার পার্টি-লাইনে বদল হয়েছে। সে বিলোচনের বাড়িতে যায়। সেখানে স্ত্রী মণিকা তাকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। লেখা ছেড়ে বিলোচন উঠে আসেন মাঝে মাঝে। যোগ দেন তাদের আলাপচারীতে। কখনও মদের বোতল নামে।

সেদিন অন্তত দুটো পর্যন্ত আড্ডা চলার কথা। দ্বিতীয় রাউণ্ড শেষ হবার আগেই বিলোচন উঠে পড়লেন। তখন বেলা বারোটা হবে। সবাই বলল, 'বসুন-বসুন।'

দীনবন্ধু বললেন, 'বসুন মহায়।'

কিন্তু বিলোচন বললেন, 'না। আজ সাড়ে বারোটা থেকে বাড়িতে থাকতে হবে। একটা ইমপর্ট্যান্ট ট্রাঙ্ককল আসবে।'

দীনবন্ধু আর আটকালেন না। এ শুধু তিনি বুঝলেন, ট্রাঙ্ককলটি দিল্লি থেকে আসতে

পারে। বিলোচন এবার আকাদেমি পাচ্ছেন।

এ-পর্যন্ত সমস্ত বিল সই করে বিলোচন উঠলেন। পরে মনে পড়েছে প্রবালের। পকেটে পেন গোঁজার পরে, হাতটা যেন বুকের কাছে কিছু বেশি সময় ধরে ছিলেন। কিন্তু মুখ দেখে তা বোঝার উপায় ছিল না তখনও।

দারোয়ান নটবর দৌড়ে এল মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই। সবাই ছুটে গেল।

স্টিয়ারিংয়ের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছেন বিলোচন। চাবি ঘুরিয়েছিলেন। তাই ইঞ্জিন চালু রয়েছে। স্টিয়ারিংয়ে রাখা উপুড় মাথাটা শেষ প্রণামের ভঙ্গিতে থর্থর করে কেঁপে চলেছে। আড্ডায় সেদিন আগাগোড়া উপস্থিত ছিল তরুণ ডাক্তার বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি। সে যে এসেছিল, তা বোঝাই যায়নি। কারণ, সে একটাও কথা বলেনি। এই প্রথম সে কথা বলল। গোড়ালি, এমনকি গলাতেও স্পন্দন না পেয়ে সে বিলোচনকে 'মৃত' বলে ঘোষণা করল।

পরদিন ভোরবেলা শ্মশান পর্যন্ত প্রবাল সঙ্গে ছিল। নিঃসন্তান সাহিত্যিকের ছেলের কাজ, বলতে গেলে, তাকেই সব করতে হল।

যোধপুর পার্ক থেকে বিরাট শোভাযাত্রা।

চুল্লিতে ঢোকাবার আগে নববস্ত্র পরাতে হয়। ফুলটুল সরাতে দেখা গেল লম্বা স্ট্রাইপ দেওয়া তসরের পাঞ্জাবি থেকে বোতামগুলো খোলা হয়নি। টিভি ক্যামেরার প্রখর আলোয় বোতাম থেকে হীরকখণ্ডগুলি ঝকঝক করতে থাকে।

বোতামগুলো খুলে নিতে নিতে শ্মশান-পুরোহিত উচ্চৈস্বরে জানালেন, 'জীর্ণবাসের যা-কিছু সব আমার।'

স্ত্রী মণিকা কিছু বলছেন না দেখে জোর প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল প্রবাল। মণিকা তার হাত চেপে ধরে চাপাস্বরে বললেন, 'ফল্‌স'।

আজকাল, ১৯৯৫

সোনালি ডানার ঈগল

প্রথম ঈগল

গোপালপুরের লাইট হাউস ছাড়িয়ে, ওবেরয় পামবিচ হোটেল পিছনে ফেলে, সমুদ্রতীর ধরে অনেক, অনেকখানি এগিয়ে গেলে, 'ফ্যালকনস্‌ নেস্ট' নামে সেই দোতলা বাড়িটি এখনও টিকে থাকার কথা নয়। ১২ বছর আগে আমি যখন যাই তখনই জেরবার অবস্থা। বাড়ির মালিক ক্যাপ্টেন রিচার্ড জেমস স্মিথের বয়স তখনই ৮৮। লাংসে দুরারোগ্য ফাইব্রোসিস। তখনই তাঁর মেরেকেটে আর দু-সপ্তাহ বাঁচার কথা ছিল।

তবু, কোনও-না কোনওভাবে আজও বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আমি একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না। যদি বাড়ি না থাকে তার ভগ্নস্তূপ থাকবে। যদি ক্যাপ্টেন স্মিথ না থাকেন, আমার বিশ্বাস, সেই ভগ্নস্তূপের ওপর কখনও কখনও একটি ঈগল পাখিকে বসে থাকতে হবে। বিশেষত, রাতের অন্ধকারে। যখন তার কোটরাগত চক্ষুবিন্দু থেকে বেরিয়ে আসবে, মেশিনগানের গুলির মতো, ঈগলের মর্মভেদী দৃষ্টির অনর্গল নিক্ষেপ। ১২ বছর আগে যখন প্রথম এবং শেষবার গোপালপুর যাই, তখন ওঁর বয়স বলেছিলেন ৮৮। বর্ন এইট্টিন

নায়েন্টি ফাইভ। এখন ঠিক ১০০ হবে। অনেকেই তো থাকে ১০০ বছর। থাকে না?

বয়ঃসন্ধিকাল বলে কিছু একটা কথা আছে। সাধারণত যৌনতার উন্মেষ-সময় থেকেই এই বিভাজন করা হয়। আমার মনে হয়, জীবনে যখন যে-সময় থেকে ভ্রমণের ইচ্ছা জাগে, যখন থেকে মনে হতে থাকে এখানে কিছু নেই, আমার জন্যে যা আছে তা আছে দূরে কোথাও—এবং সেখানে যাবার ইচ্ছা মন জুড়ে জেগে ওঠে— বয়স-সন্ধিকালের সূচনা হিসাবে এর দাবিও কিছু কম না। যে-সব বালিকা, যুবতী ও নারীকে কামনা করা গিয়েছিল কিন্তু পাওয়া যায়নি, তার সঙ্গে যে-সব জায়গায় যাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু যাওয়া হয়নি—এই দুই-এর মধ্যে প্রায় হুবহু মিল আছে।

অন্তত, কামনার দিক থেকে। আমার তো ধারণা—ভ্রমণে মানুষের অপরিতৃপ্ত বহুগামিতাই চরিতার্থ হয়। যাই হোক, এহ বাহ্য। এবং, গোপালপুর ছিল এমন একটা জায়গা যেখানে আমার পৌঁছে যাবার কথা ছিল অনেক আগেই। আমার সবচেয়ে দেরি হয়েছিল গোপালপুর যেতে। ইতিমধ্যে পূর্বে পুরীর পর পুরী, পশ্চিমে কোভালম, দক্ষিণে, বিশেষত পরিত্যক্ত শোর টেম্পলের সামনে প্রস্তরীভূত ষণ্ডশ্রেণীর দিকে এগিয়ে আসা ঘননীল ঢেউ-এর পরে ঢেউ—পূর্ণিমায় মন্দিরের চাতাল অবধি উঠে আসে—ওখানেও, এমনকি, দু-দু'বার যাওয়া হয়েছে। শুধু গোপালপুরই হয়ে ওঠেনি।

যতদূর মনে পড়ে, গোপালপুর যাবার ইচ্ছা প্রথম মনে জাগে অসীম রায় নামে তখন এক অপরিচিত গ্রন্থকারের 'দ্বিতীয় জন্ম' নামে একটি ছোট উপন্যাস ফুটপাত থেকে কিনে পড়ার পর থেকে। সেখানে নায়ক একা গোপলপুর যায় এবং সমুদ্রে তলিয়ে যেতে যেতে সাক্ষাৎ পায় এক ব্রোঞ্জ দেবমূর্তির। যদি সেখান থেকে ধরি, তাহলেও, গোপালপুর যেতে অন্তত ৩০ বছর দেরি হয়েছে বলতে হবে। কারণ ৫৭-৫৮ সালের আগে বইটি প্রকাশিত হয়নি।

কাজেই, যেতে-পারি এবং যেতে হবে এমন জায়গাগুলির মধ্যে মনে-মনে গোপালপুর লালন পেয়েছে সবচেয়ে বেশি সময় জুড়ে। গোপালপুর সম্পর্কে যেখানে যা শুনেছি মনে রেখেছি। সংগ্রহ করেছি ট্যুরিস্ট ম্যাপ, হোটেল ও তার বিবরণ, অজস্র ছবি—প্রিন্টেড এবং ফোটোগ্রাফ, এ-সব তো বটেই—মায় আমার ভাইঝি কমবেশি নামকরা গাইনি ডাঃ হিমানী গাঙ্গুলি সেবার যখন ভুবনেশ্বরের সেমিনার থেকে গোপালপুর যাবে বলল, আমি তাকে বলি, 'এক মুঠো বালি আনিস তো!' ফিরে এল আমার জন্যে স্টাফড এক সমুদ্র-ঈগল নিয়ে। মিনিয়েচার। বলল, 'উড়িষ্যার হেল্‌থ সেক্রেটারি উমাকান্ত মিশ্রর সঙ্গে আলাপ হল এবার। যাও না, ঘুরে এসো না এবারেই। উনি সব বুকটুক করে দেবেন।'

আমার ধারণা ছিল সমুদ্রতীর আছে পৃথিবীর এমন যে-কোনও জায়গা আকর্ষণীয় হতে বাধ্য। কারণ, যেখানেই থাক, পৃথিবীর তিনভাগ জল সে ছুঁয়ে আছে। আর নামটাও কী সুন্দর। গোপালপুর-অন-সি! কতই তো শহর আছে পৃথিবীতে—যারা সমুদ্রের ধারে—পশ্চিমে আলজিরিয়ার ওরান থেকে সুদূর পূর্ব আমেরিকার নানটুকেট পর্যন্ত—কেউ তো সমুদ্র পদবিধারী নয়! তাও 'ধারে' নয়, তাহলে তো গোপালপুর-বায়-সি হত। কী? না, সমুদ্রে-ওপর-গোপালপুর! কিন্তু, দুঃখের বিষয়, আমার এতকাল ধরে লালিত গোপালপুর-ধারণা প্রথম দর্শনেই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আমি গিয়েই পড়লাম এমন বিপদে—যা ছিল কল্পনাতীত।

ফ্যালকনস্‌ নেস্ট

উমাকান্ত মিশ্রর সঙ্গে টেলিফোন-কথা অনুযায়ী সার্কিট হাউসে লাঞ্চ খাবার কথা

(অঁচ্ছা অঁচ্ছা, মগুর মৎস্যের কারি—সে আমি কহি দিব)—কিন্তু সকালের ট্রেন পৌঁছল দুপুরে। বেহরামপুর থেকে অটো নিয়ে গোপালপুর পৌঁছতে লাগল আরও এক ঘন্টা। গিয়ে দেখা গেল—ভুবনেশ্বর থেকে স্বয়ং স্পিকার এসে গেছেন—সঙ্গে তাঁর অ্যাসেম্বলিও—গোটা সার্কিট হাউসটির নিশ্চিদ্রভাবে দখল নিয়েছেন তিনি এবং তাঁর দলবল। অবশ্য, স্বাস্থ্যসচিত প্রেরিত একটি সৌজন্য-বার্তা আমার জন্যে পড়ে আছে : উনি দুঃখিত। তবে কেয়ারটেকার আমাকে অন্যত্র বিকল্প ব্যবস্থা করে দেবে।

আমার লাঞ্চ তৈরি আছে কেয়ারটেকার কালীচরণ পানিগ্রাহী আমাকে বললেন। প্রত্যাখ্যান করে আমি সার্কিট হাউস থেকে বেরিয়ে এলাম।

রাস্তা একটাই। সার্কিট হাউস থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। পা রেখেই বোঝা যায়, এই রাস্তা সমুদ্রতীরে নিয়ে যাবে। দু-পাশে ঝাঁট-দেওয়া বালি। ঢেউ পড়ার ঝপাঝপ শব্দ শোনা যাচ্ছে। বোঝা যায়, কাছেই, হয়ত ওই বাড়িগুলোর পরেই।

সমুদ্রতীরে জগদীশ-কাফেতে বসে কেকের অর্ডার দিতে যাচ্ছি—দেখলাম, তেলেভাজা চড়েছে। আপাতত এক কাপ কফির কথা বলে আমি সেজন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঠিক করলাম আমি এখনই ফিরে যাব। ট্রেন না পাই, বাসে ভুবনেশ্বর চলে যাব রাতারাতি। ওখান থেকে কলকাতা। কিন্তু, তার আগে, ভুবনেশ্বর গিয়ে কিছু ভাল-মন্দ শুনিয়ে যাব উমাকান্তকে। টেলিফোনে কলকাতা থেকে ডেকে এনে, সার্কিট হাউস-ভর্তি এম-এল-এ—সঙ্গে স্পিকার? চালাকি!

কিন্তু এও ঠিক যে, আমি অভুক্ত এবং অস্নাত, বুকিং-করা থাকার জায়গা অপ্রত্যাশিতভাবে হাতছাড়া—এ সবের সঙ্গে প্রথম দর্শনেই গোপালপুর অত খারাপ লাগার কোনও সম্পর্ক নেই। আমাদের দেশ-গাঁয়ে চৌধুরিদের জোড়াদীঘিতে স্নান করে—পোস্ত-ভাতে আর অড়র-ডাল দিয়ে ভাত খেয়ে এক ঘুম দিয়ে এলেও আমি একই কথা বলতাম।

আমি এই প্রথম একটা সমুদ্র দেখলাম, যা তটভূমি থেকে অনেকখানি নিচে। লোকজন যা, ওপরে পিচঢালা রাস্তায়, বিচ অত্যন্ত অপ্রশস্ত, তাই জল-সীমানায় প্রায় কেউ নেই বললেই চলে। এটা কি একটা অস্বাভাবিক দৃশ্য নয়? ডাঙার মানুষের একটা জল-টান থাকবেই। আপনি যে-দিক দিয়েই যান, সব ডাঙাই তো শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে কোনও-না-কোনও সমুদ্রের কাছে। যে কোনও মরুভূমি পেরলেও, শেষ পর্যন্ত সেই তো সমুদ্র! আর সেখানে পৌঁছে মানুষ জলের কাছে ছুটে যাবেই। বারবার এগিয়ে যাবে জল ছুঁতে, আর ছুটে পালিয়ে আসবে। আমি যত সমুদ্রতীরের ছবি দেখেছি, দেখেছি হাজার হাজার অভিভূত মানুষ তীরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছে। কন্যাকুমারিকার তীরে কোজাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় একই সঙ্গে চন্দ্রোদয় ও সূর্যাস্ত দেখতে লক্ষ মানুষ তীরে দাঁড়িয়ে থাকে। রুপোর ঘন্টার মতো চাঁদ ওঠে। আর এখানে? উঁচু প্লাটফর্মে পায়চারি করছে মেরে-কেটে মাত্র অর্ধশত নরনারী—বলি, এটা কি পার্ক, এই কি পায়চারি করার জায়গা! ছিঃ!

দূরে-কাছে ভাঙা জেটি দু-একটা, বোল্ডার ইত্যাদি—একটিও সমুদ্র-চিল কি থাকতে নেই? আর সবচেয়ে যা অস্বস্তিকর, সেদিন একটুও হাওয়া ছিল না। এখান থেকেই নাকি এককালে জাভা, সুমাত্রা আর বালিতে পালতোলা জাহাজ যেত। যেত হয়ত। একদিন হয়ত গোপালপুর ছিল একটা বিখ্যাত বন্দর। আসত বিদেশ থেকে জাহাজও। কিন্তু আজ? আজ, বন্দরের রূপহীন বর্ণহীন স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে বলিরেখাময় কুৎসিত এক বৃদ্ধা গণিকা।

জগদীশবাবু নিজের হাতে এক প্লেট তেলেভাজা দিয়ে গেলেন। অবাক কাণ্ড! আমি খেতে শুরু করে প্রথমটির ভেতর পেলাম একটি লঙ্কা। ভাবলাম, এই রে! আমার আবার

লঙ্কা একদম চলে না। কিন্তু পরেরটি মুখে দিয়েই দেখি, পনির! আরও এগিয়ে কোনওটায় ফুলকপির টুকরো, কোনওটায় ক্যাপসিকাম ইত্যাদি পেতে থাকি। ভারি মজার খাবার তো। আমি আর-এক প্লেট অর্ডার দিই।

জগদীশবাবুই আমাকে লাইট হাউস ছাড়িয়ে, ওবেরয় পামবিচ হোটেল পেরিয়ে, ক্যাপ্টেন স্মিথের ফ্যালকনস্ নেস্ট-এর খবর দেন। এখন কোনও ট্রেন নেই, উনি আমাকে বললেন। বাস আছে, তবে চিল্কা হয়ে ভুবনেশ্বরে রাত ১২টার আগে তা পৌঁছবে না। ক্যাপ্টেন স্মিথের জায়গাটা অনেক দূর। ওখানে খুব কম লোক যায়। রিকশ থেকে নেমে বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হয় প্রায় আধ ঘন্টার মতো। আমি যেন, এক রাতের জন্যে ওখানেই চেষ্টা করি। পূজোর সময়—উনি যতদূর জানেন এখানকার ছোটখাট মুষ্টিমেয় হোটেলগুলির একটিতেও জায়গা নেই। যদিও দু-একটি থেকে থাকে, তিরুপতি এক্সপ্রেস এসে সেগুলিও নিশ্চিত ভরিয়ে দিয়েছে—জগদীশবাবু আমাকে বললেন।

'হূ ইজ দেয়ার?'

দ্য ফ্যালকনস্ নেস্ট-এ পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গেল। ইটের রাস্তা ওবেরয় হোটেল পেরলেই শেষ। রিকশ আর গেল না। যতদূর দেখা যাচ্ছিল ওখান থেকে—এরপর আর কোনও বাড়ি-টাড়ি নেই বা বসতি। শুধু ঝাউবন, বালি, আর সমুদ্র। তবে, স্বস্তির ব্যাপার এই যে, এখান থেকে সমুদ্র আর জমি অনুভূমিক। মিউনিসিপ্যাল এলাকা শেষ এখানেই—শেষ রাস্তার টিমটিমে আলোর। আমরা টর্চ জ্বেলে এগিয়ে চললাম। আমি আর রিকশওয়ালা। পৌঁছে দেবার ভাড়া সে দ্বিগুণ চেয়ে রেখেছে। একটা লম্বা ঝাউবন পেরিয়ে ফ্যালকনস্ নেস্ট এক মাঝারি দোতলা বাড়ি। দোতলায় গভীর বারান্দা। বারান্দার দু'দিকে, বাইরে থেকে দেখে যা বুঝলাম, দুটো বেশ বড় বড় ঘর। ওখানে জাজ ধরনের কিছু বাজছিল এবং সঙ্গে নাচও হচ্ছে—বোঝা যায় দোতলার মেঝে কাঠের। গেটের মাথায় একটি ৪০ পাওয়ারের বাল্ব।

পরিচারিকা দুজন। দুজনেই বর্ষীয়সী। দুজনেই পৃথুলা। কৃষ্ণাঙ্গী এবং দক্ষিণ ভারতীয়। হিন্দিতে একজন আমাকে জানাল, ভাড়া শুধু দোতলাটা দেওয়া হয়। এবং মাদ্রাজ থেকে আসা রেল-অফিসের এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পার্টি ৭ দিন হল তার দখল নিয়েছে। সবচেয়ে যা হতাশার, বাড়ির মালিক শুয়ে পড়েছেন আজকের মতো। তাঁর শরীরও খারাপ।

আজ আর দেখা হবে না।

বাঁদিকের ঘর থেকে বৃদ্ধের ভাঙা, কাঁপা-কাঁপা গলা, সঙ্গে কাশি, 'ভিনা, ভিনা, হু ইজ দেয়ার?'

'ট্যুরিস্ট হ্যায় সাব। রাতকো সাহারা মাংতা।'

'ভেজ দেও। অন্দর ভেজ দেও।'

রিকশওয়ালাকে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে গিয়ে দেখলাম সাহেব উঠে বসবার চেষ্টা করছেন। পরে বুঝতে পেরেছি, তখুনি টের পেয়েছিলাম, কিন্তু মনস্থ করতে পারিনি যে, উঠে বসার তুলনায় সেটা ছিল একটা উড়াল দেওয়ার চেষ্টা। রোগা, অস্থি ও চর্মসার চেহারা ক্যাপ্টেন স্মিথের। বালিশের নিচে থেকে বের করে কটাকট দাঁত পরে নিলেন দু'পাটি। তাতে গালের গর্ত অনেকটা অন্তর্হিত হল ঠিকই। কিন্তু, আরও হিংস্র দেখাতে

লাগল তাঁকে। আরও বলতে, চোখদুটির তুলনায়। গভীর কোটরের মধ্যে নির্মম, ক্ষমাহীন চোখদুটির তুলনায়। খয়েরি রঙের মনুষ্য-চক্ষু আমি আগে দেখিনি। অহো, ছানি-পড়া আঁশফলের মতো মণিদুটির চাহনি কী তীক্ষ্ণ। আর, ওহো, অসহ্য। বৃত্তাকার শক্ত হাড় ঠেলে সামনের দিকে অনেকখানি বেরিয়ে। দৃষ্টি একদম সরাসরি। সত্যি বলছি, ঐ কোটর দুটি থেকে তাঁর দৃষ্টি বেরিয়ে আসছিল মেশিনগানের গুলির মতো।

'সো ইট ইজ ইউ?'

চেনেন নাকি ভদ্রলোক আমাকে? কিন্তু আমি তো....ক্যাপ্টেন স্মিথ বললেন, 'ওয়েল, ইউ ক্যান স্টে।'

'ভিনা, জেনেসকো কামরা খোল দেও।'

'সার?' ভিনা স্তম্ভিত।

তাকে উত্তর না দিয়ে সাহেব এবার ইশারায় ঘরটি খুলে দিতে বললেন। আমাকে বললেন, 'দ্যাটস মাই ডটারস রুম। বাট শি লিভস্ অ্যাব্রড। ইউ ক্যান স্টে দেয়ার ফর ওয়ান নাইট। কাল উয়োলোগ', দোতলার নাচ ও বাজনার দিকে আঙুল তুলে, 'চল যায়ে গা। দেন অন, ইউ ক্যান স্টে হিয়ার আজ লঙ অ্যাজ ইউ উইশ টু স্টে।'

দোতলায় ৮/৯ জনের পার্টি। তাদের থেকে একজনের খাবার স্বচ্ছন্দে বেঁচে যাবে। জানা গেল, আমি রাতের খাবার পাব। আজ, মাগুর মাছের ঝোলই হয়েছে এখানে। আশ্চর্য যোগাযোগ। আমি অনুপস্থিত জেনিসের ঘরে ঢোকার সময় সে রাতের মতো লোডশেডিং হয়ে গেল।

ঈগলের স্বপ্ন

সমুদ্রে এখন হাওয়া নাই। থাকলে ঘরে ঢোকেনি। অত্যন্ত আরামদায়ক বিছানার জন্যে, ভারি নরম বালিশ আর তা থেকে নতুন কোরা কাপড়ের গন্ধের জন্য, শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত পথিকের একটা আশ্রয় মিলে গেলে যা হয়—আমার বেশ গভীর ঘুম হল। যদিও পাখা চলছে না। আমি তখনই টের পেয়েছিলাম, এ-ঘরের বিছানা-বালিশ সবই পাখির পালকের। একটা পাখি পাখি গন্ধ ছিলই সারা ঘরে।

বোধহয়তো সেই কারণেই সে রাতে আমি এক প্রকাণ্ড ঈগল পাখির স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম, সমুদ্রের ধারে এক গিরি-কন্দরে সে চুপ করে বসে আছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে এত বরফ, নিশ্চয় বিদেশ! তার ডানার পালক তিরতির করে কাঁপছে। স্বপ্নের আসল মজা হল, কাল ও স্থান-বিপর্যয়ের জন্য। সেজন্য ভবিষ্যত অনায়াসে বসে থাকে আর অতীতও কত অবলীলভাবে ঢুকে যায় ভবিষ্যতে। আমরা যাকে বর্তমান বলি, তার অস্তিত্ব স্বপ্নে নেই বললেই চলে।

যে জন্যে, যা যা ঘটবে তা আগেই বুঝেছিলাম এবং ঠিক সেইরকমই ঘটতে লাগল। পাখিটা হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর হঠাৎ সে ডানাদুটি মুড়ে, প্লেন থেকে পড়া বোমার মতো নিচে পড়ে যেতে লাগল। এভাবে তো—হ্যাঁ, কে যেন বলেই গেল আমাকে, ঈগল এভাবেই ঝাঁপায় শিকারের দিকে। এবং এই ব্রোঞ্জরঙা বিশাল পাখিটি একটি ঈগল। এখন তার আগে ছুটে চলেছে কঁক-কঁক শব্দে এক ভয়ার্ত, চিত্রবিচিত্র চিনে হাঁস—ঈগল তার বিশাল ডানা দিয়ে পাখিটাকে জাপ্টে ধরল।.... আমার ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে সমুদ্রের গর্জন। ঢেউ এর পর ঢেউ-এ আছড়ে পড়ে ডাঙাকে জানাচ্ছে পৃথিবীর তিনভাগ জলের

অস্তিত্ব-শব্দ।

আচ্ছা, এবারে বলুন, আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ব কিনা, যদি ঘুম থেকে উঠে আমার প্রথমেই চোখে পড়ে জেনিসের ওয়ার্ডরোবের ওপর একটি প্রকাণ্ড সোনালি ঈগল—অবিকল সেই ব্রোঞ্জবর্ণ, এবং, এমনকি তাঁর ঠোঁটের কাছে এবং পায়ের পাতার লোমগুলিও সাদা রঙের—যেমনটা স্বপ্নে ছিল। নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছি এখনও ভেবে স্বস্তি পেতে যাব—দেখলাম, ভিনা নাদার আমার বিছানার মশারি তুলছে। ব্রেকফাস্ট দেওয়া হবে সাহেবের ঘরে। আমি যেন গোসল করে ওখানে যাই। সে বলল।

আমার বিস্ফারিত চোখ ঈগলের দিকে চেয়ে আছে দেখে ভিনা বলল, 'মরা হুয়া হ্যায়।'

অর্থাৎ স্টাফড্। এবং সত্যিই তাই। দেখে চিনলাম আমি পাখিটাকে। ওরনিথোলজিস্ট না হয়েও, পাখির বই আমি খুব পড়ি, এই পক্ষী প্রজাতিটিকে আমি বিলক্ষণ চিনি। কেন্ট গার্ডনারের একটি বই-ই আছে এই গোল্ডেন ঈগল নিয়ে। আমেরিকায় এক সময় কমতে কমতে ৩৩টিতে দাঁড়ায়। তখন ন্যাশনাল বার্ড হিসাবে ঘোষণা করা হয়। যদিও এদের দেশের বাড়ি হল নরওয়ের ডেনমার্ক অঞ্চলে। বিশাল পাখি—এদের পা দুটির হয় ১০ইঞ্চি উঁচু। থাই-এর কাছে পায়ের ব্যাস ৩ ইঞ্চি। এই সমর্থ বলশালী পা থেকে ৩ ইঞ্চি (সোজা করলে ৬) নোখ বের করে এরা দুশো-তিনশো ফুট থেকে বোমার মতো নেমে আসে ঘন্টায় আড়াই শো মাইল বেগে—মাটি থেকে ছাগলছানা, কুকুর এ-সব তো বটেই এমনকি বাছুরও তুলে নিয়ে যায়। পা থেকে পিঠ পর্যন্ত অন্তত ২ ফুট উঁচু, লম্বায় দেড়হাত, এরা যখন বুক ফুলিয়ে ডানা ছড়ায়, শুধু তখনই বোঝা যায় এদের ক্ষমতা।

ওয়ার্ডরোবের ওপর এই সেই নরওয়ের গোল্ডেন ঈগল। মৃত। মৃত? তাহলে ওর পায়ে এই চামড়ার বেল্ট বাঁধা কেন? হয়ত বাস্তবতা আনার জন্যেই—ঐ রকম ভেবে আমি মৃত ঈগলের আরও কাছে গেলাম। দেখলাম ওর কোটরাগত চোখদুটি। সেই দৃষ্টি—যা শুধু সামনের দিকে এগিয়ে আসে—মেশিনগানের গুলির ছর্‌রার মতো অনর্গল—যা জীবন্ত ঈগলের। একটু পরেই আবার মরে গেল তার চোখদুটি। নিশ্চয়ই মনের ভুল। আমি বাথরুমে ঢুকে গেলাম। গরমকালে আমি বাথরুম থেকে বেরই একদম বাইরে বেরবার জন্যেই তৈরি হয়ে। শেভিং তো বটেই, স্নানও সারা হয়ে যায়।

ক্যাপ্টেন স্মিথের দাবি-দাওয়া

ক্যাপ্টেন স্মিথের ঘরে ঢোকার আগে বারান্দায় দাঁড়াই। দেখলাম, বাইরে ঝকঝকে রোদ। সমুদ্রের ঢেউ এখানে বলতে গেলে একটা। রঙও একটাই। নীল। তারই বিভিন্ন পর্যায়, কোথাও-বা সবুজাভ। বাতাস এত হাল্কা যে নাভিমূল পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। দিনের বেলায় যদিও বাড়িটা দেখে মনে হল, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে এর আর খুব দেরি নেই। দূরে সমুদ্রে তিনটি নৌকো। দুটির পাল সাদা। মাঝেরটি সবুজ। ধীরে পর পর দুটি সবুজ একটি সাদা হাইফেন স্থান বদল করে। আমি ঠিক করলাম, এখানে কয়েকদিন থেকেই যাব।

পাশের ঘরে গিয়ে দেখি সায়েব তিন-চারটি বালিশ পিঠের কাছে ঠেসে, আধশোয়া অবস্থায়। আর একজন লোক ওঁর সামনে বসে এক নীল রঙের প্ল্যান বিছিয়ে ওঁকে কী সব বোঝাচ্ছে।

'না-না। ওখানে নয়।' ক্যাপ্টেন স্মিথ লোকটিকে বলছেন, 'আমি কি রোদে পুড়ব, আর বর্ষায় ভিজব এই বুড়ো বয়সে?'

আমি ভেবেছিলাম স্মিথসাহেব বুঝি কোনও জমি-জমা কিনছেন। ওদের কথা শুনে বুঝি, জমি ঠিকই। কিন্তু কবরের জমি। তাঁর তো কেউ নেই। দুটি বাচ্চা নিয়ে একমাত্র সন্তান জেনিস থাকে উত্তর নরওয়ের সমুদ্র উপকূলে। জায়গাটার নাম বোডো, উনি আমাকে কালই বলেছিলেন, তার সম্পর্কে শেষ সংবাদ ওখান থেকে আসে। কেউ নেই, তাই নিজের কবরের জায়গা নিজেই ঠিক করছেন ক্যাপ্টেন রিচার্ড জেমস স্মিথ (৮৮)।

'না-না, ওপরে, আমি আরও ওপরে চাই। আর একটা বড় গাছ থাকবে আমার মাথার ওপর।'

'কিন্তু স্যার, ওখানে যা জমির দাম আর আপনি যা বাজেট বলছেন—'

'না-না। আমার ঐ টাকা। ওতেই দিতে হবে। নইলে আপনি আসুন। আই শ্যাল বি এনটুম্বড ইন বেহরামপুর।'

এককালে প্রচুর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান থাকত এই গোপালপুর আরর বেহরামপুর। এখানে অনেক চার্চ, কবরখানারও অভাব নেই। এখন অভাব খ্রিস্টান মৃতদেহের।

'মিঃ স্মিথ, এ কী বলছেন আপনি? বেহরামপুরের ঐ পচা সিমেটারি আর নরসিংপুরে টিলার ওপর আর সমুদ্রের ধারে আমাদের লেডি অফ দ্য ফ্লাওয়ার সিমেটারি—আপনি তুলনা করছেন কীভাবে?'

ক্যাপ্টেন স্মিথ এবার নরম হলেন। 'ওক্কে-ওক্কে। ফিক্স অ্যাট টেন থাউজেণ্ড দেন। তবে আমার মাথার ওপর একটা ছাদ যেন থাকে। আমি রোদে পুড়তে পারব না। আর টিলার একেবারে ওপরের দিকে দিতে হবে।'

আমি এতক্ষণ চুপ করে ছিলাম। জানতে চাইলাম, 'ওপর দিকে কেন মিঃ স্মিথ?'

'দা ভিউ। দা ভিউ উইল বি বেটার।'

১২০০০-তে ঠিক হল। একটি সিন্দুক খুলে ২ হাজার টাকা অগ্রিম দিলেন স্মিথ সাহেব। ফর্মের বিভিন্ন জায়গায় সই করলেন। প্ল্যানে, একটি পিপুল গাছের নিচে, একটি জায়গা চিহ্নিত হল।

দোতলার অতিথিরা ভোরের প্রথম বাসে বেহরামপুর চলে গেছে। বাড়িতে অতিথি বলতে শুধু আমি। আমি দোতলার সবটা ভাড়া দিতে চাইলাম।

স্মিথ বললেন, 'না-না, তুমি জেনিসের ঘরেই থেকে যাও।'

'লোকটা পাগল'

গোপালপুরে সমুদ্র ছাড়া কিছু নেই। দেখতে হয় সমুদ্র দেখ—নইলে ঘরে বসে থাক। একটু পরে জগদীশবাবুকে ধন্যবাদ দিতে ওঁর কাছেতে গেলাম। ক্যাপ্টেন স্মিথ আমাকে মেয়ের ঘরে থাকতে দিয়েছেন শুনে অবাক হলেন।

'মেয়ে? কে ওর মেয়ে?' জগদীশবাবু বললেন।

'আজ সকালেই যে বললেন আমাকে! নরওয়ের বোডো শহরে ঠাকুর্দার সঙ্গে থাকে?'

'ধুর! ঐ বুড়োটা পাগল!'

'ওঁর স্ত্রী ওঁকে ত্যাগ করে এক নাবিকের সঙ্গে আমেরিকা—'

'বললাম তো আপনাকে' জগদীশবাবু বললেন, 'আপনি কি থাকছেন ক'দিন? তাহলে

হলিডে-হোমে চলে আসুন। দোতলায় ছাদের ধারে ওদের রেস্ট রুমটা আজ দুপুরে খালি হবে এবং অ্যাডভান্স বুকিং নেই। এদের খাওয়া-দাওয়াও ভাল।'

আমি বেশ খানিকটা হাঁটাহাঁটি করে দেখলাম। সেই গোপাল মন্দির পর্যন্ত। এই হোটেল পাড়ার দিকটা সত্যিই বাজে। ঠিক করলাম, যে ক'দিন থাকব, এদিকে আর আসব না।

সমুদ্রের জলরাশি ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমি ফ্যালকনস্ নেস্টের দিকে ফিরে এলাম। ফিরে দেখি, স্মিথ ঘুমিয়ে পড়েছেন। ভিনা নাদার দুপুরে খেতে ডাকলে ডাইনিং টেবিলে গেলাম। এই খাবার-দাবারের ব্যাপারটা ভিনার ব্যবসা। দামও সেই ১৯৮৩-র পক্ষে যথেষ্ট বেশি। ৩০ টাকা প্লেট। তবে ভাত ঝরঝরে চামরমণির। এবং চিংড়ির গন্ধও পেলাম।

খেতে খেতে ভিনার সঙ্গে দু-একটা কথা হল। হ্যাঁ জেনিসই ওঁর মেয়ের নাম। নাম জেনিস ইলিন সুশান হুড। সাহেব তাই বলেন। থাকে বিলেতে। ঠাকুর্দার কাছে। সাহেব তাই বলেন। কিন্তু সে কখনও আসেনি। কেউ তাকে দেখেনি। সে তো কখনও একটা চিঠিও দেয় না। দুঃখ করে ভিনা নাদার জানায়, থাইরয়েডের প্রবল অসুখ নিয়ে সাহেব গোপালপুরে আসেন। সে অনেক, অনেক কাল আগের কথা। একটা ঘন্টাও ঘুম হত না তখন সাহেবের। কিন্তু এখানে এসে একদম সুস্থ হয়ে যান। তারপর মিসেস জার্ডিন এক রকম জোর করে জলের দামে এই বাড়িটা ওঁকে বিক্রি করে দিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় ছেলে বৌ-এর কাছে চলে যান।

আমি হঠাৎ জানতে চাইলাম, 'আর ঐ ঈগলটা?' আমি জেনিসের ঘরের দিকে তাকাই।

'ওটাই তো একমাত্র জিনিস যা হাতের ওপর বসিয়ে সাহেব এখানে আসেন। তখন নাকি জ্যান্ত ছিল। তাই পায়ে বাঁধা ছিল স্ট্র্যাপ। মৃত্যুর পরেও সে-ভাবেই থেকে গেছে।'

'কিন্তু এখনও বাঁধা কেন? আর তো পালাতে পারবে না?'

'সাহেবের ধারণা', ভিনা ফিসফিস করে বলল, 'ও এখনও বেঁচে।'

এই সময় 'ভিনা' 'ভিনা' বলে ক্ষীণস্বরে ক্যাপ্টেন স্মিথ ডাকতে লাগলেন। 'যাই', ভিনা বলল, 'আপনার যা লাগবে নিয়ে নেবেন। সব টেবিলের ওপর আছে। এখন বুড়োকে স্নান করাতে হবে।'

পাপের বেতন মৃত্যু

কোথা থেকে কী, সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ খুব ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেল। আমি তখন সমুদ্রের কিনারা ধরে অনেক দূরে। একদম ভিজে চুপসে গেলাম।

ফ্যালকনস্ নেস্টে ফিরে দেখি, পাশে চেয়ারে বসে একটি স্কার্ট পরা দেশি খ্রিস্টান মেয়ে। পরে জেনেছি, তার নাম নোরো এস নাইয়ার। তাকে কিশোরীই বলা চলে। এক পলক দেখে তাকে এক অনাঘ্রাতা কুসুমের মতো লাগে। আরও শুনলাম, সে গোপালপুরের গডস চার্চের পাদরির ছোট মেয়ে।

এখন ক্যাপ্টেন স্মিথের ঘরটির একটু বর্ণনা দেওয়া দরকার যা যথাস্থানে দিতে ভুলে গেছি। স্মিথের ঘরটি, যদি এক কথায় বলতে হয়, ধুলি-ধুসর। উনি হাসপাতালের সিঙ্গল বেডে শুয়ে থাকেন। পাশেই একটা মাত্র বই-এর র‍্যাকে একটি বই, ডেয়লি বাইবেল রিডিং। মস্ত মোটা বইটা আমাদের রামায়ণ-মহাভারত সাইজের—এ ঘরে ঐ একটাই জিনিস যা চকচকে। নিত্য ব্যবহার হয় বোঝা যায়। এতে বছরের ৩৬৫ দিনের

জন্যে—৩৬৫ টি বাইবেল কাহিনী বা তার প্রসঙ্গ আছে। বই-র‍্যাকের ওপর একটা টেলিফোন। গত দুদিনে যদিও একবারও বাজেনি। মৃত না জীবিত, কে জানে। টেলিফোনের ওপর অনেক দিনের ধুলো।

'বাইবেল, বাইবেল!' ক্যাপ্টেন স্মিথ আমাকে বলেছিলেন, 'আই অ্যাম ইন্টারেস্টেড ইন বাইবেল ওনলি।'

কবরের জন্যে অগ্রিম নিয়ে স্যামিসন যখন চলে গেল, তারপর আমি জানতে চেয়েছিলাম, 'আচ্ছা ক্যাপ্টেন স্মিথ, আপনার এই কাঠের গরাদগুলো পাল্টে লোহার শিক বসিয়ে নেন না কেন?'

'হোয়াই?'

'না-না, মানে চোর ডাকাত—'

'টাকা ব্যাঙ্কে থাকে। লাগবে বলে, ওটা আনিয়ে রেখেছিলাম। তাছাড়া' ক্যাপ্টেন স্মিথ হাঃ হাঃ করে ভৌতিকভাবে হাসতে লাগলেন, 'এখানে চোর কোথায়? ঐ অতবড় চোর থাকতে?' বলে সমুদ্রের দিকে হাত তুললেন, 'লোহার গরাদ হলে তো সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় মরচে পড়তে পড়তে—এতদিনে—হাঃ হাঃ হাঃ। কাঠ বলেই আছে।' আবার সমুদ্র দেখিয়ে, 'কিস্‌সু করতে পারেনি।'

এবার নোরার কোলের ওপর 'ডেয়লি বাইবেল'-টা খোলা। বুঝলাম সে আসে মৃত্যুপথযাত্রীকে বাইবেল শোনাতে।

সন্ধ্যেবেলা। ভিনা আর পার্বতী এই সময় বাজার করতে যায়। আমি ওদের একটুও বিরক্ত না করে নিঃশব্দে বারান্দায় বসে থাকলাম। আজ থেকে আমার ওপরে শোবার কথা।

বারান্দায় মেয়েটির কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। অনুচ্চ, কিন্তু কী স্পষ্ট উচ্চারণ। কণ্ঠস্বরটিও সুরেলা। আর এত ধীরে থেমে থেমে পড়ছে যে বারান্দা থেকেও সব শোনা যাচ্ছিল। সে তখন ডেভিড ও বাথসেবা উপাখ্যানটি পড়ছিল। ঝমঝমিয়ে হঠাৎ একচোট বৃষ্টির পর, এখন, শব্দ বলতে শুধু ঢেউ-পড়ার আদিমতম আওয়াজ। একমনে বাইবেলের গল্প শুনতে শুনতে সমুদ্র-ধোয়া গোপালপুর আর মরু-ঘেরা জেরুজালেমের ব্যবধান বেশ কমে গেছিল কখন, নিজেরই অজান্তে।

'গিভ মি দা কিস।'

পর্দার ওপার থেকে ক্যাপ্টেন স্মিথের সনির্বন্ধ কণ্ঠস্বর। আমি যে ভুল শুনিনি বোধহয় সেটাই জানাতে আবার বললেন এবং এবার গলা বেশ আদেশসূচক!

'কাম অন, অ্যান্ড ডু ইট কুইকলি!'

ছি-ছি-ছি। পবিত্র বাইবেল পাঠের মধ্যে একি ব্যাভিচারী আবেদন, এ কি ভয়ঙ্কর পাপ-প্রস্তাব। এবং ঐটুকু মেয়ে, ঐ অনাঘ্রাতা কুসুমের প্রতি!

এরপর যে দৃশ্য দেখলাম, তা দেখতে দেখতে শিউরানিতে আমি প্রায় অবশ হয়ে গেলাম। আমার বোধবুদ্ধি বলতে প্রায় আর কিছুই রইল না।

আমি দেখলাম : স্কার্টের ভেতর থেকে বের করে তার কচি কলা গাছের মতো মসৃণ ডান পা থেকে সে হাঁটু অব্দি টানা মোজাটা খুলে ফেলেছে। এবার সে তার পায়ের পাতাটি তুলে ক্যাপ্টেন স্মিথের মুখের কাছে নিয়ে যায়। আমি দেখলাম, এইসময় হঠাৎ হাওয়ায় পর্দাও সম্পূর্ণ উঠে গেল, নোরার পায়ের বুড়ো আঙুলটি সম্পূর্ণ ক্যাপ্টেন স্মিথের মুখের মধ্যে। ক্যাপ্টেন স্মিথের মুখ-নিঃসৃত লালায় তার পায়ের পাতা ভিজে যাচ্ছে।

হোলি বাইবেল গড়াগড়ি খাচ্ছে ধুলোয়।

পর্দা পড়ে গেল। আমিও ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলাম। কিন্তু, ঘরের ভেতর থেকে শিশুর স্তন্যপানের চকচক শব্দ ভেসে আসতেই থাকল।

আমি বুঝলাম সবই। অনুরোধে তো নয়, ক্যাপ্টেন স্মিথের কণ্ঠস্বরে ছিল আদেশের সুর। অর্থাৎ এ নিত্যদিনের ব্যাপার। আর সেইজন্যই এই টাইমিং। সন্ধ্যেবেলা। যখন ভিনা আর পার্বতী বাজারে যায়। 'গিফ মি দা কিস'—এই 'দা' আর্টিকেলটির প্রয়োগও সেই দিকেই ইঙ্গিত করে। নইলে তো, 'এ' থাকত।

ক্যাপ্টেন স্মিথের স্বীকারোক্তি

জামাকাপড় গুছিয়ে পরদিন ভোরেই ভিনাকে বললাম বিল দিতে।

'আপনি আজই চলে যাচ্ছেন স্যার?'

'হ্যাঁ', আমি ঘৃণার সঙ্গে বললাম, 'আজই।'

'চেক-আউট বারোটায়। আপনি ইচ্ছে করলে বারোটা পর্যন্ত থাকতে পারেন।'

'কিন্তু আমি সে ইচ্ছা করি না।' আমি বললাম, 'বিল আনো।'

এর বেশি কিছু বলার প্রবৃত্তি ছিল না। ভিনার প্রতিক্রিয়া দেখেই বুঝেছিলাম, আমি যা দেখেছি, তা ওরাও দেখেছে। ওদের এই কিছু দেখিনি কিছু শুনিনি ভাব একটা মুখোশ।

এই সময় পার্বতী এসে বলল, 'স্যার, স্যার আপকো বুলায়া।'

এরপর এ-কাহিনী আর বিলম্বিত না করে ক্যাপ্টেন স্মিথ আমাকে সেদিন যা বলেছিলেন তা প্রায় হুবহু উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট। শুধু এই যে, বলতে বলতে মাঝে মাঝে চুপ করে থাকছিলেন বহুক্ষণ। তখন বুকের ওঠা-পড়াও বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, বুঝি মরেই গেছেন। পাছে ভিনা বা পার্বতী শোনে এবং জানতে পারে, তাই আগাগোড়া ইংরেজিতে উনি আমাকে যা বলেছিলেন তাই এই—

'শোনো চ্যাটার্জি, আজ তোমাকে এমন একটা কথা বলব, যা আগে কারুকে বলিনি। কোনও না কোনও মানুষকে কথাগুলো বলে যেতেই হত আমাকে। বাইবেল বল, মহাভারত বল, সবই তো তৈরি হয়েছে এভাবেই। পূর্বপুরুষের বলে যাওয়া উপাখ্যান থেকে। ছাপাখানা, বই, এ-সব তো হয়েছে অনেক পরে।

'শোনো আমি তোমার কাছে আজ একটি মৃত্যু-পূর্ব স্বীকারোক্তি রেখে যাব। না-না, মিঃ চ্যাটার্জি, তুমি কাল সন্ধ্যায় যা দেখেছ, সে কথা নয়। তুমি যে তখন বারান্দায় বসে, সে আমি জানি। আর, সেই কনফেশন তো আমি নোরার বাবা রেভারেন্ড যোশেফের কাছে করে যাব। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কনফেশন গ্রহণ করে সে ব্যাটা তার পাদ্রি-জীবন সার্থক করবে। এবং, তারপরেও সে এই পাপী মৃতের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করবে—যদি সে প্রকৃতই পাদ্রি হয়ে থাকে।

'শোনো, আমি আর কয়েকদিন মাত্র বেঁচে থাকব। আমার লাংসে ফাইব্রোসিস হয়েছে। এ-রোগে কেউ কোনওদিন বাঁচেনি। আর এই বয়সে মেরে ফেলার জন্যে তো একটু নিমোনিয়াই যথেষ্ট।

'শোনো, তুমি আজই চলে যাও। কিন্তু তার আগে তোমাকে বলি, আমার মেয়ে নেই, জামাই নেই, আন্না আর অ্যালকে বলে আমার দুই নাতনি নেই—জগদীশ তোমাকে বলেছে নিশ্চয়ই—সে কথা ঠিক নয়। তবে ওরা থাকে অনেক দূরে—সেই সুদূর নরওয়ের উত্তর প্রান্তে, নর্থ সি'র কাছাকাছি বোডো বন্দরে। অতদূর থেকে ছানা-পোনা নিয়ে উড়ে আসা

কি চাট্টিখানি কথা।

'উড়ে-আসা শুনে চমকে উঠ না চ্যাটার্জি। হ্যাঁ, উড়েই তো আসতে হবে ওদের। আমার মেয়ে-জামাই আর নাতনিরা থাকে সাগর-কূলে টালিন পর্বতের এক ফাটলের মধ্যে। প্রায় ৩ হাজার ফুট উঁচুতে। হোক কাঠকুটো দিয়ে তৈরি, মানুষের চেয়ে অনেক শক্তপোক্ত আর নিরাপদ বাসা ওদের।

'আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন আরিজোনার গোল্ডেন ঈগল বংশীয়। অবশ্য, ওখানে আমাদের বংশের এখন আর কেউ নেই। পেটের ধান্দায় সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়েছে। আমার স্ত্রী সুজানের মৃত্যুর পর—আঃ, কী সুন্দরী যে ছিল সে। উত্তর স্কটল্যান্ডের গার্বাডিন পাহাড়ের নিচে যে বিশাল উপত্যকা—তারই আকাশে চক্কর মারতে মারতে আমার সঙ্গে একদিন গোধূলি লগ্নে ওর দেখা হয়ে যায়। ও ছিল কেন্ট ম্যাকাফার্সন নামে এক পক্ষী প্রেমিকের পোষা পাখি। বিরাট খাঁচায় থাকত সে। একটা সুন্দর বিছানা ছিল তাঁর। খাঁচার মধ্যে তার জন্যে একটা ৪ ফুট গভীর আর ৬ ফুট লম্বা সুইমিং পুল ছিল। আর খাবার জন্যে পাখি-পায়রা? সে সব তো চাইবার আগেই। কেন্ট তাকে রোজ উড়তেও দিত কিছুক্ষণ। পাহাড়ের মাথা থেকে শিস দিত নানারকম। ও সেভাবে উড়ত। বেশিদূর যেত না। প্রথম কদিন সে মনিবের খাঁচায় ফিরে গিয়েছিল। রাতে আমিও যেতাম তার খাঁচার পাশে। কিন্তু, রাখোয়ালের তদ্বির ছেড়ে, কেই বা উচ্ছন্ন প্রেমিকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে চায় বল!

'কিন্তু, ঐ যে বলে না, স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম। একদিন ও চক্কর মারছে নিচে, আমি খানিকটা ওপরে, দেখলাম ও আমার সঙ্গেই চলে আসছে। দেখতে দেখতে আমরা গার্বাডিন উপকূলের দিকে উড়ে গেলাম। দু'দিন ওখানে লুকিয়ে ছিলাম আমরা। আকাশে একদম যাইনি। কারণ কেন্ট একটা ক্ষুদে প্লেন নিয়ে পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছিল আমাদের আর দুম-দুম করে বন্দুক ছুঁড়ছিল প্লেন থেকে। যাতে আমরা ভয় পেয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ি। ওখান থেকে সুযোগ বুঝে নর্থ সি পেরিয়ে আমরা আয়ারল্যান্ড চলে যাই। ওখানেই আমাদের মেয়ের জন্ম, ওর বিয়ে, নাতি-নাতনি সব। মৃত্যুর আগে সুজান সব দেখে গেছে। শি ডায়েড এ ভেরি হ্যাপি লেডি, ইউ নো।

'কী করে আমি শেষপর্যন্ত গোপালপুরে এলাম, সে কাহিনী নাই বা শুনলে। এই যে হাওয়া, এ তো এখন আসছে ঐ দিক থেকে। ঐ, ঐ যেদিকে নরওয়ে। এই হাওয়া বোডো বন্দরের আকাশ থেকে আসছে না, তুমি কি নিশ্চয় করে বলেত পার! আমি আজ, তখনও ভোর হয়নি, নাতনিদের 'দাদু-দাদু' ডাক স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম এই হাওয়ায় তাহলে? আহা, কী মিষ্টি যে ওদের গলা। তা, তুমি কি এই হাওয়ার কাছে জানতে চাইবে, কী করে কীভাবে তোমরা এখানে আসতে পারছ?

'আর শোনো চ্যাটার্জি। জানিয়ে যাই। জেনিসের ঘরে যে স্টাফড মেয়ে-ঈগলটি দেখেছ, উনিই লেডি সুজান। জেনিসের মা। জামাই থিওডোরের শাশুড়ি। তার ছোট্ট দুই নাতনি আন্না আর অ্যালকের ঠাকুমা। এবং জ্যাক-এর স্ত্রী।

'হ্যাঁ, জ্যাক দা রিপার। পৃথিবীর সবচেয়ে সফল খুনী। সে যে কে ছিল, তা কেউ জানে না। আরে বাবা, জানবে কী করে। জ্যাক তো মানুষই ছিল না। আর, সেটা পুলিস ভাববে কী করে। গড সেই বুদ্ধিই দেয়নি মানুষকে। ওসব ঈগলের আছে। ইলেকট্রিক চেয়ারে বসে বা ফাঁসি হবার আগে, কত লোক চেঁচিয়ে বলে গেছে—আই অ্যাম জ্যাক দা রিপার। শুধু অমর হবার বাসনায়।

'হাঃ-হাঃ-হাঃ। কিন্তু, কেউ না।' এত বলে আবার ভূতের মতো, না, ভূতও পাগল হয়ে

যায়—পাগল ভূতের মতো হাসতে শুরু করলেন ক্যাপ্টেন রিচার্ড জেমস স্মিথ। মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে তাঁর হাসি মিলিয়ে যাচ্ছিল বটে কিন্তু দম ফিরে পেলেই আবার হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠছিল তাঁর মুখ।

'সো দিস ইজ মাই কনফেশন। জ্যাক দা রিপার। তুমি বল তো চ্যাটার্জি নোরার পাদ্রি-বাপ—যে কনফেশন শুনে তিড়ি-বিড়িং লাফাবে—সে আর জ্যাক দা রিপারের কাছে কী? একটিপ নস্যি, তাই নয় কি?'

মিনিবুক, বইমেলা ১৯৯৬

এক যে ছিল দেওয়াল

উৎসর্গ : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

এক যে ছিল বাড়ি। বাড়ির রঙ লাল। লালবাড়ির উঠোনে ছিল, একটা সাদা রঙের দেওয়াল।

একটা গোটা রাস্তার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত জুড়ে বাড়িটা। মস্ত অফিস। অনেক প্রবেশ পথ। অফুরান সিঁড়ি। হাজার হাজার কর্মচারী।

একদিন সকালবেলা কর্মচারীরা অফিসে ঢুকে দেখল, সাদা দেওয়াল জুড়ে রক্তবর্ণ বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে ঃ

সমস্ত দুর্নীতির
বৃষণ
কর্তন করো

কে বা কারা এমনতর লিখে গেল তার উল্লেখ নেই।

সাদা দেওয়া জুড়ে শ্লোগান, এ নতুন কিছু না। বস্তুত, দেওয়ালটি তো শ্লোগান লেখারই জন্যে। বহুকাল ধরে এখানে তো শুধু শ্লোগানই লেখা হয়। সব পার্টিই লেখে। একদিন তার প্রাসঙ্গিকতা যায় ফুরিয়ে। তখন চুনকাম হয়। তারপর আবার একদিন দেখা দেয় সময়োচিত নতুন শ্লোগান। এখানে শেষ শ্লোগানটি ছিল ঃ ৯ সেপ্টেম্বর ভারত বন্‌ধ সফল করুন।

এখন, এক-একটি শ্লোগানের আয়ু ফুরোলো, এই যে এক পোঁচ করে কলি, এ যদি হয় মৃতদেহ ঢাকা দেবার কাফন, তাহলে একের পর এক শবাবরণ তুলতে থাকলে এখানে কত না শ্লোগানের মরা মুখ দেখা দেবে। যেমন—

'মন্দির ওঁহি বানায়েঙ্গে'
বা,
'গর্বাচভের মৃত্যু আছে
মার্কসবাদের মৃত্যু নাই'
বা,
'যবতক সূরজ চান্দ রহেগা
ইন্দিরা তেরা নাম রহেগা'

কিম্বা, তারও আগে,
'সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে
পরিণত করুন'—

এই রকম কত যে মরামুখ ঐ দেওয়ালের পরতে পরতে, একের পর এক শ্বেতবস্ত্রের নিচে শুয়ে আছে।

কিন্তু, হঠাৎ এ কী? সমস্ত দুর্নীতির বৃষণ কর্তন করো? হতভম্ব সকলেই! তাহলে কী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, এবং সকলের অজ্ঞাতসারে! শ্লোগানটির অর্থই বা কী? এবং 'বৃষণ' বলতে? কোন পার্টির শ্লোগান, তাও লেখা নেই। সকলেই মুখ-চাওয়াচায়ি করে।

যাক! দু-একদিনের মধ্যেই দেখা গেল, কে বা কারা ঐ শ্লোগানের ওপর এক প্রস্থ মোটা চুনকাম করে দিয়ে গেছে। সাদা দেওয়াল আবার যে-কে সেই। আগের মতোই ধবধবে সাদা।

দিনকয়েক যায়। সাদা দেওয়াল ফের কিছুদিন সাদাই পড়ে থাকে। আসন্ন বায়-ইলেকশানের আগেই পর্যন্ত সাদাই থেকে যাবে বলে ধারণা হয়।

কিন্তু না! দিন পনেরো যেতে না যেতেই ওখানে আবার ফুটে উঠল এবং এবার আরও বড় বড় আর গোটা গোটা হরফে ঃ

সমস্ত দুর্নীতির
অণ্ড
কর্তন করো

গোটা অফিস জুড়ে এবার গুঞ্জন শুরু হল। আসলে, 'বৃষণ' শব্দটির মানে অনেকেরই জানা ছিল না। কেউ কেউ অভিধান দেখেছিল। আরও বহু শব্দের মতো, এটিও চলন্তিকায় নেই।

কিন্তু, এবার দেখা গেল এবং এই প্রথম যে, অই অদৃষ্টপূর্ব একান্ত ঘরোয়া শ্লোগানের আবেদনে সাড়া দিতে গিয়ে সারা অফিস কুরু-পাণ্ডবে দ্বিধা বিভক্ত। অনেকেই বলল, ছি, ছি, এতে তো দেশের অপমান। অফিসের অপমান। আবার অনেকে দেখা গেল ভিন্ন মতো পোষণ করে। তারা বলল, বেশ লিখেছে। একদম ঠিক লিখেছে। বস্তুত, অফিসের উঠোনে এ-নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সেদিনই রীতিমতো হাতাহাতি হয়ে গেল।

যাই হোক। পরদিন সকালে দেখা গেল, কে বা কারা, এবার রাতারাতি, কয়েক প্রস্থ চুনকাম করে শ্লোগানটি নিশ্চিহ্নভাবে মুছে দিয়েছে।

সবাই স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলল। শান্তি ফিরে এল অফিসে। প্রেস্টিজও।

এরপর থেকে অনেক, অনেকদিন সাদা দেওয়ালে আর কিছু লেখা হয় না। সাদা দেওয়াল সাদাই পড়ে থাকে। এতদিন ধরে নিরক্ষর সাদা দেওয়ালটা কখনও থাকেনি। এতদিন ধরে যে, শেষ পর্যন্ত ধারণা হল, কেউ আর কিছু লিখবে না ওখানে। কোনও দিন।

দিন যায়। দেখতে দেখতে শরৎকাল এসে পড়ল। এলে, সেই নীল আকাশ আবার দেখা দিল, মাথা একবার উঁচু করলেই যা মানুষের মনকে করে দেয় অতি অবোধভাবে আন্তর্জাতিক—সেইসব অলস ও ভূ-পর্যটক মেঘের দল ফের ভেসে এল। রাতে শবযাত্রায় খই-এর মতো তারারা ছড়িয়ে পড়তে লাগল আকাশে। রাস্তায় মোড়ে মোড়ে টাঙানো হতে থাকল সর্বজনীন উৎসবের লাল সালু।

তারপর....মহালয়ার ঠিক পরের দিন।

অফিসে ঢুকেই কর্মচারীরা চমকে উঠল। তারা দেখল, আগের চেয়েও বড় অক্ষরে, এবার আগুন রঙে ও অগ্নিশিখা-হরফে, কে বা কারা আবার লিখে রেখে গেছে (এবারেও ঈষৎ পরিবর্তিত) ঃ

সমস্ত দুর্নীতির
বিচি
কেটে দাও

ছি ছি। ছিঃ। টনক এতদিনে নড়ল। এবার পোঁচের পর পোঁচ পড়তে লাগল চুনকামের। উত্তেজিত কর্মচারীরাই হাত লাগাল এবার। কিন্তু এবার এ কী অবাক কাণ্ড। দেখা গেল, পোঁচ যত পড়ে, আগুনের শিখার মতো অক্ষরগুলি ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। চুনের বালতি নিঃশেষে শেষ হয়ে গেল। অথচ, ঐ দ্যাখো, ওরা ফের ফুটে উঠছে!

এবং, এর পরদিন কর্মচারীরা এসে যা দেখল তার জন্যে কেউ-ই প্রস্তুত ছিল না। কে বা কারা, রাতারাতি এতদিনের সাদা দেওয়ালটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে, তারা দেখল।

এখন সাদা দেওয়ালটা ইঁট চুন ও সুরকির অনুচ্চ ধ্বংসস্তূপ এক, উঠোনের মাঝামাঝি। অবশ্য এ কিছু নতুন দৃশ্য না, এমনটা আগেও দেখা গেছে। যখন বাড়ি ভাঙা হয়, বা ভেঙে পড়ে। যা নতুন, তাহল ধ্বংসস্তূপের মাথায় পোঁতা একটি লম্বাপানা শাবল। স্তূপপাদমূলে একটি গর্বিত গাঁইতি পোঁদ উঁচু করে বসে আছে।

ঋণস্বীকার ঃ বেরটোল্ট ব্রেশট
বোবাযুদ্ধ, বইমেলা ১৯৯৭

এখানে সকলে একপ্রকার কুশলে আছি

দুপুরবেলা। 'স্বাভিমান' দেখতে দেখতে বেঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল পঙ্কজ। টিভি বন্ধ না করেই। ঘুম ভাঙল প্রবল চিৎকারে। না, ভয়ের কিছু না। সে তখুনি বুঝতে পারল, স্টেডিয়ামে উঠে দাঁড়িয়েছে অসংখ্য লোক। মাঠে একা ছুটছে কৃশাণু দে। ভাবখানা, যেন ঢাকা মুক্তিযোদ্ধা নয়, ব্রাজিল কি কলম্বিয়ার পেটেই একখানা গোল ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঐ যে, হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে, ঊর্ধ্বাঙ্গ ঝাঁকিয়ে, গ্যালারির উদ্দেশ্যে, দোনাদুনি ধরনে একটা অ্যাপিলও জানাচ্ছে।

তারপরেই....একটানা বেল বেজে যাওয়ার শব্দ পেল সে। বেল তো এ-ভাবে বাজে না! শর্ট সার্কিট নাকি? তাড়াতাড়ি দরজা খুলতে গিয়ে দেখল, চৌকাঠের ফাটল দিয়ে ফুরফুর করে ধোঁয়া ঢুকছে ঘরে। তখনও তার মাথা ছিঁড়ে-যাওয়া ঘুমে ভারি হয়ে আছে।

বিপদ একটা হয়েছে। যার কেন্দ্রে সে দাঁড়িয়ে। এবং সেটা কী, তা জানা দরকার। এবং এই মুহূর্তে। এখন থেকে প্রতিটি মুহূর্ত তাকে হয় জীবন, না হয়ত মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সে টের পেল।

মুখোমুখি দুটি ফ্ল্যাট চারতলায়। ১৬ আর ১৭ নং। তারপর ছাদ। ছাদের দরজায় তালা দেওয়া থাকে। কিন্তু রাস্তার ওপর মেন গেট থাকে সারারাত খোলা। সরকারি ফ্ল্যাট, দারোয়ান নেই। ওপর ছাদের সিঁড়িতে তাই প্রেমসে আড্ডা দিতে মস্তানরা। বিশেষত দুপুরে আর সন্ধ্যার পর থেকে। বোতল আর খুরি আগেই পাওয়া গিয়েছিল। তারপর

পাওয়া গেল এফ-এল। অ্যাসোসিয়েশনের মিটিঙে ১৬ আর ১৭ নং তখন প্রস্তাব রাখে, সমাজবিরোধী রুখতে তাদের ফ্ল্যাটের সামনে আর একটি গেট বসানো দরকার। ছাদে যাবার প্রয়োজনে সকলেই দুটি করে ডুপ্লিকেট চাবি পাবার শর্তে বাকি ফ্ল্যাট-মালিকরা রাজি হয়ে গেল। চারতলায় সেই নতুন গেটের বাইরে এখন বেল বাজছে। বেল বেজেই চলেছে।

দু'হাট করে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিতেই রাশি রাশি ধোঁয়া সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো উথলে উঠে ঢুকে পড়ে তাদের ১৬ নম্বরে। পঙ্কজ দেখল, বাইরে ল্যাণ্ডিং ধোঁয়ায় অন্ধকার।

'পঙ্কজদা গেট খুলুন! গেট খুলুন!'

ধোঁয়ার ওপার থেকে চায়ের দোকানের বাদলের গলা সে শুনতে পেল। গৌর, ভুটে, নন্তু, বাসু এরাও চেঁচাচ্ছে। চেঁচাচ্ছে ১৭ নং-এর কাজের মেয়ে বাসন্তীও। এইসময় টুকাইকে স্কুল বাস থেকে আনতে বৌদির সঙ্গে সেও রাস্তায় দাঁড়ায়। বঙ্কু নিশ্চয়ই অফিসে। সে ভিড়ের মধ্যে স্বাতীকে দেখতে পেল না।

গেটের চাবি হাতে নিয়ে দরজা খুলেছে পঙ্কজ। সে দেখল, গেট পর্যন্ত সটান দাঁড়িয়ে যাওয়া যাবে না। নিচের দিকে ধোঁয়া বরং অপেক্ষাকৃত পাতলা। হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে হতে চাবিটা সে গেটের দিকে ছুঁড়ে দিল। নিশ্চয়ই তাকে উদ্ধার করতেই ছুটে এসেছে ওরা। সে নিজেই বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। কিন্তু, সে বেশ অবাক হল, তাকে ধোঁয়ার ভেতর ঠেলে দিয়ে বাদলকে ১৭ নং-এর দরজার দিকে ছুটে গিয়ে দরজায় দমাদ্দম লাথি মারতে দেখে।

দরজা ভেঙে পড়ল। ভক করে চামড়া পোড়া আর কেরোসিনের গন্ধ নাকে এল তার। সে দেখল, আরও অনেক বেশি নিরেট ধোঁয়ার মধ্যে আগুন-লাগা কিছু একটা, কেউ গড়াগড়ি খাচ্ছে ওদের ডাইনিং স্পেসে।

'জ্বলে গেল! পুড়ে গেল!' বিভূতিবাবুর গলা সে স্পষ্ট শুনতে পেল। একটু আঁচলাগা এবং ঘড়ঘড়ে। তবে তাঁর স্বরযন্ত্রে এখনও আগুন লাগেনি।

সে চোখ ফিরিয়ে নিল।

যখন কমন গেট হয়, দুই ফ্ল্যাটের মধ্যে সম্পর্ক খুব ভাল ছিল। ফ্ল্যাটের মালিক পঙ্কজের দিদি, তখন দিদি ছিল। তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ পর্যন্ত অপেক্ষা করে, শেষপর্যন্ত অফিস কলিগ সেই সোমনাথবাবুকেই বিয়ে করে দিদি সুলতা বড়িশায় নতুন ফ্ল্যাটে চলে গেল। তারপর থেকে পঙ্কজ একা। অধিক বয়সে, বিবাহজনিত লজ্জায় দিদি আর এদিক মাড়ায়নি।

দুই ফ্ল্যাটের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হল এ বাড়িতে মনীষার আসা-যাওয়া নিয়ে। প্রথমা স্ত্রী বেঁচে থাকতেই সোমনাথবাবু আসতেন। তখন আপত্তি ছিল না। অবশ্য সোমনাথবাবুর চুলে পাক, চেহারাও বেশ রাশভারি। দিদিরও গোটা পঁয়ত্রিশ। এবং মনীষার মতো যখন-তখন বা অত ঘনঘন আসতেন না দিদির লাভার। সে-সব প্রয়োজনে ওরা যেত ডায়মণ্ডহারবারে। বা, চেনা হোটেলে। পঙ্কজ জানত, এবং দিদির সুদীর্ঘ এক যুগ ধরে এ প্রণয় সম্পর্ককে সে মেনেও নিয়েছিল। যদিও এর পরিণতি নিয়ে সংশয় ছিল তার মনে। কিন্তু দিদির মনে কোনও দ্বিধা ছিল না। আর লুকিয়ে করছে না কিছু অন্তত তার কাছে। বিনিময়ে মনীষার ব্যাপারেও কোনও প্রশ্ন তোলেনি দিদি। মনীষা টাকা নেয়, দিদি জানে। তাছাড়া, তখনও দুই ফ্ল্যাটের বাইরে তালা-বন্ধ কমন গেটেরও প্রচলন হয়নি।

মনীষা হয়ত এসে গেল দুপুরে। আর, আসবে জেনে পঙ্কজও অফিস যায়নি। আর, ভুল করে ১৭ নম্বরের বেল টিপেছে মনীষা। গেট খুলেছে বিভূতিবাবুর পুত্রবধূ স্বাতী। এমন অনেকদিনই হয়েছে। তাছাড়া, ১৬-র বেল টিপলেই বা কি। ১৭-র কি পিপ হোল

নেই? স্ত্রীর আপত্তি। পত্নীব্রত স্বামী বঙ্কু বিষয়টা নিয়ে গেল নাগরিক কমিটি পর্যন্ত। সে পার্টি করে। এসব হচ্ছেটা কী, অ্যাঁ, এ কি মধুচক্র? এবছরেই তারা বিয়ে করছে, মনীষার নার্সিং ট্রেনিংটা শেষ হলেই। এতে কোনও কাজ হল না। মনীষার আসা বন্ধ হল। সেই থেকে বঙ্কু আর স্বাতীর সঙ্গে বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। সিঁড়িতে দেখা হলে যে-কোনও পক্ষের 'ভালহ্ তো?' শেষ হবার আগেই অপর পক্ষের ঘাড় কাৎ করে দেওয়ায় পর্যবসিত হল। স্বাতী তো মুখ ঘুরিয়েই রাখে। কিন্তু, বিভূতিবাবুর সঙ্গে একটা পাড়াতুতো সম্পর্ক তার শুধু থেকে গেল নয়, দিনে দিনে গভীর থেকে গভীরতরই হতে থেকেছে।

অফিস থেকে সোজা চলে এলে এবং আর কোথাও যাবার না থাকলে কাজের মাসির তৈরি করে রেখে যাওয়া পরোটার সঙ্গে এক কাপ কফি বানিয়ে খেয়ে, সময় কাটাতে, পঙ্কজ প্রায়ই পাড়ার পার্কে যায়। মৃত ফোয়ারার ধারে একটা না-একটা বেঞ্চিতে রোজই বসে থাকতে দেখত বিভূতিবাবুকে। ওঁর বেঞ্চে বসাটা ছিল সত্যিই একটা দেখার জিনিস। প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ রুমাল আছড়ে ধুলো ঝাড়বেন। তারপর পাঞ্জাবির পকেট থেকে বেরুবে ভাঁজ-করা ছোট্ট প্লাস্টিকের শিটটা। ভাঁজের পর ভাঁজ খুলে ফটাস ফটাস শব্দে হাওয়ায় ঝেড়ে সেটা বেঞ্চির ওপর পেতে হাত দিয়ে ভাঁজগুলো সমৃণ করবেন। তারপর ধীরে, খুব ধীরে, যেন ইতিহাসে, আসন গ্রহণ করবেন। কোলের কাছে মলাক্কা বেতের লাঠিটা পড়ে থাকবে। পঙ্কজ এসে পড়লে, পাশ থেকে রুমালটা তুলে নিয়ে বলবেন, 'বোসো ভায়া।' কালক্ষয় করাই উদ্দেশ্য এই বিলম্বিত লয়ের—পঙ্কজ বুঝত। জিওলজিক্যালের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি, দু'পাটি ডেনচারের বয়সই হয়ে গেল ১২ বছর। প'রে প'রে মাড়িতে ঘা হয়ে গেছে। অথচ, সামনে এখনও অনিশ্চয়। শেষ কোথায় এখনও জানা নেই।

'মরার বয়স? সেটা ঠিক কখন থেকে শুরু হয় তুমি বলতে পার পঙ্কজ?'

শেষ যেদিন পার্কে কথা হয় জানতে চেয়েছিলেন বিভূতিবাবু, 'এই যেমন ধর কেদার-যাত্রায়। হৃষিকেশ থেকে গৌরীকুণ্ড। বাসে গেলে। তারপর সেখান থেকে কিলোমিটার হাঁটাপথ। সবাই জানে আগে থেকে। এ'রকম কোনও ডিমার্কেশন আছে কি?'

ওঁর কথায় কথায় ভ্রমণের গল্প এসে যেত ঠিকই, যে কোনও ছুঁতোয়। কারণ, উর্দি হচ্ছেন সেইসব রিটায়ার্ড মানুষদের একজন, যাঁরা কর্মসূত্রে তো বটেই, নিজস্ব উদ্যোগেও ভারতবর্ষের এমন কোনও দিক নেই যেদিকে যেতে বাকি রেখেছে। মায় সস্ত্রীক অমরনাথ। সব, সব শেষ। আর কোথাও যাবার নেই। সাল তারিখ? সব মুখস্থ। এমনভাবে বলতেন যেন সেটাই তার জীবন। কিন্তু সে-সব গল্পে, আজকের মতো, মৃত্যু রঙ এর আগে কখনও লাগতে দেননি তো কোনওদিন।

''বুঝলে ভায়া'' নিজেই বলতে শুরু করলেন, ''আজ সকালে নেপালের মা শুনলাম বৌমাকে বলছে, 'ছাইটাই আর পাওয়া যাচ্ছে না বৌদি। আপনি হাঁড়ি-টাঁড়ি আর পোড়াবেন না।' বৌমা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, তোমাদের বস্তিতে আর উনুন জ্বলে না?' নেপালের মা হেসে বলল, 'উনুন কোথা বৌদি। আমরা তো এখন রেশনেরর কেরোসিন জ্বালাই। কয়লার যা দাম। আগুন!' শুনে বৌমা তো মহা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শুনলাম বলছেন, 'তাহলে ছাই কি আর পাওয়া যাবে না?' আমি তখন সবে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছি। শুনে এমন হাসি পেল আমার, বুঝলে ভায়া? হাসির তোড়ে মুখ থেকে চা চলকে পড়ল। খাবার আগে দাঁতের পাটি দুটো পরি। এমনিতেই লুজ, হাসির চোটে খটাস করে মাটিতে পড়ে গেল। বুঝলে। তখন বৌমা বললেন, 'এতে হাসির কী হল?' আমি জানি, আর তুমিও হয়ত লক্ষ্য করেছ, হাসলে আমার এই নাদুসনুদুস গোটা চেহারাটাও সেইসঙ্গে

হাসতে থাকে। মায় ভুঁড়িটুড়িও। ভাল দেখায় না। তাই না হাসতে আমি খুব চেষ্টা করি। আর যে কথাটা মনে পড়ায় হাসি পেয়েছিল, আমি খুব চেষ্টা করেছিলাম সেটা না বলতে। হাতের নাড়ায় চা প্রায় সবটাই পড়ে গেছে। বৌমার তো আর এক কাপ করে দেবার কথা, কিন্তু, জানো তো, হাসির মতো, নতুন আইডিয়াগুলোও পাখির মতো। আর যারা আকাশে ওড়ে, মাধ্যাকর্ষণ তো তাদের জন্যে তেমন কাজ করে না। তাই আমিও বলে ফেললাম, 'না, পোলের ওপারেই তো ক্যাওড়াতলা। আর ওদের বস্তি তো ওদিকেই। ছাই কি সেখানেও পাওয়া যাবে না?' শুনে বৌমা একদম গুম মেরে গেলেন।

'তারপর?'

'শুনে বৌমা এমন রেগে গেলেন, কী বলব তোমায়। মুখটুক লাল হয়ে উঠল। এদিকে ঐ কথাটা বলে ফেলে আমিও হাসি থামাতে পারছি না। মুখের হাসি থামে তো কাঁধ দুটো হাসির তোড়ে লাফায়—কাঁধ থামে তো ভুঁড়ি— ভুঁড়ি থাকে তো....জোকার-জোকার লাগে আমাকে— আমি জানি।'

'না। তা আপনার বৌমা কী বললেন।'

"বৌমা বললেন," বলতে চাননি, কিন্তু এক্ষেত্রেও বোধহয় দুর্বল মাধ্যাকর্ষণ পাখিওড়া আটকাতে পারল না। বিভূতিবাবু একটা গোটা দীর্ঘশ্বাস না ফেলে, বরং তাতেই বুক ফুলিয়ে বললেন, "বৌমা বললেন, 'এমন কথা এই বাড়িতে আপনি আর কোনওদিন উচ্চারণ করবেন না। আমাদের অকল্যাণ হবে। আপনার মরার বয়স হয়েছে। কিন্তু ওর তো হয়নি'—বলে টুকাইকে দেখালেন।"

৪ বছরের নাতনি টুকাই পার্কের গল্পে রোজ একবার না একবার আসবেই। টুকাই-এর গল্প বলতে গিয়ে একদিন তো হাসির চোটে দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। হয়েছে কি, গড়িয়াহাটে স্বাতী গেছে পুজোর কেনা-কাটা করতে, সঙ্গে টুকাই, আর কোনও লেডিজ ছাতার খোঁচায় টুকাই-এর কপালটা গেছে ছড়ে। বৌমা তো 'চোখের মাথা খেয়েছে' থেকে মেয়েটিকে আর বলতে কিছু বাকি রাখেনি। ছোটগিন্নি কিন্তু তাতে যথেষ্ট সন্তুষ্ট নন। রাতে আমার ঘরে এসে ঠোঁট ফুলিয়ে নালিশ জানাচ্ছেন, 'দাদু জানো, তোমার নাতনিকে, তো-মা-র নাতনিকে এইখানে খিঁচে দিয়েছে।'

'বিশেষ করে খিঁচে শব্দটা ওর মুখে এমন মজার লাগল—বাকিটা না বলে জলদগম্ভীর 'হেঃ হেঃ' শব্দযোগে বেদম হাসতে শুরু করলেন বিভূতিবাবু। আর থামাতে পারেন না কিছুতেই। মুখের হাসি থামে তো কাঁধ দুটো লাফায়, কাঁধ থামে তো ভুঁড়ি—সত্যিই জোকার-জোকার লাগছিল।

শেষ যেদিন দেখা হয়, 'মৃত্যুর বয়সে'র কথাটা তোলার পর বহুক্ষণ চুপ করেছিলেন বিভূতিবাবু। পকেট থেকে একটা তোবড়ানো সিগারেট বের করে (আরও একটা আছে, আমি জানি) ধরাবার জন্যে পরপর তিনটে কাঠি জ্বালালেন। তিনবারই জ্বলে দপ্ করে নিবে গেল। কয়েকবার নাড়িয়ে উনি দেশলাই বাক্সটা ফেলে দিলেন। পঙ্কজ দেশলাই আনতে চায়।

ওঁর বোধহয় সিদ্ধান্ত নিতে এতটাই সময় দরকার ছিল। 'আমি আর বঙ্কুর ওখানে থাকব না। তুমি আমাকে একটা ঘর দাও। বি-পি কমন হলেও চলবে। ভাড়া ৫০০ টাকা। পেনসন ফিক্সের সুদ—আমার চলে যাবে।' আমার হাতদুটো ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন বিভূতিবাবু, 'আমি থাকলে টুকাই-এর অকল্যাণ! ওঃ-হো-হো!'

সামনেই কর্পোরেশন ইলেকশন। ঢেলে সাজান হচ্ছে পার্কটি। শোনা যাচ্ছে, ফোয়ারাতেও নাকি জল আসবে। সবুজ-রঙ করা রেলিং-এর ধারে একের পর এক

এপ্রিলের কৃষ্ণচূড়া। কয়েকটি শিমূল-পলাশ। ঝরে-পড়া লাল-হলুদ ফুল ঝাঁট দিয়ে ডাঁই করা এখানে-ওখানে। ওদিকে ভলিবল। তিনটি যুথবদ্ধ পাম গাছের বাঁধানো বেড় ঘিরে মায়েরা। তাদের সামনে শিশুদের ছোটাছুটি।

একসপ্তাহ পরের কথা। রবিবারের বিকেল। মৃত ফোয়ারার ধারে পার্কের বেঞ্চিটাতে পঙ্কজ সাতদিনের মধ্যে এই প্রথম এসে বসেছে।

অপঘাতে মৃত্যু, তাই তিনদিনের মাথায় স্থানীয় বৈষ্ণব মঠে শ্রাদ্ধ হয়ে গেছে বিভূতিবাবুর। বঙ্কু নাগরিক কমিটির মেম্বার। পুলিস হ্যাঙ্গাম হয়নি। চুনকামের জায়গায় তাদের ফ্ল্যাটে প্লাসটিক পেন্টিং করা হয়ে গেছে। নইলে নাকি আগুনের হল্কায় দাগগুলো পুরোটা যেত না। একটি পাখা পুড়েছিল, নতুন পাখা ফিট হয়েছে। টিভি'র ক্ষতি হয়নি। ডাইনিং স্পেসের বিদ্যুতের ওয়ারিং পুরোটা বদলাতে হয়েছে। এসব বঙ্কুই বলেছে তাকে। পুলিসকে বঙ্কু বলেছে, 'আত্মহত্যা নয়, এটা দুর্ঘটনা। ৭২ বছর বয়সে কেউ আত্মহত্যা করে না। আর ক'টা বছর কাটিয়ে দেয়। আসলে উনি তো একা-একা চা করতে গিয়েছিলেন জনতা স্টোভে। ফ্ল্যাটে কেউ ছিল না। তাতেই আগুন লেগে যায়। স্টোভ উল্টে গিয়েছিল, তাই অত কেরোসিন গন্ধ। এই তো ইনিই তো দেখেন প্রথম। জিজ্ঞাসা করুন না'—পঙ্কজকে দেখিয়ে বঙ্কু বলেছে। দুর্ঘটনার প্রথম দর্শক হিসেবে পঙ্কজ থানায় গিয়ে সবই সমর্থন করেছে। বিপদ আবার কাছাকাছি এনে দিয়েছে তাদের। স্বাতী নিজে এসে দ্বাদশ ব্রাহ্মণের একজন হিসেবে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করে গেছে পঙ্কজকে। এবং সে গিয়েওছিল।

টুকাই না? পার্কে ছুটন্ত শিশুর দলে একটা বাচ্চা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এখন কাঁদো-কাঁদো মুখে উঠে দাঁড়াচ্ছে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ তো টুকাই। তাকে উঠতে সাহায্য করছে, তার চেয়ে একটু বড়—এক রাশভারি ছেলে। কার সঙ্গে এসেছে খুঁজতে গিয়ে, অত্যন্ত কাছে, একেবারে রেলিং-এর ধারে সে ওদের বাড়ির নতুন কাজের মেয়ে বাসন্তীকে দেখতে পেল। এখন তার গায়ে সাদা কালো-ছিট ম্যাক্সি—যদিও আজ সকালেই ফ্রক পরে স্বাতীর পাঠানো দই-ইলিশ দিতে এসেছিল।

একদম দেখতে পায়নি তাকে। বাসন্তী রেলিং-এ সেঁটে। সামনে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রাতে মাস্তান, দিনে চা-বিক্রেতা বাদল।

'বিশ্বেস যাও বাওলদা, গুরুদার সঙ্গে আমার দাদা-ছোটবোনের সম্‌পোককো।'

'সিনেমায় যাস?'

'মাইরি বলছি, মা কালী, কুনোদিন না।'

'গুরুকে বলে দিস, এ-পাড়া যেন আর কোনওদিন না মাড়ায়। ওকে দেখলেই ক্ষুর মারব। এই যে' বলে সে ক্ষুর বের করতে গিয়ে প্রথমে একটা দাঁড়া-ভাঙ্গা চিরুনি বের করে ফেলে। তারপর ক্ষুর দেখায়।

এইসময় টুকাই আবার পড়ে গিয়ে জোরে কেঁদে উঠল। দৌড়ে গিয়ে তাকে কোলে নিয়ে বাসন্তী ফের বাদলের কাছে ফিরে আসে।

বিকেল শেষ হয়ে আসছে। এবার অন্ধকার হবে। বাসন্তী বলল, 'আমি আসছি। কোথায় লেগেছে টুকাই?'

'আমাল এখেনে খিঁচে গেছে' বলে ঠোঁট ফুলিয়ে হাঁটু দেখাতে গিয়ে টুকাই কপালে হাত রাখে, 'দাদু কোতায়।'

'তোমার দাদু সগ্‌গে গেছেন টুকাই।'

'এই শোন্' হাত চেপে ধরে বোধহয় তো একটু মুচড়েই দিল বাদল, বাসন্তী বলে উঠল,

'উঃ।'

বাদল বলল, 'ঠিক রাত একটার সময় যাব। ওপরে গেটের তালা খুলে রাখবি। ঘড়ি দেখবি। জেগে থাকবি। একদম ছাদের সিঁড়িতে চলে আসবি।'

বসন্তী মাথা নিচু করে হাসল, বলল, 'মাল খেয়ে এসোনি যেন।'

বাদল শুধু বলল, 'গেট যেন খোলা পাই।'

বাদল আর বাসন্তী দু'দিকে চলে গেল।

হঠাৎ চোখে পড়ল পঙ্কজের। বিভূতিবাবুর ছুঁড়ে ফেলে-দেওয়া সেই সেদিনের সবুজ প্রজাপতি মার্কা খালি দেশলাই-বাক্সটা আজও শিমূলতলায় পড়ে আছে। সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। তারপর কোথা যে কী, হঠাৎ মনে হল তার। মনীষাকে আবার আসা-যাওয়া শুরু করতে বলা যেতে পারে। যেদিন মনীষা আসবে, সেও স্বাতীকে বলবে গেটে তালা না দিতে। 'দুর্ঘটনার প্রথম প্রত্যক্ষদর্শী'র জন্যে স্বাতী এ-টুকু করতে নিশ্চয়ই রাজি হবে। আর, যদি তালা দেওয়া থাকে, মনীষাকে বলে দেবে ইচ্ছে করে ১৭ নম্বরের বেল টিপতে। স্বাতী যেন অভ্যর্থনা করে তাকে। দুপুরবেলা যেন আসে মনীষা। যখন স্বাতী থাকে। এবং নিজে গেট খোলে।

১৯৯৭

একটি মৃত্যু সম্পর্কে পূর্ব ঘোষণা

১

মুখবন্ধ

মাননীয়াসু,

এটা খুব দুঃখের বিষয় যে, বিগত ৫ বছর ধরে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়ে স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্টের নামে টিভি এবং রেডিওয় ঘোষণার পর ঘোষণা করিয়ে, পুলিস এবং অন্যান্য সূত্রে আপনার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর খোঁজ পাবার বৃথা চেষ্টার পর এই চিঠি যখন আপনার হাতে পৌঁছবে, তার আগেই আপনি খবর পেয়ে যাবেন যে, তিন-তিনটি বছর জুড়ে খুঁজে-খুঁজে, প্রত্যাশায় থেকে থেকে, শেষ পর্যন্ত আপনি যাকে মৃত বলে ধরে নিয়েছিলেন এবং তবুও সিঁদুর মোছেননি বা শাঁখা ভাঙেননি, আপনার স্বামী সেই কৃষ্ণেন্দু বেরা এতদিন জীবিত ছিলেন এবং অবশেষে তিনি সত্যই মৃত। কাল সন্ধেবেলা আমি তাকে খুন করবো।

মৃতদেহ আবিষ্কার হবার কথা পরশুদিন ভোরের দিকে। যখন পাতাকুড়োনিরা জঙ্গলে ঢুকবে। তারাই দেখতে পাবে।

তাহলে, পরের দিন অর্থাৎ ২৩ জুন, এইরকম একটা খবর কাগজে বেরোতে পারে। যথা ঃ

ডাক্তারের আত্মহত্যা

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

ঝাড়গ্রাম, ২৩ জুন ঃ ঝাড়গ্রাম-ময়ূরভঞ্জ সীমান্তের গোঁসাইগোবিন্দপুর গ্রামের অদূরে জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন চন্দ্ররেখা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। এখানে আজ প্রত্যূষে মুসলধারা বৃষ্টির মধ্যে কলকাতা

মেডিকেল কলেজের নিরুদ্দিষ্ট অধ্যাপক ও গায়নাকোলজি বিভাগের উপ-প্রধান ডাঃ কৃষ্ণেন্দু বেরার মৃতদেহ গলাকাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। দিনকয়েক আগে স্থানীয় নরসুন্দর মেঘনাথ পাত্রকে দিয়ে ডাঃ বেরা ঝাড়গ্রাম থেকে একটি ধারালো ক্ষুর কিনে আনান বলে জানা গেছে। রক্তাক্ত ক্ষুরটি মৃতদেহের পাশেই পড়ে ছিল। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, ডাঃ বেরা বিগত পাঁচ বছর যাবত নিরুদ্দিষ্ট ছিলেন। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, এমনকি বিদেশেও অনুসন্ধান চালিয়ে এতদিন তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় এ-অঞ্চলে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

এরকম, এতখানি বা আরও সংক্ষিপ্ত কি অধিক বিশদভাবে খবরটি প্রকাশিত হতে পারে। মৃতের পকেটে স্বহস্তে লেখা একটি এক পঙ্ক্তির বিবৃতির সঙ্গে ('আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়') যদি তাঁরর প্রকৃত নাম ও ঠিকানা না থাকত (ভারতবর্ষের প্রতিটি থানাই ওই নাম ও ঠিকানা জানে), তাহলে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রাচীন জগদ্বন্ধু মন্দিরের পুরোহিত, মণ্ডিতমাথা, গলায় যজ্ঞোপবীত, শ্মশ্রুগুম্ফময় ও পরনে রক্তাম্বর শঙ্কর মহারাজ ওরফে শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়কে পুলিস দুরস্থান, আপনার পক্ষেও চেনা সম্ভব হতো না। অন্তত ছবি-টবি দেখে। তাহলে এই নামেই বেরতো সংবাদটা এবং শিরোনাম হতো ঃ পুরোহিতের মৃত্যু। বা আত্মহত্যা।

যাইহোক, ওই সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচিতির কারণে মৃতদেহ সনাক্ত করতে পুলিসের এতটুকু দেরি হবে না। হয়তো, ২২ জুনের মধ্যেই তারা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে অর্থাৎ পরদিন সংবাদ হয়ে ওঠার আগে ও মৃতদেহ সনাক্ত করতে মেদিনীপুর সদরে আপনাকে নিয়ে আসবে। কিন্তু পুলিসের এহেন তৎপরতায় আমি বিশ্বাস রাখি না আর ধরে নিতেও পারি না যে, ২৩ জুন সাতসকালেই খবরটি আপনার চোখে পড়বেই। তাই ওই দিন ভোরবেলা যত আগে সম্ভব ঝাড়গ্রাম থেকে টেলিফোন যোগে আমি খবরটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। এর দু-একদিনের মধ্যেই আশা করি পুলিস আমার বিষয়ে জানতে পারার আগেই আপনি এই পৃষ্ঠাগুলি রেজিস্ট্রি ডাকে পেয়ে যাবেন এবং পুলিসকে জানাতে পারবেন যে, আত্মহত্যা নয়, এটি একটি ঠাণ্ডা মাথার খুনের ব্যাপার এবং সেই হিমশীতল মস্তিষ্কধারিণীটিই বা কে।

আপনার এরকম কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক যে, আমি পুলিসকে না জানিয়ে কেন আপনার কাছে স্বীকারোক্তি করছি। শুধু স্বীকারোক্তিই যদি আমার উদ্দেশ্য হতো, তাহলে আমি নিঃসন্দেহে তাই করতাম। কিন্তু আমি জানাতে চাই, কেন এই হত্যা; আর সেটা জানাতে চাই শুধু আপনাকেই। তাই এই সুদীর্ঘ পথ-প্রতিবেদনটি আপনাকে না পাঠিয়ে আমার উপায় নেই।

২
মৃত্যুর আগেই' মৃত

আচ্ছা, প্রথমেই আমি আপনাকে জানাই আপনার স্বামীর নিরুদ্দিষ্ট হবার কারণটা কী, যেটা নাকি আপনার কাছে আজও একটা রহস্য। কাগজে দেখেছিলাম, পুলিসকে আপনি একাধিকবার বলেছেন, আপনাদের দাম্পত্য জীবন ছিল দৃষ্টান্ত স্বরূপ ('কোথাও কোনও খাদ ছিল না'); এবং স্বামীর জীবনাশঙ্কাও আপনি করেন না, যেহেতু রাজনীতি ছিল ওঁর পক্ষে হিন্দু গো বা মুসলমানের শূকর মাংসের মতন; তথা সামাজিক জীবনেও উনি ছিলেন

নিঃশত্রু। আপনার বিবৃতির শেষাংশটুকু ঠিক নয় মিসেস বেরা। বা, একেবারেই ভুল। তাঁর শত্রু, মর্মান্তিক দেরিতে হলেও, এখন আপনি বুঝতে পারছেন, অন্তত একজন ছিল।

হায়, করুণা হয় আপনার জন্য, মিসেস অদিতি বেরা, আপনি বিশ্বাস করুন। শিশু যেমন মাতৃস্তন্যকে, সত্যি আপনাদের মতো নিরাপত্তাপায়ী, সরলা গৃহবধূরা নিজ নিজ স্বামী সম্পর্কে কত কম খবর রাখেন, কত কম চেনেন তাদের, ভাবলে অবাক হই। ওর কেনা ফ্ল্যাট আমার নামে, ওর টাকাকড়ি যা—সাদা বা কালো—সব আমার, ব্যাঙ্কের ভল্ট আমার—ড্রাঙ্ক অর আদারওয়াইজ রোজ এসে আমার পাশেই তো শোয়। মাঝে মাঝেই সঙ্গম করে। আমি সতী। আমি ওর বিবাহিত স্ত্রী। অতএব? অতএব ও আমার! সতীন বলতে আবার যদি কেউ থাকে তো সে ইনকাম-ট্যাক্স, বা সি বি আই। কিন্তু হায়, প্রকৃত প্রস্তাব ঠিক এর বিপরীত। অন্তত আপনার স্বামী ডাঃ কৃষ্ণেন্দু বেরা এম আর সি ও জি, লন্ডন-এর ক্ষেত্রে।

কেননা, মিসেস বেরা, ডাঃ কৃষ্ণেন্দু বেরার ফ্ল্যাট টাকাকড়ি এসব আপনার হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণেন্দু 'ছিল' আমার। সত্যি কথা বলতে কী, কৃষ্ণেন্দুর বিনিময়ে ওগুলি ছিল (ওইসব ফ্ল্যাট-টল্যাট) আপনাকে আমার অনুকম্পা-ভরা উপহার মাত্র। ভিক্ষা ভাবলেও ভাবতে পারেন।

শুনে আকাশ ভেঙে পড়বে আপনার মাথায় যে, এই অবিবাহিতা পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়া, পত্রলেখিকা মাত্র ঊনিশ বছর বয়সে আপনার তখন অনুর্ধ্ব চল্লিশ স্বামীর সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে (আপনি যা পারেননি)—যদিও সে অঙ্কুর-হত্যায় প্রধান সহযোগী ছিল ফিটাসের 'বিবাহিত'-বাবা! দেখতে দেখতে চার মাসে পড়েছিল ও প্লাজেন্টা ফর্ম করে গিয়েছিল। তাই অতখানি অগ্রসর অবস্থায় গর্ভপাত কতখানি বিপজ্জনক হতে পারে জানার জন্য আলট্রা সোনোগ্রাফ করা হয়, আর তাই জানা গিয়েছিল, তারা ছিল যমজ এবং পুত্রসন্তান, আমি যদি অ্যাবোর্ট করাতে রাজি না হতাম, তাহলে তখনই আপনার নটেগাছটি মুড়তো, তাই নয় কি মিসেস বেরা? তাহলে তো, জোড়া প্যারাম্বুলেটর ঠেলে আমি এখন লেকে বেড়াচ্ছি আর সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের আকাশলীনার দশতলার বারান্দা থেকে আপনি সেই সুদৃশ্য উপভোগ করছেন। তাই নয় কি? আপনার চোখে বায়নাকুলার!

ম্যাডাম, আমি ওপরে লিখেছি, কৃষ্ণেন্দু 'ছিল' আমার। দোষ ধরবেন না ওই ক্রিয়াপদের, যদিও আমি আগেই জানিয়েছি, এই চিঠি লেখার সময় পর্যন্ত যে বেঁচে আছে। আসলে সে তো থেকেও নেই। কেন না আমি তাকে মৃত্যুর আগেই মেরে রেখেছি। এই চিঠি যখন আপনি পাবেন, তার বেশ ক'দিন আগেই, ২২ জুন ভোররাত্রির পর সে তো আর থাকবে না। আমার কাছে সে তাই এই মুহূর্তেই মৃত।

৩
আমিই সে

পত্রলেখিকাকে আপনি মোট তিনবার দেখেছেন। প্রথমবার দেখেন ১৯৮৬ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। তখন বিকেলবেলা। আপনার বড়দির বিবাহের ২৫ বছর উপলক্ষে আপনি সকালেই যোধপুর পার্কে চলে যান। কৃষ্ণেন্দুর রাত্রে যোগ দেবার কথা ছিল। জামাইবাবুকে উপহার দেবার জন্য নক্সাদার সোনার চামচটি আমিই পছন্দ করে আগের দিন কিনিয়ে দিই কৃষ্ণেন্দুকে। কিন্তু সেটি সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে যাবার দরুণ এবং ফোনে বারবার না-

পাবার কারণে আপনি সোজা চলে আসেন আপনাদের তৎকালীন মহেন্দ্র রোডের বাসায় ও বেল দিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকেই 'একি তুমি এখনও চেম্বারে যাওনি' বলে অপাঙ্গ দৃষ্টিপাত আপনাদের বাইরের ঘরের সোফায় ছোটখাটো, জড়োসড়ো, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী (আপনার স্বামীর মতো 'স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য'—বিশেষ মেয়েদের ক্ষেত্রে) যে মেয়েটিকে দেখতে পান, আমিই সে। একপলকের সেই একটু দেখা, আমাকে আপনার সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। তবে ঘটনাটি অবশ্যই মনে পড়ছে আশাকরি? অবশ্য, ততক্ষণে আমাদের শোবার ব্যাপার বার-দুই হয়ে গেছে। কেন না, পূর্ব ব্যবস্থা মতো আপনি বেরিয়ে যাবার ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আমি ওখানে।

যাইহোক, ক্যালকাটা ক্লাবে সেদিন রাতের রজতজয়ন্তী পার্টিতে স্বামীর কাছ থেকে আমার ও-হেন উপস্থিতির জন্য 'মেয়েটা কে গো' বা 'কী জন্যে এসেছিল' ধরনের একটা কৈফিয়ত নিয়ে নিলেই হবে এবং তা গ্রহণযোগ্য হতেও বাধ্য এমন আত্মবিশ্বাসে সোনার চামচের বাক্স হাতে, 'আটটার আগেই যাবে কিন্তু, ডিনার ঠিক ন'টায়', এত বলে আপনি ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যান। আপনার দিদি গাড়িতে বসে। তাড়াহুড়ো, তাই লক্ষ্য করেননি, টেলিফোনের রিসিভারটা ছিল নামানো আর সেই সকাল থেকেই।

এবং সেই যে প্রথমবার, তা নয়। তার আগে এবং পরে, আপনাদের পূর্বতন মহেন্দ্র রোডের ফ্ল্যাটে এবং অধুনা আকাশলীনাতেও আমি বেশ অনেকবার গেছি। বলা বাহুল্য, আপনি তখন নেই। ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ! মূক-বধির ও বিকলাঙ্গ শিশুদের সংগঠনটি নিয়ে আপনার উদয়াস্ত ব্যস্ততাই আপনাদের ফ্ল্যাটে আমার অবিরত যাতায়াতকে অর্নগল করে দিয়েছি। ঘটি-বাটি চুরির ভয়ে বাড়িতে রাতদিনের কাজের লোক নেই অথচ স্বামী খোয়া গেছে কবে, তার খবরই রাখে না, এমন গৃহিণীকে করুণা করা ছাড়া আর কী করা যায়, আপনিই বলুন তো মিসেস বেরা! অবশ্য মাঝে মাঝে যখন মনে পড়ে কী গভীর বিশ্বাস ছিল আপনার, আপনার স্বামীর বিশ্বস্ততায়, তখন দুঃখ ও হয় আপনার জন্য।

কিন্তু এখন তো স্রেফ হাসি পাচ্ছে। আচ্ছা, স্বামীকে এই যে এতখানি বিশ্বাস আপনার, এর লজিকটা কী বলতে পারেন? না-না, আমাকে নয়। আপনি নিজেকে বলতে পারেন? কৃষ্ণেন্দু আমাকে যা বলতো, ধৃষ্টতা মাপ করবেন, ম্যাডাম, আপনি নাকি মাসে এক কী বড়জোর দু'বার সেক্স হওয়াই যথেষ্ট মনে করেন এবং তাও শহিদসুলভভাবে? সন্তানাদি তো হলই না, কিন্তু এ কী সত্যি যে, আপনার কখনও অগার্জম হয়নি? আপনি নাকি জামাকাপড়ও সব খুলতেন না। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। বলুন, এরপরেও হাসি পাবে না? এ-সত্ত্বেও আপনি বিশ্বাস রাখতেন স্বামীর বিশ্বস্ততায়? হাসি আমি থামাই কী করে, আপনিই বলুন! দেখুন, এমন মানসিকতা খড়-গাদার কুকুরকে সাজে, যে যখন নিজে খেতে পারবো না, গরুকেও খেতে দেব না। মানুষের কী শোভা পায়? ছিঃ।

তবে, আকাশলীনায় খুব একটা যেতে হয়নি আমাকে, কারণ, ততদিনে জোকার কাছে একটি রিসর্টে মাসভাড়ায় ঘর ভাড়া নিয়েছিল কৃষ্ণেন্দু। কিন্তু মহেন্দ্র রোডের বাসায় বেশ বহুবার গেছি। বেডরুমে, আপনার নিজ হাতে পেতে-যাওয়া দামী বেড স্পেডগুলোর প্রায় প্রত্যেকটির ওপর শুয়েছি, জামাকাপড়ের সঙ্গে যাবতীয় লজ্জা মেঝেয় খুলে রেখেই, বলাবাহুল্য। কৃষ্ণেন্দু বলতো, শুধু নগ্ন হওয়াই যথেষ্ট নয়। মেয়েমানুষের সার্থকতা অপর ভূষণ লজ্জাও খুলে রেখে নগ্নতর হতে পারায়। অন্যথায় তারা যে যেখানে সার্থক হয়েছে হোক, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক তাদের সেইসব সফলতায়, শুধু তারা যেন বিছানায় না আসে। আর আপনি কিনা জামাকাপড়ই খুলতেন না সবগুলো! মাপ করবেন, এখানে লেখা থামিয়ে আমি আবার একচোট হেসে নিলাম।

আমি আর কৃষ্ণেন্দু কিন্তু ফর ইওর ইনফর্মেশন, শাওয়ার খুলে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থেকেছি, ওই মহেন্দ্র রোডের হাউস-ট্রি দিয়ে সাজানো, সাদা টালির বাথরুমে! আমি আদ্যোপান্ত সাবান মাখিয়ে দিয়েছি তাকে। আপনারা তো তখন থেকে 'হোয়াইট ডাভ' ছাড়া অন্য সাবান ব্যবহার করেন না, তাই না?

বিশেষত, বিছানা-ব্যবহারের আগে কৃষ্ণেন্দু প্রত্যেকবার একই কথা বলতো আমাকে যে, কোথায়, কী, কীভাবে রেখে গেছে ভাল করে দেখে নাও। ওর ওই শাড়িটা যেমন এলোমেলোভাবে রেখে গেছে, সেভাবেই থাকবে। পাট করে রেখো না যেন। ঘর ছাড়ার আগে তন্নতন্ন করে দেখা হতো আমার দরুণ কোথাও কিছু পড়ে রইল কিনা। একটা হেয়ারপিন কী একটা ছেঁড়া বোতাম। ঠিক যেন খুনীরা বেরিয়ে যাচ্ছে খুন করার পর, প্রমাণ না রেখে। মাত্র একবারই একটা প্রমাণ হাতে এসেছিল আপনার। আপনার মনেও পড়বে। মেঝে থেকে একটা টিপ তুলে আপনি জানতে চান কৃষ্ণেন্দুর কাছে, যে, সেটা কোথা থেকে এল। যার উত্তরে কৃষ্ণেন্দু 'ওসব টিপ-ফিপের আমি কী জানি', বলে একটা প্রতি-প্রশ্ন জুড়ে দেয়, যে, আপনাদের পার্ট-টাইম রাঁধুনি মালতির হতে পারে নাকি? যার উত্তরে আপনি অবাক হয়ে বলেন, 'কিন্তু এতো শিল্পার টিপ। বেশ দামী। মালতির হবে কী করে?'—মনে পড়ে কি আপনার? ব্যাপারটার ঐখানেই ইতি হয় যদিও। বা, ঠিক ঐখানে নয়। তারও পরে, যখন হোটেল রাতদিনের লবিতে আমরা দু'জনে 'এন্ডলেস স্টোরি' (ককলেট একটা) খাচ্ছি, তখন যখন চাপা গলায় হাসতে হাসতে আমি কৃষ্ণেন্দুকে বলি, 'আমি যদি খুন করি কখনও', ওর ওদিকে তর্জনী তুলে দেখিয়ে, 'তোমাকে, তারও কোনও প্রমাণ থাকবে না।'

আপনাকে এত কথা সবিস্তারে জানানোর উদ্দেশ্য একটাই। আমার আইডেনটিটি প্রতিষ্ঠা করা। আশাকরি, এতক্ষণে নিঃসন্দেহ হয়েছেন।

৪
কেন নিরুদ্দেশ

আপনার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিলেন কেন, আপনি তা জানেন না। কিন্তু আমি জানি। আসুন, এবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক।

আমার স্বামী রজত আত্মহত্যা করে ১৯৯০ সালের ৭ জানুয়ারি। এর বিস্তৃত বিবরণে আমি যাব না। কেননা, সেকথা এই কাহিনীর পক্ষে অবান্তর। কৃষ্ণেন্দুর নিরুদ্দেশ হওয়ার সঙ্গে রজতের আত্মহত্যার সম্পর্ক যেটুকু, শুধু সেটাই প্রাসঙ্গিক। আপাতত, শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, রজত আত্মহত্যা করেছিল শেষ রাতে বাথরুমে ঢুকে। সে রান্নাঘরে ঢুকে গ্যাসে জল গরম করেছিল্। এবং রিস্ট কেটে হাতে ডুবিয়ে রেখেছিল জলে। না, বাথরুমে দরজা সে বন্ধ করেনি। ভোরে উঠে ম্যাডক্স স্কোয়ারে জগিং করতে যেত রোজ। আমি ভেবেছি তাই। বাথরুমের দরজা ঠেলে হঠাৎ—যাক সেকথা।

আমার দাদা তখন মেটিয়াবুরুজ থানার এ এস আই। খুব কিছু ঝামেলা হল না। যদিও পোস্টমর্টেম হয়ে বডি পেতে ৮ জানুয়ারি বিকেল হয়ে গেল। ৯ জানুয়ারি সকালে কৃষ্ণেন্দুকে আমি চেম্বারে ফোন করলাম। পেলামও। বললাম, আমি আসছি। ও যেন থাকে। দাদার সার্ভিস রিভলবার থাকে আলমারিতে। লোড করাই থাকে। রিভলবার চালানো আমি শিখি দাদার কাছে, বাবা-মা'র সঙ্গে চাঁদিপুরে বেড়াতে গিয়ে। তখন স্কুলে

পড়ি। একমাত্র বোনকে দাদা তখনই উদয়-সূর্যের দিকে তাক করে রিভলবার ছুঁড়তে শিখিয়ে দেয়।

চেম্বারে কৃষ্ণেন্দু ছিল না। বুঝলাম, কাগজে রজতের খবরটা সে পড়েছে। পরের দিন সকালে আমি আকাশলীনায় গেলাম। আপনি বললেন, একটু আগে নার্সিং হোমে চলে গেছে। এমারজেন্সি। আমি অবিশ্বাস করলাম না। কারণ, ট্যাক্সিতে হাজরা পেরোবার সময় যে গাড়িটা হুস করে বেরিয়ে গেল, সেটা ছিল কৃষ্ণেন্দুর ফিয়াটের মতোই। আমি ট্যাক্সি ঘোরাবার কথাও ভেবেছিলাম। তখন আমার হ্যান্ডব্যাগে রিভলবারটা ছিল, যখন আপনার কাছে যাই। কিন্তু, সে আপনি জানবেন কী করে। কিছু নদী আছে যাতে জোয়ার-ভাটা খেলে না। কিছু মুখ আছে যাতে অভিব্যক্তি ধরা দেয় না। সমস্ত খুনীর মুখ সেরকম।

সেই প্রথম আপনি আমাকে খুঁটিয়ে দেখলেন। এবং অনেকক্ষণ ধরে। জানতে চাইলেন, আমি কে এবং কেন এসেছি। আমি বললাম, আমার মা ওঁর পেসেন্ট। এবং আমাদেরও এমারজেন্সি। আপনি নার্সিং হোমে ফোন করলেন কিছুক্ষণ পরে। আমি বসে থাকলাম। নার্সিং হোম আপনাকে জানাল, উঁনি সেখানে যাননি। এবং সেদিন ওঁর যাবার কথা নয়।

'কোথায় গেল বল তো?' আপনি আমার কাছেই জানতে চাইলেন। অন্তত আমার দিকে চেয়ে। যদিও একেবারে মনহীন আর শূন্য ছিল আপনার চাহনি।

আমি কিন্তু ততক্ষণে বুঝে গেছি, কৃষ্ণেন্দু টের পেয়েছে আমি তাকে খুঁজছি। এবং কেন। দাদার রিভলবারের অস্তিত্বের কথা তার অজানা নয়। আমি বেশ বুঝতে পারলাম, কৃষ্ণেন্দু পালাচ্ছে এবং আমার থেকে।

পরদিন ফোন করে জানলাম, রাত্রে সে বাড়ি ফেরেনি এবং সর্বত্র খোঁজ নিয়ে, না পেয়ে, থানায় খবর দেওয়া হয়েছে। তারপরের তিন বছরের কথা তো আপনার জানা। নিরুদ্দেশ কলমে ডাঃ কৃষ্ণেন্দু বেরার ছবির পর ছবি বেরুল। ভারতবর্ষের সমস্ত টিভি কেন্দ্র থেকে তার ছবি দেখানো হল। সমস্ত থানায় তার ছবি গেল। এমনকি বিদেশেও খোঁজখবর করা হতে লাগল। বিশেষত লন্ডনে। যেখানে সে দু'বছর ছিল। কৃষ্ণেন্দুর খোঁজ পাওয়া গেল না।

৫
সম্পত্তি সমর্পন

রজতের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ৮৮-র গোড়ার দিকে। মাল্টি-ন্যাশনাল লাইকাল্যাব কোম্পানির মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টটিভ, সুদর্শন ছেলেটির সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। রজতের ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলার নেই। শুধু এই যে আমার সেই সমান্তরাল মেলামেশা কোনও গোপন ব্যাপার ছিল না। এটা ঘটেছিল কৃষ্ণেন্দুর জ্ঞাতসারেই, এমন কি, তার অভিভাবকত্বে। শুরুতে ওর সঙ্গে প্রেমের অভিনয়ই করতাম আমি। কিন্তু বছর ঘোরার আগেই দেখলাম সরল ও স্বাস্থ্যবান (এবং সুদর্শন) ছেলেটি আমার প্রেমে পাগল। এবং, আমিও নিজের মনের ভুলে কখন যে ভালবেসে ফেলেছি তাকে! আমার এই উভয়-সঙ্কটে কৃষ্ণেন্দু যে উদারতার পরিচয় দেয়, তা ভুলতে পারি না। আমাদের মিলনের পথে বাধা হওয়া দূরে থাকে, সে কিনা এগিয়ে এল সর্বতোভাবে সাহায্য ও সমর্থন করতে, আমারই ভবিষ্যতের কথা ভেবে! আমার উপর সব দাবি সে ছেড়ে দিচ্ছে, বুকে জড়িয়ে ধরে সে আমাকে জানায়। কথা হয়, আমি রজতকে বিয়ে করব। এবং বিয়ের পর

আমাদের কোনও যোগাযোগ থাকবে না। অন্তত আমার সন্তান জন্মাবার আগে। বিয়ের বনেদ পাকা হবার পর, ভাল বুঝলে আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। যদিও আমাদের সে নতুন সম্পর্কে পূর্বমেঘের ছায়াটুকুও থাকবে না, কৃষ্ণেন্দু আমাকে জানায়।

৮৮ সালে অক্টোবরে রজত ও আমার বিয়ে হল খুব ঘটা করে। সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের প্যারিস হলে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা পাঁচশো ছুঁয়েছিল। ছন্নছাড়া বোনের মতিগতি ফিরেছে দেখে সব থেকে খুশি হয়েছিল দাদা। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণেন্দু ছায়া মাড়ায় নি।

তবু এ-কথাও সত্যি যে তার প্রতি আপনার সীমাহীন কৃতজ্ঞতাবশতই বিয়ের এক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত আমি কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে গেছি। সমস্ত খুঁটিনাটি সে জেনেছে। সব রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব পেরিয়ে যেতে সে আমাকে সাহায্য করে গেছে। আমি কি বিয়ের আগে রজতের কাছে আমাদের সম্পর্কের কথা বলব? যে আমার স্বামী হতে যাচ্ছে—এমন একটা গুরুতর বিষয় গোপন রাখার ভার আমি সারাজীবন বইবো কী করে? উত্তরে গীতা থেকে একটি শ্লোক উচ্চারণ করে (কর্ম-যোগ অধ্যায়ে শ্লোকটি আমি পড়েও ছিলাম) কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, কিছুই জানতে পারবে না রজত। কিছু জানতে চাইবে না। কাম হল সেই ধোঁয়া যা অগ্নিকে ঢেকে রাখে। সেই মল যা দর্পন ঢেকে রাখে। কোনও ছায়া সেখানে পড়তে দেয় না। তুমি সেই পাঁক ঘাঁটিয়ে ওকে পাতালে নিয়ে যাবে! কৃষ্ণেন্দু বলেছিল।

আমাদের সম্পর্কের আমরা কোনও প্রমাণ রাখিনি। কোনও চিঠিপত্র দিইনি। রাস্তাঘাটে ক্বচিৎ হেঁটেছি। হাঁটলেও আগে-পরে। সিনেমা হলের লবিতে অচেনার মতো দাঁড়িয়ে থেকেছি। দেখা হয়েছে অন্ধকারে। যখন আমি বা কৃষ্ণেন্দু এ ওর পাশে গিয়ে বসেছি। শুধু একবার জোকায় কৃষ্ণেন্দু আমার এক রিল ন্যুড ছবি তুলেছিল। তখন তো প্রতিপদের চাঁদ হয়েও রজত দেখা দেয়নি দিগন্তে। ওর কোনও আবদারেই রাজি না-হবার কোনও কারণ তখন ছিল না। ঐ যে বলেছি আপনাকে আগেই, সেই অপর ভূষণ ত্যাগ করার কথা। তবু, ক্ষীণ আপত্তি যে করিনি তা নয়। ফ্ল্যাশের পর ফ্ল্যাশ দিয়ে সে আমাকে উল্টে-পাল্টে শুইয়ে বসিয়ে দাঁড় করিয়ে পুরো চব্বিশটি ছবি তুলল।

আমি ভুলেই গিয়েছিলাম সে কথা। বিয়ের সাতদিন আগে আমাদের শেষ দেখা ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটা চিনে রেঁস্তোরায়। হৌ-হুয়া। কৃষ্ণেন্দুর প্রিয় জায়গা। কেবিনে বসে আমার সামনে সেই চব্বিশটি ছবি সে কুটি কুটি করে ছিঁড়ল। এমনকি নেগেটিভগুলো। এবং বাথরুমে ফেলে এল। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু কৃষ্ণেন্দু ভোলেনি।

তারপর অভিভূত আমাকে শেষবারের মতো সে নিয়ে গেল সদর স্ট্রিটের ফেয়ারলন হোটেলে। আমার ধারনা ছিল, ওকে যা দেবার আমি সব দিয়েছি এবং তার বেশি কিছু দেওয়া যায় না। কিন্তু আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, একজন পুরুষকে সর্বস্ব উজাড় করে দেওয়া বলতে কী বোঝায়, আমি সেই একদিন, সেই একবার প্রথম বুঝি। অমন অভিজ্ঞতা এক জীবনে দু'বার হয় না, কোনও মেয়ের।

৬
দা ইয়ালো হ্যাণ্ডকারচিফ

বিয়ের পর কৃষ্ণেন্দু কিন্তু কথা রেখেছিল। পথে-ঘাটে হঠাৎ মুখোমুখি হবার তো কথা নয়। ওর যাতায়াত গাড়িতে। যাতায়াতের পথে, গাড়ির সানগ্লাসের ভেতর দিয়ে যদি কোনওদিন

দেখেও থাকে, কখনও গাড়ি থামায়নি। এগিয়ে আসেনি।

ওর ওপর পুরোপুরি আস্থা আর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও, আমি তবু কয়েকটি সাবধানতা অবলম্বন না করে পারিনি। কেন না, আমি জানতাম, এসব আসলে অদ্ভুত আবেগের ব্যাপার, জ্যামিতির ব্যাপার। যার প্রতিটি উপপাদ্য শুরু হয় 'ধর' দিয়ে। যেমন ধরুন, 'ধর, ABC একটি বিষমবাহু ত্রিভুজ'। প্রগলভতা মাপ করবেন, কতদূর, প্রায় অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখে নিয়ে, আমি এইসব পদক্ষেপ নিই, তা বোঝার সুবিধে হবে বলেই আমি জ্যামিতির উপমাটি দিলাম। প্রায় হুবহু একই গল্পে ওর কবি-বন্ধু দিলীপ সেনগুপ্ত ঘাটশিলায় চলে যায় এবং নিজের ভাগ্নির ফুলশয্যার রাতে সুবর্ণরেখার ধারে আত্মহত্যা করে, তা আপনার অজানা থাকার কথা নয়। আমি ভেবেছিলাম, হয়ত সেই কথাই ওর মনে পড়ছে যখন কৃষ্ণেন্দু আমাকে অনেক আগে থেকে বলে রেখেছিল, "তবে তোমার বিয়ের দিনটা কবে, তা আমাকে বলবে না। আমি ওটা জানতে চাই না।" বিসমিল্লায় যদি গলদই না থাকবে, তাহলে বলবে কেন-ও-কথা, আপনিই বলুন। আমি বলিওনি।

সতর্কতা বলতে, রজতের সঙ্গে সেই সব রেস্তরাঁ বা হোটেলে আমি কখনও যাইনি, যেখানে, অন্তত, একাধিবার কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে গেছি। আমার শ্বশুরবাড়িও ছিল নির্ভেজাল মুসলিম পাড়ায়, সার্কাস রেঞ্জে একমাত্র হিন্দু পরিবার, মুসলিম রমনীর গর্ভে হিন্দু ভ্রূণের মতো। ওদিকে আমাদের চেনাশোনা কেউ তো বড়-একটা যায় না। এ-ছাড়া, বিয়ের পর, আমি কদাচিৎ রাস্তায় বেরিয়েছি, যখন রজত পাশে নেই। সেও একটা সতর্কতা। অন্তত, একটা প্রাথমিক বাধা তো বটেই, কৃষ্ণেন্দুর এগিয়ে আসার পক্ষে, সর্বক্ষণ আমার পাশে রজতের এই উপস্থিতি! এরপরেও যদি উল্টো-সিধে কিছু করে বসে, সে রজত দেখবে। তার সঙ্গে মাত্র একটি রাতের অভিজ্ঞতাই, আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য আমার পাশে আর কেউ নেই, হতে পারে না। হাজার বছরের সংস্কার এখানে কাজ করছিল, আপনি বলতে পারেন। কিন্তু, বিশ্বাস হচ্ছে বিশ্বাস। সকল চক্ষুস্মনতার মধ্যে বিশ্বাস হল কেন্দ্রীয় সহ্যত্ব। তাকে কে অস্বীকার করবে?

কিন্তু, রজতের কথা আমার চিঠিতে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। আমার এ-পাপের গল্পে তার নাম মনে আনতে গেলেও তাকে অপমান করা হয়; আমার অস্তিত্ব টলে যায়, আগুন হয়ে সে ঘিরে ধরে আমাকে। জ্যোৎস্নায়, সুবর্ণরেখা-তীরে, গায়ে পেট্রল ঢেলে কবির মৃত্যু সেওতো রজত—ও-হো-হো, সেও কি ভাবতেও পারা যায়? ঐ দেখুন, আমার মন আমাকে ছেড়ে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে!

ও, রজত! হায়, রজত!

প্রায় আধঘন্টা পরে আবার লিখতে বসেছি। কাঁদছিলাম, ভাববেন না যেন মিসেস বেরা। সে বাঁদীই আমি নই। আমি এক গ্লাস জল খেতে গিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, সতর্কতার বিষয় কী যেন বলেছিলাম আপনাকে? ও-হ্যাঁ। হ্যাঁ। মনে পড়েছে। যা বলছিলাম। বিপদ যে বাড়ির বাইরে শুধু, তা তো নয়। যেমন ধরুন, কৃষ্ণেন্দুর দেওয়া সব উপহারই আমি নষ্ট করে ফেলেছিলাম। শুধু সোনা বলে, আর বড় প্রিয় বলে আমার কানের টপটা ফেলেনি। কিন্তু রজত যেদিন বলল, "ওটা কি মুক্তো?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।" রজত বলল, "অত বড়?" আমি বললাম "হ্যাঁ"। কিন্তু রজত যখন জানতে চাইল, "আসল?"—সে তো তখন ওটা ছুঁয়ে। আপনি কি অনুমানও করতে পারে মিসেস বেরা, সে তখন কী ছুয়েছিল আর কাকে ছুয়েছিল? তার পুণ্য এসে ছুঁয়েছিল আমার পাপকে। তার বিশ্বাস এসে ছুঁয়েছিল আমার বিশ্বাসঘাতকতাকে! শিউরানিতে গা আমার নরম হয়ে এল। আমি কাঁপতে কাঁপতে নেতিয়ে পড়লাম তারই গায়ে।

বুঝতেই পারছেন, আমি ততদিনে রজতকে ভালবেসে ফেলেছি। 'ভালবেসে ফেলেছি' একটা কথার কথা, মিসেস বেরা। কিন্তু, বিশ্বাস করুন 'ওর মধ্যে হারিয়ে গেছি' কথাটা তা নয়।

ততদিনে আমি যুবক স্বামীর প্রেমাসক্তা পত্নী; বিপত্নীক শ্বশুর-পিতার একমাত্র পুত্রবধূ ও কন্যা; দুই দেওর ও পুঁচকে ননদের বৌদি। এ-ছাড়া, নিকট আর দূর-সম্পর্কের দিক থেকে মাসি-পিসি আর খুড়ি আমি কত জনের যে। মায়, মাতৃসমা ওর এক খুড়তুতো দিদির দৌহিত্রের রাঙা-দিদা!

কিন্তু এত সতর্কতা, এত নিরাপত্তা সবই যে চোরাবালি, তা কে জানত।

১৯৮৯-এর নভেম্বর মাস। ৪ তারিখ। গ্লোবে 'দা ইয়ালো হ্যান্ডকারচিফ' ছবিটা দেখতে গিয়েছিলেন, মনে পড়ে? আমাদের ঢুকতে দেরি হয়েছিল। ড্রেস সার্কেলে একদম পিছনের সিটে যে আপনারা, জানব কী করে? রজত আমাকে হলের মধ্যে দু'বার চুমু খেল। দ্বিতীয়বারের দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্যে দুর্ভাগ্যক্রমে আমিই দায়ী। ইন্টারভেলে যা বোঝার বুঝলাম। নইলে দুর্বলতা প্রকাশ পাবে বলে, অকারণে, রজতের অত্যন্ত মানডেন কথাগুলোর উত্তর দিতে লাগলাম হেসে হেসে। বরং, কৃষ্ণেন্দুই বাইরে গেল আপনাকে রেখে।

ছবিটা ছিল হট। ফুটন্ত না হলেও অন্তত ঈষদুষ্ণ। বিশেষত দ্বিতীয়ার্ধটা? কিসিং, মুচিং, হুপিং—কী যে ছিল না। একের পর এক নৈশ বিছানা দৃশ্য। তার ওপর নাইট শো। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কৃষ্ণেন্দুর উপস্থিতির কথা ভেবে, আমি প্রথমটা যথেষ্ট বাধা দিয়েছিলাম, কিন্তু, ও তো শুনল না। বোতাম ছিঁড়ে ও আমার ব্লাউজ খুলল। দেখুন, আমাদের নতুন বিয়ে। থ্রি-এক্স-ছবি। এ অস্বাভাবিক নয় কিছু। আপনার মতন আর্য প্রয়োগ বাদে, আমি বলছি আপনাকে, এ-হেন যৌবন-দোষে প্রায় সব নতুন স্বামী-স্ত্রীই দোষী। কিন্তু, কৃষ্ণেন্দুর নাকের ডগায় প্রায় আধঘন্টা ধরে এ-সব....ছবি শেষ হবার আগেই শরীর খারাপের অজুহাতে আমি হল থেকে বেরিয়ে এলাম ওকে নিয়ে।

সুদীর্ঘ আট মাসের মধ্যে যা করেনি, কৃষ্ণেন্দু তাই করল। সে আমাকে ফোন করল।

"আট মাস হল তোমার বিয়ে হয়েছে। একদিনও কী ডিসটার্ব করেছি?"

"এটা অফিসের ফোন। মাঝখানে অপারেটর আছে।"

"তুমি একবার এসো।"

"না।"

"একদিনের জন্যে এসো?"

"আমি। যাব। না।"

আমি ফোন রেখে দিলাম।

তারপর নভেম্বর মাস জুড়ে প্রায় রোজ ফোন। অপারেটর বন্দনা সেন আমার চেনা। বলে দিলাম আমাকে কোনও আউট-কল না দিতে। কিছুদিন।

ডিসেম্বরের শেষাশেষি আমার মাত্র একটি ছবি সে রজতকে ডাকে পাঠাল। বুঝলাম, আমার সামনে রিল নষ্ট করলেও ছবি ছিঁড়ে ফেললেও, কমপক্ষে একটি ছবি তার কাছে ছিল। রজতের অফিস ডেজিগনেশান সবই জানত কৃষ্ণেন্দু। আমি তো পুরোপুরি বিশ্বাস করেছিলাম ওকে। সবই বলেছিলাম। আমাদের বিয়েতে মন্ত্রোচ্চারণ অন্যে করলেও কৃষ্ণেন্দু ছিল একাধারে প্রকৃত সম্প্রদানকর্তা ও প্রধান পুরোহিত। যদিও নেপথ্যচারি।

কিছু না বলে, রজত আমাকে কাছাকাছি দীঘায় নিয়ে গেল। ছবি দেখাল না, এত ভদ্র। কিন্তু, ছবির কথা তুলল। ভয়ে নীল হয়ে গেলাম আমি। আমি আর দেরি করলাম না।

আমি সব বললাম ওকে। আমি ওর হাঁটু জড়িয়ে ধরলাম। বিশ্বাস করবেন আপনি? রজত ক্ষমা করল আমাকে। কী বলল জানেন? বলল, "আমি তোমাকে বিয়ে করেছি রুচি, তোমার কৌমার্যকে নয়।" মনে হল ভগবান আছেন। বা, সে নিজেই সেই নরনারায়ণ।

তারপর....শেষ রাতে বাথরুমে ঢুকে সে যা করল, আপনাকে আগেই জানিয়েছি। সব কাগজে প্রথম পাতার খবর হয়েছিল।

৭
আঁধারের অনুসরণ

এর পর আপনাকে সমগ্র দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের এক সুদীর্ঘ কাহিনী শোনাতে হয়—যদিও কাহিনী অংশ খুবই ছোট্ট আর হয়তো দু'টি মাত্র শব্দ ব্যবহারেই তা সম্পূর্ণ হয়ে যায় এবং তা হল : কোথায় কৃষ্ণেন্দু? আপনার ধারণা, খোঁজখবর পুলিসই যেটুকু যা করার করেছে, কিন্তু তা ঠিক নয়। তাদের কাজ থানায় ছবি পাঠিয়ে দেওয়া আর রেডিও-টিভিতে বিজ্ঞাপন দেবার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। কৃষ্ণেন্দুকে খুঁজে বের করার জন্য প্রকৃত চেষ্টা করি আমি আর আমার দাদা মুক্তিনাথ মুখার্জি, এ এস আই। একবার শুনলাম, হৃষিকেশ আনন্দময়ী আশ্রমে সে। কাতরাসগড়, বড়জামদা, নোয়ামুণ্ডি এইসব কাছাকাছি জায়গা থেকেও তার খোঁজ আসতে লাগল। একবার খবর এল বোম্বের কুখ্যাত ধারাবি বস্তি থেকে। তার নাকি এইডস হয়েছে। সর্বত্র গেলাম আমরা।

সুত্রাদি বলে অযথা সময় নষ্ট করবো না। প্রায় দু'বছর ধরে হারিয়ে যাওয়া কৃষ্ণেন্দুর শেষ নির্ভুল খবর আনলো দাদাই। তিন মাসের ছুটির দরখাস্ত দিয়ে ও করমণ্ডলের দুটি টিকিট কেটে এনে দাদা বলল, 'আজই মাদ্রাজ যেতে হবে।' পুজোর ছুটি চলছে। অনেক কষ্টে এমার্জেন্সি কোটা থেকে দাদা রিজার্ভেশন পেয়েছে। ছুটি নিতে নিতে ততদিনে দাদার আর্নড লিভ, মেডিকেল সব শেষ। তখন হাফ-পে পাচ্ছে।

ছ'টি বুলেট বের করে, আবারপুরে, সেফটি খুলে ও বন্ধ করে, রিভলবারটি সুটকেশে জামাকাপড়ের নিচে রেখে দাদা বলল, 'ম্যারিনা বিচের কাছে ওয়ালাঝা রোড। ওখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের ইয়ুথ হোস্টেল। ডাক্তার সেখানে। একদম পাকা খবর। বিকেলবেলায় ট্রেন ধরে, লেট হবার দরুন, পরদিন রাত ন'টা নাগাদ হোস্টেলে পৌঁছে ওয়ার্ডেনকে দাদা কৃষ্ণেন্দুর ছবি আর নিজের আইডেনটিটি কার্ড দেখাল। ছবি দেখে ওয়ার্ডের পরমেশ্বরম বললেন, 'ইয়েস। মিস্টার সাততেন সানিয়াল। বাট হি হ্যাজ চেকড্ আউট দিস ভেরি মর্নিং।'

এরপর শুরু হল 'সত্যেন সান্যাল'কে খুঁজে বের করার জন্য সেই কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত তোলপাড় করার তিনমাসব্যাপি দীর্ঘ কাহিনী। ইয়ুথ হোস্টেলের ছাদে মাদ্রাজের একমাত্র মাছ-ভাত খাবার জায়গা। বৈদ্যবাটি থেকে শঙ্কর নেত্রালয়ে গ্লুকোমা দেখাতে এসেছেন নীহার চৌধুরী। আমাদের টেবিলেই' খেতে বসেছিলেন। বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সত্যেনবাবু। চার নম্বর ঘরে প্রায় একমাস ছিলেন। ট্রিটমেন্ট করাচ্ছিলেন অ্যাপোলোয়।' আর একজনের কাছে জানা গেল, সত্যেন সান্যাল তিরুপতি যাবার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছেন তাঁর কাছে।

দাদা যা বলেছিল। পরদিন ভোরবেলা টি টি ডি সি-র আন্নামালাই রোডের অফিসে যেতে সত্যেন সান্যালের গতিবিধি সহজেই জানা গেল। কাউন্টার ছেলেটি ছবি আর

রেজিস্টার দেখে বলল, সাতদিনের প্যাকেজ ট্যুরে একজনই বাঙালি ভদ্রলোক কাল দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে গেছেন। তাঁর নাম বিমল বসাক। ছবির সঙ্গে তাঁর মিল আছে। তিরুপতি অন্য ট্যুর। তাতে কোনও বাঙালি যায়নি।

মিনিট পনের পরে ওই একই ট্যুরে বাস যাচ্ছে শুনে দাদা টিকিট আছে কিনা জানতে চাইল। ভাগ্যিস, চারজনের একটি পার্টি টিকিট ক্যানসেল করেছে। আমরা দুটি সিট পেয়ে গেলাম।

প্রথম হল্ট শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে। টানা ৮ ঘন্টার জার্নি। বাস যখন ম্যারিনা বিচ ধরে যাচ্ছে, এই প্রথম আমার সঙ্গে কথা বলল দাদা। দাদা বলল, 'পুলিসকে দোষ দিস কেন? যে লোক ঘন্টায় ঘন্টায় নাম বদলায় আর একদিনের জন্যে তিরুপতি যাবে বলে যায় সাতদিনের জন্যে দক্ষিণ ভারত ট্যুরে....' দাদা চুপ করে গেল।

তামিলনাড়ু ট্যুরিজম-এর এই ট্যুরগুলোয় সারাদিন ধরে বাস ছোটে—এক একটা মন্দিরে নিয়ে যায়—তারপর সে-রাত্রির জ্য টি টি ডি সির হোটেলে রাখে। পরদিন ভোরে আবার বেরিয়ে পড়ে। তিরুচিরাপল্লী, শ্রীরঙ্গম, মাদুরাই, সুচিন্দ্রম, তিরুভেন্দর, তাঞ্জাভুর, রামেশ্বরম—আমরা যেখানেই পৌঁছাই, 'বিমল বসাক'-এর হদিশ পাই। কিন্তু সর্বত্র থেকে সেদিনই সকালে সে বেরিয়ে গেছে।

এ-যেন ফিজিক্সের সেই মাসহীন অ্যান্টি-পার্টিকেলের হালচাল, যার অস্তিত্বের কথা সবসময় জানা যায় সে 'ছিল' বলে। তাকে কখনও বর্তমান অবস্থায় ধরা যায় না।

কন্যাকুমারীতে পৌঁছে, চিদাম্বরমের বিখ্যাত নটরাজ মন্দিরের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে দাদা আমাকে বলল, 'আমরা বাস ছেড়ে দিয়ে একটা টাক্সি নেব আর রাতারাতি নেকস্ট হল্ট কোদাইকানালের হোটেলে পৌঁছে যাব। টি টি ডি-র হোটেলেই তো থাকবে। কুত্তার বাচ্চাকে ভোরের বাসের ওঠার আগেই পেয়ে যাব।'

ট্যুর-বাস কন্যাকুমারিকা থেকে যায় ত্রিবান্দমে। সেখানে একদিন থাকে। ফিরে কোদাইকানাল। যারা ত্রিবান্দাম যাবে না, তারা ইচ্ছে করলে কন্যাকুমারিকায় দু'রাত্রি থাকতে পারে। দিনটা ছিল কোজাগরী পূর্ণিমার রাত। ঐ দিন সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় একই সঙ্গে দেখা যায় বঙ্গোপসাগর, 'ভারত মহাসাগর আর আরব সাগরের মিলন-মোহনায়। এ-দৃশ্য নাকি পৃথিবীর নয়, স্বর্গের। আরও ক'জন ট্যুরিস্টের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু তাই থেকে গিয়েছিল। সে ত্রিবান্দাম যায়নি জেনে আমরা এইরকম অনুমান করলাম। ঠিক হল, সন্ধ্যার সাগরবেলায় তাকে খুঁজে বের করা হবে। না পেলে, হোটেলের ২০৪ নং রুম তো আছেই, যেটা তাকে দেওয়া হয়েছে। যেখান থেকে সে বেরিয়ে গেছে দুপুরে।

'কুকুরে মতো যাকে আস্তাকুঁড়ে মারার কথা' ফের গুলিগুলো খুলে দেখে নিয়ে চেম্বারে পুরতে পুরতে দাদা বলল, 'সেই কুত্তা, কামিনে কিনা মরবে তিন সমুদ্রের মোহনায়? যখন', বলতে গিয়ে দাদা গুলিয়ে ফেলল, 'যখন সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত একসঙ্গে।'

'ওঃ হো। হোয়াট এ গ্রান্ড ফিনালে ফর আ পারিয়া ডগ!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাদা বলল। দাদার বুকের উত্তাল ওঠা-নামা দেখে মনে হয়, একটি সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটে চলেছে যেন। তাঁর দাঁতের পাটি জিঘাংসায় কচকচ করে ওঠে, আমি শুনতে পাই।

দেখা হয়ে গেল, কিন্তু বিকেলবেলাতেই। যখন সমুদ্রের বুকে ঢেউ তুলে বিশাল স্টিমারে আমরা বিবেকানন্দ শিলায় যাচ্ছি আর কৃষ্ণেন্দু ফিরছে। দোতলায় খোলা ডেকে, ড্রাইভারের কেবিনের পাশে সে একা দাঁড়িয়ে ছিল। একদম পাশাপাশি দু'টি স্টিমার। ওর স্টিমারের ঢেউ আমাদের স্টিমারের ঢেউকে ধাক্কা মেরে লাফ দিয়ে উঠলো প্রবল সংঘর্ষে।

আমরা দেখলাম, কৃষ্ণেন্দু আমাদের দেখছে। অপরাহ্নের রক্তাভ রোদ এসে পড়েছে তার মুখে চোখে। তাকে স্পষ্ট দেখা গেল। এমনকি নিজের মনের ভুলে, সে একবার ডান হাত তুলে উইশও করে ফেলল আমাদের। অটোমেটিক অতি-আধুনিক আমেরিকান মেসিন। এবং রেঞ্জের একেবারে বাইরে ছিল না সে।

বুম-বুম-বুম। বুম-বুম। বুম। দাদার হাতে রিভলবারের চেম্বার খালি হয়ে গেল।

কিন্তু, তার অনেক আগেই কৃষ্ণেন্দু শুয়ে পড়েছে।

এরপর তিনমাস ধরে সারা দক্ষিণ ভারত তোলপাড় করে আমরা আরও দু'বার তার সংস্পর্শে আসি। একবার সিচাভরমে। আর একবার মীনাক্ষী মন্দিরের পশ্চিম গো-পুরমের ঠিক সামনে।

কিন্তু গুলি করার সুযোগ সে আর দেয়নি।

৮
নিয়তি কে ন বাধ্যতে

সাউথ ইন্ডিয়া থেকে ফেরার পর প্রায় বছর ঘুরতে চলল, কৃষ্ণেন্দু সম্পর্কে আর কোনও খবর নেই। কিন্তু তা বলে আপনার মতো আমি হাল ছেড়ে দিইনি, মিসেস বেরা। একটি মুহূর্তের জন্যও নয়। আপনি জানেন, কৃষ্ণেন্দু রোজ সকালে আপনাদের পারিবারিক নারায়ণ শিলার সামনে কুশাসন পেতে গীতা পড়ত। গীতার, বিশেষত, একাদশ অধ্যায়টি ছিল তার কণ্ঠস্থ। সে আমাকে আর একটি শ্লোকের কথা বলেছিল :

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব।
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন।

যা নাকি পরান্মুখ অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে। যে, কাকে কাদের মারতে দ্বিধাগ্রস্ত তুমি! ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ আর্থ! আমি তো ওদের আগেই মেরে রেখেছি। তুমি এদের মৃত্যুর নিমিত্তমাত্র হও। তারপর বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন।

সে যে খুন হবে এবং আমার হাতে, এতে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না কখনও। সমস্ত যুক্তি-তর্ক পেরিয়ে এটা একটা সিদ্ধান্ত, একটা উহসংহার—এদিক থেকে এই কাহিনীর শুরুই শেষ থেকে—এমনটা যদি ভাবতে হয় তো ভাবতে পারেন। সচেতন—অচেতন আমার মন বা নির্মনের কোথাও থেকে এ-ব্যাপারে কখনও কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। আসলে তার এই অবধারিত ভবিতব্যই আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল কৃষ্ণেন্দুর দিকে। অনেক সময় মেসিনের চাকায় জামাকাপড় আটকে যায় না? যার পর থেকে মেসিনের গতিবিধির নিয়মে চলে যেতে হয় তার গর্ভে— ব্যাপারটা ছিল শুরু থেকে সে-রকম। অতএব তার খবর আসুক, বা না-আসুক, সে নিয়ে আমার মাথাব্যথা ছিল না কোনদিনই।

তারপর মাত্র গতকালই বিনা মেঘের আকাশ থেকে জলের মতো এই চিঠিটা ডাকে এল, যার কপি নিচে দিলাম। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, এই চিঠি ছিল আমার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

ঝাড়গ্রাম। ১৫ জুন, '৯৩

কল্যানীয়া রুচিরা,

ছোটবেলায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়' নামে একটি বই পড়েছিলাম। আফ্রিকার রেল-শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়েছিল শঙ্কর। একদিন প্রান্তরের মধ্যে

তাঁবুতে দেখা দিল অতিকায় মাম্বা। চার ফুট উঁচু শুধু তার ফণাটাই। জ্বলন্ত টর্চ ধরে রেখে শঙ্করতাকে নিস্পন্দ করে রাখে বহুক্ষণ! সে জানে, একটু নড়লেই ছোবল, নিশ্চিত মরণ। কিন্তু ছ'সেলের টর্চ ধরে কতক্ষণ! হাত পালটাবারও উপায় নেই। একসময় তার হাত সিসের মতো ভারি হয়ে এল। সে বুঝল শুধু হাত কেন, এই টর্চের ভার বহন করার ক্ষমতা তার সমগ্র অস্তিত্বেরই আর নেই। একে নামিয়ে রাখার স্বস্তি, সাপের ছোবলের চেয়ে এখন অনেক বেশি কাম্য।

আশা করি, এই গল্পের পর তোমাকে আর বলতে হবে না যে আমি অবশেষে আমার মৃত্যুকামনাই করছি এবং তোমার হাতে এবং কেন। আজ তিন বছর ধরে অবধারিত মৃত্যুর আগে আগে ছুটে ছুটে—আমি অবশেষে ক্লান্ত। হৃষিকেশ, কাতরাসগড়, নোয়ামুণ্ডি—এমনকি বোম্বের ধারাবি, যেখানে লুকিয়েছি—কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে তোমাদের ছায়া। কিন্তু যে-সব জায়গা ছিল তোমাদের ধরাছোঁয়ার বা অনুমানের বাইরে—যেমন এখন আমি যেখানে সেখানেও একটা মুহূর্ত আমি চোখের পাতা ফেলতে পারি না। সত্যি কথা বলতে কি, এখন তোমার ছায়া নির্গত হয় আমার শরীর থেকে। তোমার হাতে ছায়া-রিভলবার।

হ্যাঁ, আমি খুনী। রজতকে আমি খুনই করেছি। আমার শাস্তি মৃত্যু। এবং তোমার হাতে। ২১ ডিসেম্বর আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো। শুধু একটা ব্যাপার আমি তোমাকে পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করি। প্রথমত, দাদাকে এবার সঙ্গে আনার দরকার নেই। রিভলবার আনবে। কিন্তু, আমার মতে, নিরাপদ দূর থেকে ছোড়া রিভলবারের গুলি দিয়ে হত্যার মধ্যে তোমার জিঘাংসা তৃপ্ত হবার নয়। আমি তাই একটি ধারাল ক্ষুর আনিয়ে রেখেছি। আমি ডাক্তার। অ্যানাটামি জানি। কীভাবে গলার ঠিক কোনখানে বসাতে হবে সব আমি শিখিয়ে দেব তোমাকে। তারপর দু'জনে জঙ্গলে যাব। সবশেষে কন্যাসমা হওয়া সত্ত্বেও তোমার নিষ্কাম ক্ষমাহীনতাকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম করে যাই। ইতি,

তবু তোমারই
কৃষ্ণেন্দু

পথনির্দেশ

এসপ্ল্যানেড থেকে বারিপদার বাস। লোধাশুলি পেরিয়ে সুবর্ণরেখার ওপর নতুন ব্রিজ। সেখানে নেমে অটোরিকশায় ব্রিজ পেরিয়ে গোঁসাইগোবিন্দপুর। ২০ কিলোমিটার। সঙ্গে একটি ম্যাপ এঁকে দিলাম।—কৃ.

আজ ২০ জুন। এখন বিকেলবেলা। কাল ভোরের বাসে আমি গোঁসাইগোবিন্দপুর যাচ্ছি। এখন গোখেল রোডে দাদার পুলিস কোয়ার্টারে। ফ্রিজ থেকে একটা আইসক্রিম বের করে খেতে খেতে এখন লিখছি আপনাকে। বুঝতেই পারছেন, আমার মনে কোনও উদ্বেগ নেই। কারণ, কৃষ্ণেন্দু আমার কাছে এখনই মৃত। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে-ভাবে অর্জুনকে জীবিতাবস্থায় আত্মীয়-স্বজনের লাশ দেখিয়েছিলেন, আমি যেভাবে দেখাচ্ছি আপনাকে।

ঝাড়গ্রাম-ময়ূরভঞ্জ সীমান্ত থেকে অদূরে জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন চন্দরেখা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। ঐ দেখুন, ২২ জুন ভোরবেলা ঘন শালবনের ভেতর কৃষ্ণেন্দুর লাশ পড়ে

আছে। তার গলা কাটা তার শবের ওপর মুসলধারায় বৃষ্টি। কোথাও রক্ত নেই।

চিঠি পড়া শেষ। আপনি এখন পুলিস খবর দিতে পারেন, মিসেস বেরা। আমি ঝাড়গ্রামের ফরেস্ট রেস্ট হাউসে। আমি একা।

১৯৯৭

প্রেতনীর হাসি

ভূত বলে কিছু নেই। ভূতের গল্পও তাই হয় না। তা বলে কি জীবনে এক-আধটা অবিশ্বাস্য ঘটনাও ঘটতে পারে না? আর তা যদি মৃত বা মৃত্যুসংক্রান্ত হয়, এবং সেই সঙ্গে হয় কিছুটা ভয়াবহ্—ভূতের না হোক—ঘটনাটিকে অন্তত ভৌতিক ব্যাপার বলা যেতেই পারে।

প্রবীণ অটোপসি-সার্জন ডাঃ দীনবন্ধু মোদকের সহকারী ডাঃ তপন ধরের ক্ষেত্রে যা হয়েছিল। ডাঃ মোদক কত মড়াই তো কেটেছেন সুদীর্ঘ চাকুরি-জীবনে! শুধু একটি ক্ষেত্রে, মাত্র একবারই, লাশ-কাটা ঘরে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছিলেন তিনি। মৃত শরীরের প্রগাঢ় হলুদ নির্যাসে মাখামাখি স্ক্যালপেল খসে পড়েছিল তাঁর হাত থেকে। 'একি, এযে আশা!' বলে অস্ফুট স্বগতোক্তি করে উঠে, অটোপসি ঘর থেকে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে যান তিনি।

ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী আমার তরুণ ডাক্তার বন্ধু তপন ধর। গল্পটা সেই বলেছিল আমাকে।

১৯৮১ সালের কথা। জুলাই মাস। সকাল সাড়ে ১০টা। মোমিনপুরের লাশ-কাটা ঘরের মধ্যে আবহাওয়া পুরোদস্তুর শীতের। ধূলিধূসর টিউব থেকে নিস্প্রভ আলো। করোগেট টিনের ছাদে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির শব্দ।

সেদিন তিনটি বডির পোস্ট-মর্টেম হবে। স্টেনলেস স্টিলের লম্বাটে একটা ট্রলি-টেবিল ঠেলে সহকারী তপন ডাঃ মোদকের সামনে নিয়ে গেল। লাল কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকা একটি বডি। শুধু পায়ের পাতাদুটো খোলা। বাঁ পায়ের গোড়ালি থেকে ঝুলছে টোকেন।

'কী কেস?' ডাঃ মোদক ততক্ষণে কনুই অব্দি রাবার গ্লাভস পরে নিয়েছেন। হাতে ক্ষুরধার স্ক্যালপেল।

'আলিপুর থানার কেস স্যার। মেড সার্ভেন্ট। বেগন খেয়েছিল।'

লাশের পায়ের দিক থেকে লম্বা ও রোমশ ডান হাতটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন ডাঃ মোদক, আর তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে তপন যখন বলল, 'টোকেনে বয়স ২২ লেখা আছে', ততক্ষণে লাল চাদরটা সরিয়ে দিয়েছেন দীনবন্ধু। লাশ এখন আকণ্ঠ নগ্ন। কিন্তু দেখা গেল, পরিচালিকা হলেও একটি শৌখিন অন্তর্বাসে এখনও তার বুকদুটি ঢাকা রয়েছে। মৃতদেহে যা অত্যন্ত অস্বস্তিকর। ডোম ভরত রবিদাস এসে একটানে ব্রেসিয়ারটি ছিঁড়ে ফেলল।

দুজনেরই নাকে সার্জনস মাস্ক। তবু একটা উৎকট গন্ধ।

'বডি ক'দিনের—এঃ! মর্গে কারেন্ট ছিল না?'

'দু'দিনের স্যার', ভরত বলল, 'মাঝে মাঝে বহুত লোডশোডিং ছিল।'

দীনবন্ধু বডির ওপর থেকে লাল চাদরটা সরিয়ে দিয়েছেন। এখন মৃতের মুখের ওপর সেটা ডাঁই হয়ে পড়ে। গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত উন্মুক্ত। ক্ষয়া, রোগাটে বাকি শরীরের তুলনায় স্তন দুটি অনেক বেশি যুবতীর। রঙ হাতির নোংরা দাঁতের মতন। বাম স্তনের ঠিক নিচে একটা লম্বা কালশিটের দাগ। তপন সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষন করলেন ডাঃ মোদক

বললেন 'ও কিছু না। এখানে একটা জড়ুল ছিল মেয়েটির। ব্লাড সার্কুলেশন থেমে যেতে ওইরকম হয়েছে।'

'ঠিক মাপে মেক্সিকোর মতো স্যার, তাই না?'

মেক্সিকো?

স্ক্যালপেল হাতে ডঃ মোদক এই সময় অনেকক্ষণ তপনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। তপনের মতে, লাশটিকে তিনি তখনই চিনতে পেরেছিলেন। কারণ, গলঅস্থি থেকে নাভিমূল পর্যন্ত কাটবার সময় তাঁর ডান হাত এত কাঁপছিল যে তিনি ছুরির বাঁট কিছুটা বাঁ-হাতে এবং বাকিটা দু-হাতে ধরে ইনসিসন সম্পূর্ণ করেন।

পোস্টমর্টেমের আইনকানুন আজকাল আগের মতো নয়। যদিও বিষ পেটেই পাওয়া যাবে, কিন্তু প্রতিটি প্রত্যঙ্গই এখন আলাদা করে পরীক্ষা হয়। তাই একে একে লিভার, কিডনি এসব কেটে বের করে দীনবন্ধু তপনের হাতে তুলে দিতে থাকেন। তপন সেগুলো আপাতত সাজিয়ে রাখছে সাদা পাথরের টেবিলটার ওপর। পরে হরিদ্রাভ অ্যাসিডের মধ্যে এরা বড় বড় বয়েমে থাকবে। বুকের খাঁচা গায়ের জোরে সরিয়ে হার্ট কেটে বের করলেন দীনবন্ধু। কমমট শব্দে হাড় খোলার শব্দ। পালমোনারি আর্টারির ডগা ধরে দুলিয়ে হার্টটা ঘুরিয়ে-ফিরেয়ে দেখালেনও তপনকে, 'লুক হিয়ার। একটা হেলথি হার্ট বলতে কী বোঝায়, ভাল করে দেখ।' একটা টুসকি দিয়ে হার্টে 'আরও পঞ্চাশ বছর' হেসেখেলে চলত এখন-বেগুনি হার্টটা তিনি ছ'টি স্লাইসে কাটতে বললেন তপনকে। এদিকে, পেট-বুক সব খালি হয়ে গেল দেখে, এই সময় ভরত বডির মুখ থেকে দুম করে ঢাকাটা সরিয়ে দেয়। এর পরে ঘটনা আগেই বলা হয়েছে। অর্থাৎ, কম্পমান স্ক্যালপেল হাতে ডাক্তার মোদকের দ্রুত কক্ষত্যাগের কথা।

কিন্তু আরও আগের ঘটনা তপন জেনেছিল ভরতেরই কাছে। ভরতের বৌ মেনকা ঠিকে কাজ করত ডাক্তারবাবুর বাড়িতে। আশা ছিল রাতদিনের কাজে। সে পাসপোর্ট-ভিসাহীন বাংলাদেশের মেয়ে। এখানে তার কেউ নেই। সীমান্তে বহুধর্ষিতা কিশোরী মেয়েটি কিন্তু গর্ভবতী হয় ডাক্তার মোদকের বাড়িতেই। এজন্যে বাড়ির দারোয়ানকে দোষ দিয়ে তাড়ানো হয়। আবোর্সনের রাজকীয় বন্দোবস্ত হয় নার্সিংহোমে। স্বয়ং মিসেস মোদক তত্ত্বাবধান করেন। ডাক্তার মোদকের নাম না-করার জন্য ডাক্তার-গৃহিণী আবোর্সন-অন্তে তাকে একটি রোল্ড গোল্ডের নাকছাবি গড়িয়ে দেন। সংলগ্ন হিরেটা নকল হলেও ঝকমক করত খুব। তারপর তাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 'কিন্তু ও তো বর্ডার থেকেই পালিয়ে এসেছিল স্যার', তপনকে ভরত রবিদাস জানায়, 'কালিঘাটে রেণ্ডিগিরি করত।'

না, এই গল্পে এপর্যন্ত ভয়ের কিছু নেই। ভূতই বা কোথায়? অথচ, এই গল্পই শেষ করার সময় তপন যখন আমার হাত চেপে ধরল, সে ঠকঠক করে কাঁপছে!

'জানো, ব্যানার্জিদা', তপন বলল কাঁপতে কাঁপতে, 'ডাক্তার মোদক তো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি কিন্তু পালাতে পারিনি।'

'কেন। তুমি আবার পালাতে যাবে কেন?'

'আমি অটোপসি-রুমের মধ্যে ফেন্ট হয়ে পড়ি।' তপন ভয়ে ভয়ে জানায়।

'সে কী। কেন?'

'বিশ্বাস করো ব্যানার্জিদা', তপন বলল, 'এই যে লোমগুলো ফের খাড়া হয়ে উঠল আমার। আমি দেখলাম—' তপন চুপ করল।

'কী দেখলে তুমি?'

'আমি দেখলাম আশার ফোলা-ফোলা ঠোঁটদুটো পাতলা হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে এক অদ্ভুত

নীল হাসিতে। একদম জ্যান্ত, বিশ্বাস করো তুমি। অমন ভীষণ নিষ্ঠুর ভয়াবহ চূড়ান্ত বিদ্রুপের হাসি মানুষ হাসতে পারে না। আর—'

'আর?'

'আর নাকছাবির সেই নকল হিরে থেকে, ওঃ হো', চোখ দু'হাতে ঢেকে তপন বলল, 'সে কী তীব্র নীল রশ্মি! অন্ধ করে দেবে যেন!'

অবশ্য, হ্যাঁ, আমি পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, দু'দিন ধরে পচতে-থাকা লাশের ঠোঁট, পচন-ক্রিয়ার কোনও বিশেষ মুহূর্তে অমন হাসি-হাসি দেখাতে পারে। কিন্তু যদি তাও হয়, সেই মুহূর্তে প্রায়ান্ধকার ছমছমে, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত লাশ-কাটা ঘরে, সেটা ভূতের হাসি ছাড়া আর কী মনে হতে পারে? এবং, একথা কি নির্ভুলভাবে জানা যাবে কোনওদিন, যে, অকূল তিমির সাঁতরে ওই হাসি আশার প্রেত এসে হেসে যায়নি?

১৯৯৭

রবীন্দ্রনাথ ও রেনোয়া

ফোন এসেছিল, তখন রাত ৩টে।

বেশি রাতে ফোন এলে মীনাক্ষি ধরে। ঘুম ভেঙে গেলেও আমি তাই কোনও উদ্যোগ নিইনি।

ফোন রেখে ঘরে এল গজগজ করতে করতে। এই কি সময়? এত রাতে ঘুম থেকে তুলে মৃত্যুর খবর কেউ দেয়! দিতে আছে?

কেন, ওঁর বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কেউ নেই? তোমাকে কেন? তোমার বন্ধুর কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই।

কে, বলার দরকার নেই। দ্বিজেন। একজনই ছিল হাসপাতালে। যার সময় ফুরিয়ে গিয়েছিল। এবং তারপরেও সে বেঁচে ছিল স্রেফ হার্ট অ্যান্ড লাং মেশিনের দৌলতে। ঘন্টাও নয়; তার ছিল যে কোন মুহূর্তের প্রশ্ন। ছিল দিবারাত্রির কোমায়।

না, বন্ধুর কাণ্ডজ্ঞান বলতে সদ্যমৃত দ্বিজেন তোংদারকে বেগ দেয়নি মীনাক্ষি। সে বলতে চেয়েছিল নিরঞ্জন ঘোষালের কথাই।

'কে ফোন করেছিল, নিরঞ্জন?'

'আবার কে!'

'বিরক্ত হয়েছ, বোঝেনি তো?'

'বোঝালাম একটু।'

'কী বললে?'

'ঐ' মীনাক্ষি হাই তুলল, 'বললাম আপনার ওখান থেকে বন্ধু ফিরেই তো ছে পৌনে একটায়। আরও ঘন্টা দুই রেখে দিলেই পারতেন? বলছিল তোমাকে ডেকে দিতে।'

'কী বললে?'

'সে যা বলার বলেছি। ছেলেকে খবর দেওয়া হয়েছে বলেছে।'

'আমার কি এখন যাওয়া উচিত?'

'তোমার। হাঃ!' মীনাক্ষি তার মাথার বালিসটা তুলে নিল, 'তুমি কে?'

'অফিস থেকে তো কেসটা দেখাশোনা করার দায়িত্ব আমাকেই দিয়েছে। আমিই

ভারপ্রাপ্ত সুইসাইড কেস। সেটা চেপে দিতে হবে। নইলে তো এল আই সিই পাবে না। অফিসেরও বদনাম।'

'গাড়িটা সঙ্গে রাখলেই পারতে।'

'ওটা তো নাইট-ইভেন্টের গাড়ি। রাখা যায় না।'

'এটাও তো একটা নাইট ইভেন্ট।'

'হ্যাঁ। কিন্তু কাগজেরর ভাষায় না। ওগুলো আগুন, খুন, অ্যাকসিডেন্ট—এই সব।'

'তাহলে যাও। একটা ট্যাক্সি নাও!'

'এত রাতে পাব?'

'কী ব্যাপার বলো তো? এত রাতে তুমি যাবে হাসপাতালে, আর এই শীতে! কেন, নেশা কেটে গেল?'

'গেল'-র ল-টা একটি য-ফলা লাগিয়ে উচ্চারণ করে মীনাক্ষি তার মনোভাবে নিজস্ব পরিভাষা রাখে। বাকি রাতটুকু নিশ্চিন্তে কাটাতে সে পাশের ঘরে সিঙ্গল বেডে ঘুমোতে গেল।

যেতে যেতে বলে গেল, 'অফিসের চাকর আমি অনেক দেখেছি। আমার বাপ-দাদাও চাকরি করেছে, দাদা এখনও করে। কিন্তু, তোমাদের টাইপটা কী জানো? তোমরা হচ্ছে ক্রীতদাস! তোমাদের নাকে দড়ি। এডিটর লুঙ্গি পরে উবু হয়ে বসে ডুগডুগি বাজাচ্ছে। তোমরা উঠছ, বসছ—ঘুঙুর পরে নাচ্ছ। কোথাকার কে একজন কপি-হোল্ডার মারা গেছে, রাতদুপুরে, ছ্যাঃ।'

এ-রাতের মতো ফোন আর বাজবে না। মীনাক্ষি রিসিভার নামিয়ে রেখে গেছে।

গতকাল অবস্থা ভাল নয় শুনে আমি যখন নিরঞ্জনের ফ্ল্যাটে যাই, সে সবে এক প্লেট তপ্‌সে মাছের ফ্রাই আর সে রাতের প্রথম গ্লাসটি নিয়ে বসেছে।

নিরঞ্জন বলল, 'বউ তো বলেই খালাস। স্লিপিং পিল কটা খেয়েছে তার ঠিক নেই—ব্যান্ড নেম জানা নেই, পিলের স্ট্রেংথ জানা নেই। আরে বাবা, ধুতরোর বিচি খেলেও তো একই সিস্টেম। যাই হোক, স্টমাক ওয়াশের পর তো ফল পাওয়া যাচ্ছিল, অনেকখানি রেসপন্সও করেছিল। কথা বলেছে তো, তোর সঙ্গে, তখন। যদিও ডিলিরিয়মের মধ্যে। তারপর সেমি-কোমা থেকে হঠাৎ—'তারপর দ্যাখ্ না', আমার গ্লাসে কতটা ঢেলেছে দেখে নিয়ে জল ঢালতে ঢালতে বলল, 'সকাল থেকে একেবারে ডিপ কোমায়। মনে হয়, ব্রেনে হেমারেজ হয়েছে একটা', নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে, 'ছড়িয়ে পড়েছে।'

আমি বললাম, 'থাক-থাক-থাক।' অর্থাৎ জল। আর না।

আমার জন্যে আর এক প্লেট তপ্‌সে টেবিলে রেখে, নিরঞ্জনের বউ তপতী এসে বসল।

'এটা দেখুন', বলে সে, হ্যান্ডমেড পেপারের লাল খাম থেকে কালীঘাটের কালীর একটা আউট-অফ-ফোকাস ফোটোগ্রাফ, সন্তর্পণে আমার হাতে দেয়।

'কে তুলল, নিরঞ্জন?'

'বিশ্বাস কর। ফ্ল্যাশ দিইনি। মাইরি বলছি,' নিরঞ্জন আমার হাত চেপে ধরে, 'গেল শনিবার। রাত তখন আটটা। কেউ ছিল না মার সামনে। এক', তপতীকে দেখিয়ে, 'ও ছাড়া।'

তপতী বলল, 'কেউ না।'

'শনিবার পালা ছিল সুদর্শন হালদারের। পেসেন্ট আমার। অর্শ থেকে ফিশার। আমি

অপারেশন করি। সেই মেডিক্যাল ওব্লিগেশনের জন্যে খাতির। শনিবার দারুণ ভিড়। সবাইকে হাটিয়ে দিয়েছিল। আমি একবারই শাটার টিপি। আর', সমর্থনের জন্যে তপতীর দিকে তাকিয়ে, 'ফ্ল্যাশ দিইনি। মা এলেন ছবিতে। ফোকাসে ছিল, তবু তপতী এল না। ফ্ল্যাশ ছাড়াই এ জিনিস আর ঐ ঘুটঘুটে অন্ধকারে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে মাইরি। এই দ্যাখ। তুই বিশ্বাস করছিস না তো?' বলে সে হাত গুটিয়ে তার হাতের লোম দেখায়। অত কম আলোয় তার রোমরাজি কতদূর উত্তেজিত না দেখতে পেলেও কনুই-এর ওপর লাল সুতোয় বাধা মস্ত মাদুলিটি আমার চোখে পড়ে।

'না-না। সত্যিই। ফ্ল্যাশ দেয়নি।' তপতী ফের বলল, 'আলো জ্বলেনি।'

'আমি নাই-বা বিশ্বাস করলাম। তোরা তো করছিস।' আমি বললাম, 'মানুষ পাথরের কাছে উচ্চারণ করে প্রার্থনা করে, পাথর শুনতে পায় বলেই না!'

'না-না। ঠাট্টা নয়।' নিরঞ্জন রাগ করে বলল, 'নো জোক্স।'

'তুমি ঐ ব্লাড প্রেসারের কথাটা বলো।' তপতী মনে করিয়ে দিল।

'ও-হ্যাঁ। শোন তাহলে', এতক্ষণ মনে ছিল না, গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে নিরঞ্জন নড়েচড়ে বসল, 'শোন তাহলে। পরশুদিন ভিজিটিং আওয়ার্সে-এর পর সিস্টারের ফোন। ডাক্তার ঘোষাল একবার আসুন সিস্টোলিক ৮০। ডায়স্টলিক বলল, ৫০। গিয়ে দেখলাম, হাঁটু পর্যন্ত ঠাণ্ডা। পালস্ ফিরল, রেট অ্যালার্মিং। ঘন্টাখানেক আগে মায়ের ছবি পেয়েছি। বুকে আর স্টেথো দিয়ে কী হবে, ভাবলাম শেষ হয়ে আসছে, মায়ের ছবিটাই বরং বুকে রাখি। পালস হাতেই ছিল। দেখলাম, অনেক প্যালপেব্‌ল আর বাড়ছে। আন্দাজ করলাম ১৫০-৬০ তো হবেই। সিস্টার একবার প্রেসার দেখুন তো। বলল, ১০০/৬০।'

'কত হলে ঠিক হয়?'

'১২০-৮০ হলে আইডিয়াল।'

'হয়েছিল?'

'সে আর দেখা হল কই। আমি তো তখন ঠকঠক করে কাঁপছি। ছবি নিয়ে বাড়ি চলে এলাম।'

দ্বিতীয় রাউন্ডের জন্য হুইস্কি ঢালতে ঢালতে নিরঞ্জন বলল, 'কী গো, আর কিছু খেতে দেবে না?'

'মাছের ডিমের বড়াগুলো আনি?' বলে তপতী উঠে গেল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

'আস্তে আস্তে ডিপ কোমায় চলে গেল আমার চোখের সামনে। ছবিটা সরিয়ে নিতেই।'

বলে সে একদম চুপ করে গেল।

তপতী ফিরে এল একটা ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে। ট্রলিতে নিজের জন্যে এক বোতল বিয়ার।

'তুমি কিন্তু ছবিটা রেখে এলেই পারতে' তপতী বলল, 'ওঁর মাথায় বালিসের নিচে।'

'না-না।' নিরঞ্জন খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল, 'এটা কাছ ছাড়া করলে আমাদের খুব বিপদ হয়ে যেতে পারে।'

তপতী আমার সঙ্গে বাড়ির বাইরে প্রথম যেদিন আসে, নন্দন-এ সিনেমা দেখতে দেখতে 'ভাল লাগছে না' বলে আমাকে নিয়ে গেল পাশেই ভিক্টোরিয়ায়। তার ভাষায় আকাশের নিচে।

বললাম, 'সিনেমায় প্রথম দিন হাত ধরাই নিয়ম। দেখলে তো, তাও ধরলাম না। বিবাহিত ব্যাচেলরের সংযমখানা দেখলে।'

আমার সঙ্গে মীনাক্ষির সাজানো দাম্পত্যের কথা ও জানে। ডায়ালগের ফাঁদে পা না দিয়ে তপতী চুপ করে থাকল।

'এর পরদিন, সিনেমায়, যদি বলি বুকে ব্যথা, হাত দিয়ে দেখবে কি?'

অনিচ্ছা-সত্ত্বেও হেসে ফেললে যা হয়। সে আর আটকানো যায় না। বেশ একচোট হেসে নিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই। সত্যি না মিথ্যে দেখতে হবে না?' দেখলাম তার চোখের তারায় আলোর ফুলকি।

উত্তর চল্লিশার অন্যান্য আকর্ষণীয়তার কথা তখনও জানি না। তবে তার কালো চোখের মণিদুটোয় দুটি অভ্রবিন্দু মাঝে মাঝে এসে বসে। আর সেজন্য কেবল একটু কৌতুক বোধ করাই যথেষ্ট। বিন্দুদুটি তাতেই চকচকিয়ে ওঠে। তার বেশি কিছু দরকার হয় না। হাসতে হয় না।

'ঘরে ছিলাম', চুপ করে থেকে ভাবল বোধহয় বলবে কি বলবে কিনা, তপতী বলল, 'এই প্রথম বাইরে এলাম।'

বুঝলাম সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে-বাইরে' রেফার করছে।

এরপর যত দিন গেল, আমি বুঝতে পারলাম, ঘরের তুলনায় বাইরেই তপতীর বেশি পছন্দ। ঘর থেকে বেরিয়ে ঘরে আর সে কিছুতেই ঢুকতে চায় না, অন্তত আমার সঙ্গে। যেদিন প্রথম ঢুকল, আমার বুকে মুখ গুঁজে সেই বড়ই সসঙ্কোচে জানতে চাইল, 'বোধহয় এটা আশা করোনি তুমি, তাই না?'

আমি বললাম, 'তা কেন, রেনোয়ার মেয়েদের পাছাও তো ছিল বেশ বড় বড়।'

শারদীয় প্রতিদিন, ১৯৯৭

ভারতবর্ষ

'সঈদুল' রাখি বলল, 'আমাকে চুমু খেয়েছে'।

কিছু নদী আছে, যাতে জোয়ার-ভাটা খেলে না। হেমাঙ্গর মুখ সেই জাতীয়। মনোভাবের, মুখে দূরস্থান, তার মনেও কোনও ছায়া পড়ে না। অনুভব, আবেগ, এ-সব গ্রহণ করার মতো তার মন আছে কিনা, সে নিজেও ভাল বোঝে না। থাকলে, মুখে-চোখে না হোক, অন্তত মনে ধরা দেবে এই যদি হয় পূর্ব-শর্ত, তাহলে মানতেই হয় যে ও-ব্যাপারে সে আজও প্রামাণ্য নয়। অনুভব, আবেগ—বিশেষত প্রেম সংক্রান্ত যেগুলো—সেসব সরল জিনিস। কিন্তু-আবেগ সমূহের মধ্যে জটিলতম যেগুলো, যেমন ধরা যাক, জিঘাংসা কি রিরংসা—যে দুটো নাকি মানবিক হয়েও অনেকখানি পাশবিক, একটা প্রমাণ তো রেখে যাবে তারা! একটা দাগ রেখে যাবে। মুখে-চোখে না রাখুক, অন্তত মনে! কিন্তু হেমাঙ্গর ক্ষেত্রে প্রমাণ কই যে তারা ছিল বা আছে? বিশেষত ওই জিঘাংসার ব্যাপারটা। না-না, সেরকম নেই কেউ তার জীবনে, তার জীবনে কখনও দেখাও দেবে না সে-যে, খুন হতে পারে, তার মতো মানুষের হাতে। আত্মহত্যা? হ্যাঁ, সেও একটা খুন বটে, আবার ঠিক খুন নয়ও। সেই জন্যই তো ফাঁসি হয় না, বা যাবজ্জীবন। প্রকৃত খুন হলে হত নিশ্চয়ই। তাছাড়া, তাই যদি হবে লোকে লিখে রেখে যায় কেন যে, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়?' মানে তো একটাই। আমাকে কেউ 'খুন' করেনি। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ খুনী নয়। তাই, রাগ-দুঃখ, আনন্দ-অভিমান থাকে থাক, না-থাকে না থাক, শেষমেস

এমনিই দাঁড়িয়েছে তার ভাবখানা। জন্ম-প্রতিবন্ধী তো হয় অনেকে। হয় না? কালা, বোবা, জড়বুদ্ধি, বগলে-ক্রাচ, অন্ধ, হ্যাঁ, জন্মান্ধ...কত রকম তো আছে। জোয়ার-ভাটা নেই, এমন নদী আছে কত।

'ইন ফ্যাক্ট', প্রায় খবর পড়া গলায় রাখি বলল, 'আই হ্যাড টু স্লিপ উইথ হিম।'

হেমাঙ্গ চুপ করে আছে। থাকবে জানা ছিল। স্বামীকে ঠিক বুঝতে একটুও ভুল করেনি রাখি। ১৩ পেরিয়ে ১৪য় পড়ল তাদের দাম্পত্য, এ-টুকু না-বোঝার কথাও না। যাদের বলা যায় না, মেয়েরা এ-সব কথা তাদের বলে না। সেই সব স্বামীকে। মৃত্যু পর্যন্ত সে বোঝা বহে নিয়ে যায়। কিন্তু, এক্ষেত্রে তার প্রয়োজন ছিল না। তাই বোঝা নামিয়ে রাখল। যদিও ঝাড়া দু'মাস ধরে ভেবেছে। কেননা, ঘটনা তো মাসদুই আগের। সেই যেদিন বাবরি। তারপর, আজ, অবশেষে বোঝা নামিয়ে রাখল। যে, যা ছিল অবধারিত, অথচ, অযথা দেরি হচ্ছিল এবং অকারণে, তা ঘটে গেছে।

যা বলার, তা বলা হয়ে গেছে, অন্তত, মোদ্দা কথা যেটুকু। কিন্তু, শত হলেও, ব্যাপারটা তো সারমেয়-সমাজের নিয়মে হয়নি। যে, মেটিং সিজনে এক কুকুরের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল এক কুকুরির। আর মদ্দাটা ছিল ভারি ষণ্ডা, বাকিগুলো তাই লেজ গুটিয়ে তাকে পথ ছেড়ে দেয়। আর তাই, যা হবার, তা হয়ে গিয়েছে। এরপর এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য না করলে ব্যাপারটা ফলত তাই দাঁড়ায়। কিন্তু, গর্হিততম কাজ, এমন কি ঠান্ডা মাথায় খুন করে এলেও, মানুষ মানুষই থেকে যায়। ফাঁসির দড়ি থেকে যে ঝুলছে, দুলছে, সকলেই জানে, সে একজন মানুষ। সে তুলনায় ৬ ডিসেম্বরর বাবরি ভাঙার দিন যা ঘটে গিয়েছে সে তো কিছুই না। সত্যি বলতে বাবরি মসজিদ যে তখনই ভাঙছে, রাখি জানত না। জানা গেল তো বিকেলে ৭টার খবরে। আর ঘটনা ঘটেছে সেদিন দুপুরে। সঈদের টটি লেনের স্টুডিওয়। অবশ্য সঈদ হয়তো জানত মসজিদ ভাঙার ব্যাপারটা। বিবিসি তো তখন থেকেই দেখিয়েছিল, শাবল গাঁইতি নিয়ে যখন যখন ওরা গম্বুজে উঠে গেছে। সে নিশ্চয়ই দেখেছিল। সে যে জানত সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল রাখি। দোতলায় স্টুডিওয় অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে ছেলে সৌম্যকে বসিয়ে রেখে সে যখন নিচে নেমে এসেছিল, মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ কী ভেবে নিয়ে, কাঁধে হাত রেখেছিল রাখির। গুলি বর্ষনের মতো তার চক্ষুকোটর থেকে বেরিয়ে আসা, সে কী অনর্গল দৃষ্টিপাত। তার হাত ধরে সেভাবে বেড রুমে ঢুকেছিল সঈদ, যেভাবে, যুদ্ধের সময় মানুষ আত্মরক্ষার্থে ট্রেঞ্চে ঢোকে। যদিও সেদিন সন্ধ্যাবেলা, ওদের ট্যাক্সিতে তুলে দেবার সময় পর্যন্ত সঈদ কিছুই বলেনি। কিন্তু, মসজিদের প্রথম গম্বুজ তখনই ভেঙে পড়ে। সেদিন শনিবার। দুপুরবেলা। যখন সঈদ বিছানা ভাঙছে। পরে, সময় মিলিয়ে দেখেছে রাখি।

রাখি তাই কথা বাড়াল, 'ইচ্ছে আমার ছিল না মোটেই। কিন্তু, জানো তো, হ্যাউ দিজ থিংস হ্যাপেন। অ্যান্ড ইনস্পাইট অব ইওরসেলফ।'

ঠিক দু'মাসের মাথায় আজ আর এক শনিবার। আজও দুপুরবেলা। রাখির মাথা আজ হেমাঙ্গর বুকের কাছে। হেমাঙ্গর রোমবহুল লম্বা হাত তার উন্মুক্ত পিঠের ওপর মেরুদাঁড়ায় প্রারম্ভ পর্যন্ত পড়ে আছে।

হেমাঙ্গ এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি। কথা বলা দূরে থাক, একটা কিছু ভাবনাও তার মনে জাগেনি এখনও। ৬ ডিসেম্বর যখন বাবরি ভাঙা হচ্ছিল, সে ছিল ইন্দোরে। এন টি সি-র বন্ধ কারখানাগুলো নিয়ে লেবার সেক্রেটারি অহল্যা বান্দেকরের সঙ্গে মিটিং—সঙ্গে ওখানকার শ্রমিক নেতা লোকেশ গাউর, প্রকাশ জৈন এরা সব। হঠাৎ খবর এল। সেক্রেটারির অ্যান্টি চেম্বারে 'সোনি' টিভিতে তারাও বিবিসি-তে দেখল যা দেখার। তখন

কি, যা ঘটছে, তার বেশি কিছু, কোনও ভাবনা, তাদের মনে এসেছিল? যা ঘটে যাচ্ছে, তাকে, ফর্ম এবং কনটেন্টে, সর্বাংশে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল তখন? বলতে হয় তাই আমরা বলি, ওকে চিনি, ওটা জানি। এমনটা হবে জানতাম। কত ভুল জানি আমরা তা বোঝা যায়, জানার বাইরে যখন কিছু ঘটে যায়, তখন। ঐ যে আমার হাতটা, যা এখন রাখির পিঠ জুড়ে পড়ে আছে, কতদিনের চেনা, তবু আমি কি ওকে চিনি। ওকি, সত্যিই আমার। আমার বুকে যার নিঃশ্বাস পড়ছে, যে একতরফা, এক-একা ভালবাসে আমাকে, হ্যাঁ, ভালই তো বাসে, ভালবাসায় যে রেখেছে বিশ্বাস, সেও কি আমার খুব চেনা, জানা? আমি তার আবেগ-অনুভবকে চিনি?

'কী ব্যাপার, তুমি কিছু বলছ না যে!'

কী যে বলা যায়, তা মনে এসে যাবে ভেবেই হেমাঙ্গ এতক্ষণ খাটের পাদদেশে টিভির দিকে তাকিয়ে ছিল। সুশিক্ষিত ওষ্ঠলীলা ও দুই হাতের নিপুণ মুদ্রা সহযোগে বোবা ও কালাদের জন্য টিভিতে খবর বলা হচ্ছে। চৌকো খুপরির মধ্যে বিলম্বিত লয়ে খবর পড়ে যাচ্ছে আর একটি মেয়ে, যদিও শোনা যাচ্ছে না কিছুই। হেমাঙ্গ শুনতে চেয়েছিল। বাবরির ধ্বংস্তূপের মধ্যে এক জায়গায় সামিয়ানার নিচে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রামলালার বিগ্রহ। পূজা ও ভজন চলছে, তাও দেখাল। ভক্তবৃন্দের লম্বা লাইন। মিলিটারি। জনসভায় লালকৃষ্ণ আদবানি। কিন্তু বিছানা থেকে উঠে রাখি 'পরে শুনো আবার তো বলবে' বলে সাউন্ড অফ করে দিয়েছে। কথার জন্য হেমাঙ্গ তাই ঘরজোড়া জিনিসপত্রের দিকে তাকায়। ডাইনিং স্পেসে চলে যায় তার দৃষ্টি, ঘর ছেড়ে। কাঁধে-পতাকা লেনিনের প্রাগ্রসর ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে।

'সৌম্য কোথায়?'

'ওর তো আজ ছবির লেসন। ওর ওখানে গেছে।'

নামটা উচ্চারণ করল না রাখি। তাই হেমাঙ্গ জানতে চাইল, 'সঈদের ওখানে?' নইলে তার প্রয়োজন ছিল না।

আদবানির ঠোঁট নড়ছে। মন্দির ওঁহি বানায়েঙ্গে।

'লোকটার সঙ্গে হিটলারের একটা মিল আছে।' গণতান্ত্রিক শিল্পী সঙ্ঘের নেতৃস্থানীয় সভ্য সঈদুল ইসলাম একদিন হেমাঙ্গর কাছে জানতে চেয়েছিল, 'কোথায় বলতো?'

'দু'জনেই ফ্যাসিস্ট?'

'না', সঈদুল বলে ছিল, ক্যানভাসের মূল রঙ লালে সবুজ মিশিয়ে ও কিছুটা হরিদ্রাভ করে দিতে দিতে, 'দু'জনকেই মিডিওকার দেখতে।'

খুব হেসেছিল সেদিন ওরা দু'জনে। একসঙ্গে হো-হো করে। কোথা থেকে কী, হঠাৎ মনে এল হেমাঙ্গর।

'কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?' সে অবশেষে জানতে চায়।

'আমরা? আমরা কোথায়?' রাখি উঠে বসল, 'আমি গিয়েছিলাম।'

'কোন হোটেলে?'

'হোটেলে নয়। টটি লেনে। ওর স্টুডিওয়।'

'ফোন করেছিল?'

'না-না। আমি নিজেই চলে গেলাম। তোমার সোয়েটারের উল পাল্টাতে, গিয়েছিলাম নিউ মার্কেটে। কাছেই টটি লেন। ভাবলাম, যাই, সৌম্যর সঙ্গে ফিরব। বৌ-বাচ্চা ছিল না।' হঠাৎ অকারণে ফিসফিস করে রাখি বলল, 'বহরমপুর গেছে!' যেন এটাই আসল কথা, যা গোপনতম গোপন।

'কী করে হল ব্যাপারটা, বল?'

'কী করে হল? কী বলছ তুমি? জন্তু-জানোয়ারের মতো টেনে নিয়ে গেল!'

উঠে বসে চুল গোটাতে শুরু করল রাখি। উত্তেজনায় এত বড় নিঃশ্বাস নিল সে, যে এতক্ষণ হুকে আটকে-থাকা ব্রেসিয়ার খুলে তার কোলে পড়ে গেল, 'জাস্ট লাইক আ বুল। কোনও প্রিটেনশান নেই। কৈফিয়ত নেই। একটা কিস পর্যন্ত করেনি তখনও, জানো?' শুধু মনে হচ্ছিল যেন ডেস্ট্রয় করতে চাইছে কিছু। আমাকে। শাবল দিয়ে গাঁইতি দিয়ে শুধু ঘা দিচ্ছে আমায়। সর্বত্র। পারলে বোধ হয় ছিঁড়ে ফেলত। বিশেষ করে ভাষা। কি যাচ্ছেতাই জাত তুলে সব কথা। ট্যাক্সিতে তুলে দেওয়া পর্যন্ত একবারও অ্যাপোলোজাইস করল না।'

অনেকক্ষণ আবার চুপচাপ। টিভিতে আজ দুপুরের মতো প্রোগ্রাম শেষ। একটা খিসখিস আওয়াজ হচ্ছিল। এবার হেমাঙ্গ সুইচ অফ্ করে দেয়।

'তুমি ওইদিনটা', হেমাঙ্গ বলল, 'না গেলেই পারতে।'

'বাঃ! আমি কি জানতাম নাকি যে ঐদিনই সত্যি বাবরি ভেঙে ফেলবে। ও কিন্তু জানত, জানো? বিবিসি-তে দেখেও ছিল মনে হয়।'

'কী করে বুঝলে?'

'সে আমি বুঝেছি।' হঠাৎ আবার ফিসফিসিয়ে এল রাখির গলা, 'সে কি রোখ! সে কি আক্রোশ! যেন দাঙ্গায় নেমেছে। পুরো হিন্দু-মুসলমান করে তুলল ব্যাপারটা, বিশ্বাস করো—' এত বলে হেমাঙ্গর কব্জি চেপে ধরে রাখি। তার সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে, 'যেন খুনী। যেন খুন করছে।'

'আর ফের সৌম্যকে পাঠালে?'

'ও তো যাবেই। আঁকার নামে পাগল। আর মাস্টারমশাই বলতে অজ্ঞান। ও তো কিছু জানে না।' রাখি বলল, 'ওকে বলা যায় না। আটকাবো কি করে?'

সেদিন মধ্যরাতে হঠাৎ খুব মেঘ ডাকাডাকি। তাতে ঘুম ভাঙেনি। একটি বজ্রপাতের শব্দে সে ধড়মড়িয়ে বিছানায় বসে।

সে দেখল, রাখি পাশে নেই। এমন অভিজ্ঞতা তার বিবাহিত জীবনে এই প্রথম বালিশের তলা থেকে রেডিয়াম-লাগানো রিস্ট ওয়াচ বের করে সে দেখল, রাত তিনটে।

পাশের ঘরে দিদিমার সঙ্গে সৌম্য ঘুমিয়ে। বাথরুমে নেই। রাখি বারান্দায় নেই। তাদের ফ্ল্যাটের লাগায়ো ৭ তলা পর্যন্ত আর একটা ব্লক উঠেছে। ৫ তলা অব্দি উঠে কাজ বন্ধ রয়েছে। ৬ তলা পর্যন্ত বিম লেগে গেছে। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সে দেখল, নিচে ৫ তলায় ছাদে একটা বিমের পাশে রাখি বসে আছে। আকাশ ঝুলে পড়ছে মেঘে মেঘে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে হেমাঙ্গ ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

হেমাঙ্গ কাঁধে হাতে রাখে রাখির। রাতে খোঁপা দেখে ঘুমিয়েছিল। এখন ওর চুল খোলা। খোঁপা ভেঙে চুলের তোড় এখন প্রবল জোলো হাওয়ায় তার পিঠ ভাসিয়ে ফেঁপে উঠছে।

'কী হয়েছে রাখি?'

উত্তর নেই।

'কী হয়েছে, রাখি?'

'কিছু না।'

'নিশ্চয়ই কিছু। বলো আমাকে।'

সে এবার দু'হাতে রাখিকে তুলে দাঁড় করায়।

রাখির পিছনে বিরাট একটা জলার মতো পুকুর। তার পিছনে মাঠ। মাঠ ফুঁড়ে উত্তোলিত ত্রিশূলের মতো একটি বিদ্যুৎ ঝলসে উঠে। কিন্তু, আশ্চর্য, এবার মেঘের ডাক শোনা গেল না। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল রাখি। বৃষ্টি শুরু হল বলে? না। দু'হাতে হেমাঙ্গকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ওগো, এই নিয়ে আমি দু'বার পিরিয়ড মিস করেছি।' তার বুকের মধ্যেও ভিজে কবুতরের মতো তিরতির করে সে কেঁপে যাচ্ছে।

'৬ ডিসেম্বর আমার কোনও প্রোটেকশন ছিল না।'

রাখি কেঁপেই চলেছে। বুকে চেপে ধরে সে কাঁপুনি থামাতে পারে না হেমাঙ্গ। তাদের দু'জনকে ঘিরে অঝোরে আবার বৃষ্টি নেমে আসে।

১৯৯৮

রিক্তের যাত্রায় জাগো

জীবনের স্বাদ যারা পেতে জানে না, জানে না, কেশব তাদের একজন। তারা পেতে পারে না। মোটকথা, তারা পায় না। কেশবরা।

কেশব? কেশবই নাম। অবশ্য কেশব নাম নাও হতে পারে।

উপসংহারে তবু, কেশবের নক্ষত্রকেই দোষ দিতে হয়। অবশ্য, এ-রকম কোনও নক্ষত্র আদৌ দোষী নয় দেখা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, কেশবের জন্মকেই দোষ দিতে হবে। জীবনের এক্‌কেবারে শেষের দিকে এটা এই জন্মদোষ টের পাওয়া যায়।

কেননা, কত লোকে, এই কেশবরা, এরা দেখতে পায় না। এরা শুনতে পায় না। এরা খঞ্জ হ'য়ে থাকে। তাই দৌড়ুতে পারে না।

একটি ক্রাচে ভরে দিয়ে যতক্ষণ হাঁটা চলে, এরা হাঁটে।

তারপর, আর পারে না হাঁটতে।

তারপর, দাঁড়িয়ে পড়ে।

তারপর, ক্রাচ ছেড়ে ভূমিশায়ী হয়।

এইসব লোককে সচরাচর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তেই আমি দেখি। উল্টে, দু' একজনের মুখও দেখেছি। সেখানে যা পড়া যায় (পড়ে দেখেছি) তারপর পার্শ্বশায়ী কঠিন ক্রাচটি অস্তিত্ব বলে প্রতিভাত না হয়ে পারে না।

বোঝা যায়, অস্তিত্বের চেহারা কেশবদের ক্ষেত্রে বরাবরই এক-আকার; অর্থাৎ কিনা, তা দারুময়, এবং ঐ-রকম একটি লম্বাটে T-আকারের। তার যাত্রাপথ জুড়ে, এখান থেকে কেশবের সেই হাঁটি-হাঁটি প্রথম পদপাত পর্যন্ত লোহার নাল পরানো কাঠের কঠিন ও বিলম্বিত শব্দ পড়ে থাকে।

অস্তিত্বই মনে হয় ভূমিশায়ী ক্রাচটিকে। অস্তিত্বই নাম। অবশ্য অস্তিত্ব নাম নাও হতে পারে। কেননা, উল্টে দেখলে, কেশবের মুখে তখন যা পড়া যায় তাকে অবসান-ও বলা চলে। যেন, অবশেষে এই মুখ একটি পরিণতিতে এসে পৌঁছল। পাশে নিশ্চুপ T-আকারের লম্বাটে ক্রাচটি পড়ে রইল। এবং এতদিনে বোঝা গেল তা চিরকালই ছিল একটা ভর দেবার জিনিস বই আর কিছু না, এই সেই জিনিস যা ছিল কাঠের, যার পায়ে লোহার জুতো ছিল এবং যা কেশবের দুঃখে দুঃখিত হয়নি কোনওদিন। কান্নায় কাঁদেনি। কামে সঙ্ঘবদ্ধ হয়নি।

— মানুষীর মুখ দেখে কোনদিন

— মানুষের মুখ দেখে কোনদিন

— শিশুদের মুখ দেখে কোনদিন

এখন ঐ উপুড় হয়ে শুয়ে আছে ক্রাচটি। এর নাম অস্তিত্ব হতে পারে। অবশ্য নাম অস্তিত্ব নাও হতে পারে। পাশে শুয়ে আছে কেশব।

কেশবই নাম। অবশ্য নাম নাও হতে পারে।

কৃত্তিবাস, ১৯৭৪

বাস স্টপে তিন মিনিট

বাস স্টপে ফুটপাত ঘেঁসে রাস্তায় ফেলে-যাওয়া কিছু এঁটো খাবার, তরকারি কুটনো খোসা ও একরাশ ছেঁড়া চিঠি; কিছু তার নীলাভ।

আজ এক যুবককে দেখলুম।

চিঠির টুকরো ডানহাতের তর্জনী উল্টে নখরাঘাতে ঠেলে, বামহাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙুল দিয়ে আলতো তুলে সে খাবার খাচ্ছে। পয়-প্রণালীর কারণে টেনে আনা সি-এম-ডি এর একটি বাহান্ন ইঞ্চি কংক্রিট পাইপের গায়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত আগামী যাত্রা উৎসবের পোস্টারটি একটু আগেই কেউ মেরে দিয়ে গেছে। কাঁচা লেই ঝরছে তার গা থেকে।

পরপর দু'টি গাদাগাটি বাস এসে দাঁড়াল।

ছিটকে অনেক লোক নামে।

বাসের গাদন থেকে নামে আমাদের মেয়েদের নানারকম পাছা।

বাস দুটি চলে গেলে দেখা যায় একজন বুড়ো ছাড়া কেউ স্টপে দাঁড়িয়ে নেই। বুড়ো লাঠির ওপর থুত্নি রেখে রকে বসে। লাঠি থেকে গলকম্বলের মতোন ঝোলে তার ময়লা থলে। বসে সে জিরোয়। অদূরে যুবকটি।

একজন যুবককে এই প্রথম!

যুবজনোচিত উদাসীন, সে বসেছিল পাতা ভেঙে বাঁ-পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে। হাঁটুর কাছে দু-ভাঁজে মুড়ে ডান-পা সে বিছিয়ে রেখেছে। তার মেরুদাঁড়া এত ঋজু যে দেখে যোগের কথাই মনে পড়ে। অবশ্য যোগে একেই পবনমুক্তাসন বলে কিনা আমি তা জানি না।

কোথাও ছেঁড়া নয় এমন, তার পোষাক ছিল শ্যাবি। আর তার গালে মাত্র দিন তিনেকের দাড়ি। হাতে পরিত্যক্ত তরকারির এক টুকরো কুমড়ো।

কৃষ্ণের যেমন হাতে বাঁশি, পা ডিঙিয়ে পা, তেমনি এ কোন অ-দেখা দেবভঙ্গিমা!

আর কী নিঁখুত স্টাইলাইজড তার খাওয়া, ও সেই আলতো নির্বাচন! যেমন, এক টুকরো কুমড়ো টুক করে তুলে নিয়ে, শাঁসটুকু দাঁতে কেটে, সে ছালটা ফেলে দেয়; কেননা ছালের দিকটাই ছিল ছাই-এর ওপর! ছাই সে পছন্দ করে না খেতে।

কাঁটায় লেগে থাকা মাছটুকু সে গ্রহণ করে ঠোঁট ফাঁক রেখে, সে-জন্যে সে মাত্র ক্যানাইন বা কুকুর-দাঁতদুটি ব্যবহার করছে দেখা যায়। ফিটফাট কাঁটাটি দাঁতের মৃদু ও আদুরে চাপ থেকে দর্শনীয়ভাবে বেরিয়ে আসে।

ABC নামে একটি ত্রিভুজ যেন; ভূমির ওপর বৃদ্ধ ভারতবর্ষ, লাঠিতে থুতনি, গলা থেকে থলে। C বিন্দুতে সে, যুবাটি।

দু' ফিট লম্বের মতো আমি ভূমির ওপর সটান দাঁড়িয়ে; তার খাবার থেকে বীভৎস মৃত্যুগন্ধ A বিন্দুতে আমার নাক তবু কিছুতে এড়াতে পারে না।

গন্ধে এত রোখ যে নখের আঘাতে ঠেলে-বের-করা নির্বাচনোত্তর আরও একটি মৃত্যু টুকরো তার বাম হাতের মুদ্রায় দেখতে পেয়ে, দুটো ভিখিরি-ছেলে 'এ রে বা-বা-রে' বলে ফুটপাত ধরে পিছু হটে। তখন বিকেল বেলা; আকাশে শারদীয় নীল; মাত্র তিন মিনিটেই সে ও তার আহার্যকে ঘিরে এত অন্ধকার কোথা থেকে নেমে এল? সেই মৃত্যুভোজে মেশা

চিঠির ছেঁড়া মেয়েলি নীলাভা আকাশনীলের সঙ্গে ক্রমেই কৃষ্ণ, গভীর-কৃষ্ণ হতে থাকে।

A

B C
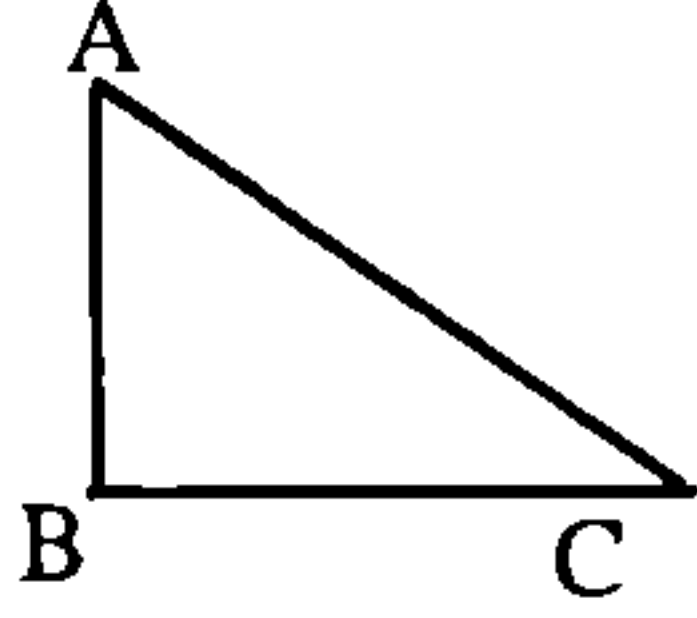
মনে কর ABC একটি ত্রিভুজ।

BC ভূমি এবং B বিন্দুতে AB উহার লম্ব।

প্রমাণ করিতে হইবে যে A, B ও C ত্রিভূজের এই তিনটি বিন্দুর মধ্যে A বিন্দুই C বিন্দু হইতে দূরতম স্থানে অবস্থিত।

প্রমাণ ঃ

যেহেতু, BC ভূমি এবং AB, B বিন্দুতে উহার উপর লম্ব।

∴ $\angle ABC = 90^0 =$ এক সমকোণ।

সমকোণের বিপরীত বাহু অতিভূজ।

∴, AC একটি অতিভূজ।

কিন্তু, অতিভূজ ত্রিভূজের বৃহত্তম বাহু।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

∴ A বিন্দু C বিন্দু হইতে দূরতম স্থানে অবস্থিত।

সাপ্তাহিক নতুন বাংলা, শারদীয় ১৯৭৬

মহাপ্রস্থানের পথে

১

মমতা যে এসেছে, সঙ্গেই চলেছে, এ রকম একটা অনুভব তার আগাগোড়াই ছিল। কনখলে আনন্দময়ীর আশ্রমেরর দিকে সে যখন ছুটন্ত টাঙ্গায়, ফেরার পথে, সাঁ করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল যে অটো, তাতে কি মমতা এ পাশটায় ছিল না? সঙ্গে বাবা-মা আর দাদা বিবেকানন্দর থাকার কথা। তাদের দেখা যায়নি। চঞ্চল দেখার আগেই-তাকে দেখতে পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিল মমতা? কিন্তু কেন? সে কি আর ইশারা করত। সে তো শুধু দেখে রাখত। জেনে রাখত।

ওর যখন ১৬, হা-সে দিয়ে কলেজে ঢুকেছে কি ঢোকেনি। সেই তখন থেকে টানা ১০টি বছর ধরে অ্যাপোর পর অ্যাপো। একটাও মিস করেনি কখনও। অপেক্ষা করলে, অপেক্ষা করলে, ধৈর্য্য ধরে থাকলে, শেষ পর্যন্ত ঠিকই দেখা যেত—ওই যে আসছে। চোত-বোশেখের গরম চাতাল পেরিয়ে মিউজিয়ামের শুকনো ফোয়ারার পাশ দিয়ে যেদিন এল, গায়ে র‍্যাপার-মুড়ি, ধুম জ্বর, বসন্তের গুটি দু-একটা তখনই বেরিয়ে পড়েছে মুখে। মাঠে-পার্কে-রেস্তোরাঁয় সিনেমা-থিয়েটারে (সে বছর ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তো রোজ দু থেকে আড়াইটে ছবি) কোথায় না—তবে সবচেয়ে বেশি গেছে মমতা চাক্‌রিতে ঢোকার পর, বোধহয় হেস্টিংস স্ট্রিটের কবরখানাতেই। এটা ছিল অফিসের সবচেয়ে কাছে। খোদ

ডালহৌসি পাড়ার মরুভূমিতে উন্মুক্ত এ মৃত্যুপ্রাঙ্গণে, জোব চার্নকের গোলগাল সমাধিটি ছিল মরুদ্যানের মতো। কবর তো নয়, বিরাট বাইজানটাইন গম্বুজ, লম্বা লম্বা গ্রিসিয় থাম—সব মিলিয়ে একটি সমাধি-সৌধই বলতে হয়। এর ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালে কার সাধ্য টের পায় ভেতরে কেউ আছে। প্রবেশকালে, যুগলে দেখলেও, সন্দেহের কিছু নেই। কলকাতার জনকের সমাধিস্থল। ঐতিহাসিক আকর্ষণ। শিক্ষিত যুবক-যুবতী আসতেই পারে। এখানেই, সমাধির অন্ধকার অভ্যন্তরে, পদশব্দ নিকটবর্তী বুঝে চঞ্চল তড়িঘড়ি বোতাম লাগিয়ে দেয় মমতার জামায়। ফস করে দেশলাই জ্বালিয়ে সেই প্রথম ওরা মস্ত ও বিবর্ণ সমাধিফলকটি পড়তে থাকে দুজনে একসঙ্গে ও এক মনে। যেন যদস্তু হৃদয়ং তব, পাঠ করছে যুগলে। দেশলাইয়ের কনে-দেখা আলোয় সেই একবার মমতাকে। একেবারে অন্যরকম দেখিয়েছিল।

২

৬ জুন, সন্ধে ৬টা। দুগ্ধশুভ্র মন্দাকিনীর ওপর সেতুর ঠিক মাঝখানটিতে মমতা একা দাঁড়িয়ে। মে মাসের ১৭ তারিখে লিন লিন হুয়া রেঁস্তোরার ঢাকা কেবিনের মধ্যে তাদের পরবর্তী এ্যাপো ঠিক হয় হাতে-হাত রেখে। ঠিক করে মমতাই। বাবা-মা আর দাদার সঙ্গে গাড়োয়াল মণ্ডল নিগমের বাসে হৃষীকেশ থেকে গৌরীকুণ্ড। সেখান থেকে কেদারনাথ। কেদার থেকে বেলাবেলি বদরিনাথ। 'তা হলে ওই কথাই-কথাই রইল। মন্দাকিনী ব্রিজ। সঙ্গে ৬টা। বদরিনাথ। এই কথা বলে মমতা শেষবারের মতো ওর বুকে চঞ্চলের মাথা টেনে নেয়। বুকের বোতাম তখনও খোলা। চঞ্চল লাগিয়ে দেবে, তবে। প্রথম দিন ধুর্জটি পালিতের ফ্ল্যাটে, 'না-না, আমি খুলছি,' বলে হাত ভাঁজ করে পিঠে পাঠালে, চঞ্চল প্রবল আপত্তি করে বলেছিল, মেয়েরা নিজে খোলে তো ডাক্তারের কাছে' আর এই কথা শুনে চোখ কপালে তুলে সেই যে দমকা হাসতে শুরু করেছিল মমতা, সেই হাসি আর থামাতে পারেনি। কিলিয়ে থামাতে হয়েছিল। সেই থেকে। তারপর বহুদিন পর্যন্ত, 'আসুন ডাক্তারবাবু,' 'বসুন ডাক্তার বাবু' বলে কম ঠাট্টা করেছে।

ওপারে বদরিবিশালের মন্দির। মন্দির থেকে মাইকে ভেসে আসছে সমবেত স্তোত্রগান: ওঁ বদরিনারায়ণ:, বদরিনারায়নেৎ.....নীচে দুগ্ধশুভ্র বললে ভুল, ছোট্ট দুধের নদী নেমে যাচ্ছে দু'কুল আছড়ে। মাঝে মাঝে ছিটকে লাফিয়ে উঠে ব্রিজ ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে হিমশীতল দুগ্ধস্রোত। মন্দিরের পিছনে আপাদমাথা রুপোলি—সাদা নীলকণ্ঠ পাহাড়। স্বয়ং বদরিবিশাল। দু পাশে কৃষ্ণকান্ত দুই প্রহরীর মতো নর ও নারায়ণ পর্বত। মন্দিরের গায়ে আদুড়গায়ে স্নান করছে কিছু তীর্থযাত্রী। হু-হু হাওয়া। আসার সময় পাণ্ডুকেশ্বর থেকে হনুমানচটি পর্যন্ত পথের দুধারে বরফের স্তূপ।

মমতার গায়ে চামড়ার জ্যাকেট। মুখ রক্তচাপে লাল। তার ঠোঁট ফেটে-রক্ত জমে আছে। এই প্রবল হাওয়ায় সে চুল খুলে দিয়েছে। স্রোতস্বিনীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়ছে তার চুলের তোড়। তার নিজস্ব পতাকা।

'আজ শীত কত জানো?'

'না-তো।'

'—২ ডিগ্রি।' একটু থেমে জানালো, 'সেন্টিগ্রেড।'

'বাবা-মা?'

'মন্দিরে।'

'বিবেকানন্দ?'

'বিবেকানন্দ বলতে চিন্ময়। মমতার দাদা। ওর নাম বিবেকানন্দ চঞ্চলই রেখেছে। সবসময় বুকের ওপর ভাঁজ করা দুই হাত। টি-শার্ট ছাড়া পরে না। তাতে কিছু না কিছু লেখা থাকে। যেমন—কিপ অ্যাওয়ে ফ্রম মি। ব্যস্ত প্রমোটর বাবার পক্ষে বোনের দেহরক্ষী। মমতার সংস্পর্শ ছাড়াতে, মাস খানেক আগে সবান্ধবে মেরে একবার তক্তা করে দিয়েছিল চঞ্চলকে। হাসপাতালে ওরাই রেখে এসেছিল। মমতা দেখতে এসেছিল। 'এবার ছেড়ে দাও আমাকে,' ডিলিরিয়ামের মধ্যে চঞ্চল নাকি বলেছিল, 'আমি আর কখনও সাড়া দেবনা তোমার নিশিডাকে।'

সে কথা থাকেনি। মমতা রাখতে দেয়নি। উত্তরে সেদিন বেডের পাশে টুলে বসে, কোমর পর্যন্ত খোলা চুল পাকিয়ে পাকিয়ে তুলে খোঁপায় বাঁধতে থাকে।

৩

তবু ভালো যে বিবেকানন্দ আসেনি। এখানে এই বদরিনাথেও এ্যাপো, ভাববেই বা কী করে। মমতা জানতে চাইল, 'কোথায় উঠেছ?'

'কোথাও না। সকাল থেকেই তো ঘুরছি শুধু, দেখি কোনও ধর্মশালা-টালায় কালি কমলিওয়ালিতে থেকে যাব ভাবছি। একদম ফ্রি।'

'শোনো বলি,' মমতা বলল, 'কমলিওয়ালি থেকে নেমে গেলেই গাড়েয়াল মণ্ডলের দোতলা বাড়ি। টুরিস্ট রেস্ট হাউস। তুমি ঠিক রাত ৮টা নাগাদ ওখানে এসো। আমার আলাদা ঘর আছে। ঘরে ফায়ার প্লেস। তুমি আজ রাতে ওখানেই থাকবে।'

মমতার কথার অবাধ্য চঞ্চল কখনও হয়নি। তাদের দুজনের ব্যাপারে যা ভালো, মমতাই বরাবর বুঝেছে। মমতার কথামত সে ঠিক ৬ টার সময় সুদূর তালতলা থেকে ১০,০০০ ফুট-উঁচুতে মন্দাকিনী সেতুর ওপরেও হাজির হয়েছে। কিন্তু আজ সে অস্ফুট স্বরে শুয়ে 'সে কী,' না বলে উঠে পারল না। যদিও শেষ পর্যন্ত মমতার কথাই থাকলো। রাত ৮টা। বাংলোর পাশেই একটা টিলা। টিলা থেকে নেমে পেছন দিকে একতলার ঘর। ব্যালকনির দিকের দরজা খোলা থাকবে। যদিও ঘর অন্ধকার। মমতা দাঁড়িয়ে থাকবে দরজায়। অন্ধকারে মমতার স্যিলুয়েট চিনতে পারবে না চঞ্চল?

৪

একে তো দারুন শীত। তার ওপর সারারাত বরফ-বৃষ্টি। ভোরবেলা মমতারই আগে ঘুম ভাঙল। জানলার সার্সিতে কে ছোটো ছোটো টোকা দিচ্ছে না?

ওমা, কী সুন্দর রঙ্গি-বিরঙ্গি প্রজাপতি একটা। এত শীতে কী করে যে বেঁচে ছিল। সারা বদরিশালে হয়ত ওই একটাই বেঁচে আছে। মরেই গিয়েছিল নিশ্চিত। প্রথম সূর্য কিরণ—গায়ে লাগতেই পুনর্জন্ম হয়েছে। বা, কে জানে, হয়ত অমর। যেন রক্তের সাত আঙুল বাজনা বাজাচ্ছে সার্সির কাচে। শুধু একটি কাচেই বরফ লাগেনি। বাকিগুলো বরফে সাদা। ঝটপট করছে। তামরতা চাইছে বাঁচতে। ভেতরে আসতে চাইছে।

মমতা জানলা খুলে তাকে ডাকে। উচ্চারণ করে বলে, 'আয় রে।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজায় টোকা।

'মোমো, রেডি হও তাড়াতাড়ি। মা ডাকছেন। মমতাদের আজ টুরিস্ট বাস নিয়ে যাবে বসুধারা প্রপাতে। বদরি থেকে ১০০০ ফুট উঁচুতে। ৮ কিমি দূরে।

'গাড়ি এসে গেছে।' মমতা ভেতর থেকে বলল।

দরজা খুলে দেখল মা একা। বললেন, 'বাবা গাড়িতে বসে।'

'এসো মা।' বলে মমতা হাত ধরে মাকে ভেতরে নিয়ে এল।

আজকাল রবিবাসর, ১৮ এপ্রিল ১৯৯৯

ভালোবাসার শেষটা

আমার বিয়ের মাসখানেক আগে পর্যন্ত আমি ঘনশ্যামকে ডেট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তারপর যেদিন এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে, 'গড়িয়াহাটের মোড়ের শোভা' থেকে শেষ পর্যন্ত নিজেই পছন্দ করে সাদা বেনারসিটা কিনলাম, তখনই ঠিক করলাম, আর না। তাহলে, আগামীকালই হোক আমাদের শেষ দেখা।

'বেনারসি কেনা হয়েছে'— এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে। যা বোঝার তাতেই বুঝে যাবে। বিয়ের ডেটটা ঘনশ্যামই বারণ করেছে জানাতে। প্রায় হুবহু একই গল্পে দিলীপ মিত্র—তখন ওরা আর জি কর-এ একই হোস্টেলে রুমমেট আর ফাইনাল ইয়ারে—ভাগ্নির ফুলশয্যার রাতে ঘাটশিলায় চলে যায় এবং সেদিনই সুবর্ণরেখার তীরে আত্মহত্যা করে। অশ্বত্থের-শাখা থেকে নতমস্তকে ঝুলে ছিল সারাটি রাত। বিয়ের দিনটা আগে থেকে জানত বলেই না!

ওদের অবশ্য ছিল প্রায় ইনসেস্ট অ্যাফেয়ার। মেজদির মেয়ে। পিসতুতো খুড়তুতো হলেও কথা ছিল। উপায় ছিল না। অবশ্যি, উপায় আমাদেরও নেই। ঘনশ্যামের বউ-বাচ্চা আছে। অন্য কোনও চিন্তা-ভাবনা থাকলে অন্তত-উকিলের কাছে যেত। আর ডিভোর্স যদি হয়ও পাঁচ আর তিন বছরের দু-দুটো বাচ্চার পরিপ্রেক্ষিতে যে বিবাহিত জীবনের শুরু তার ভবিষ্যৎ কি খুব উজ্জ্বল?

ভালোবাসার দাম গায়ে-গতরে গত পাঁচ বছর ধরে আমি যথেষ্ট দিয়ে গেছি—এভাবে দিয়েও যেতাম, যদি-না রজত এসে পড়ত। হঠাৎ দেখি, আরে! আধখানা চাঁদ আটকে আছে টেলিগ্রাফের তারে।

এদিকে বয়সও তিরিশ ছুঁলো বলে। মেয়েদের হিসেবে তো মধ্যাহ্নও নয়—রীতিমতন অপরাহ্ন। বাথরুমে টুলে বসে স্নান করতে গিয়ে হঠাৎ লক্ষ করেছি, পেটের মাংস আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে, বোধ হয়তো রাতারাতিই, কত উপখাঁড়ি আর খাঁড়িবহুল হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, মিস্ট্রেস হয়ে থাকলে সারাজীবন থাকা যায় এভাবে, তবে সন্তানহীনা মিস্ট্রেস শেষবিচারে এক মহার্ঘ যৌনপুতুল ছাড়া কী? নায়ক-নায়িকার ভূমিকার অবসানে বাবা মা-র ক্যারেক্টার রোল পাবার সম্ভাবনা সে চিত্রনাট্যে কোথায়? ওর ছোটভাই বনবিহারী কি আমাকে 'বৌদি' বলবে কোনওদিন নাকি ভাগ্নি 'মামি' বলে ডাকবে? অতএব, যে-দিক দিয়েই ভেবে দেখা যাক না-কেন, আমাদের যার পর নেই অলাভজনক লগ্নী। তাই যেদিক থেকেই দেখি, আমার বিবেক বেশ সাফ-সুতরো। তাছাড়া পাঁচ বছরে একটিবারের জন্যেও

তো উকিলবাড়িতে গেল না। অবশ্য আমিও চাপ দিইনি। আমার বেরিয়ে যাবার রাস্তাটা তাই এখনো খোলা।

'তোমার বিয়ের দিনটা ঠিক কবে, আমাকে বলবে না।' দিলীপ মিত্রের গল্প বলে ঘনশ্যাম আমাকে বলে রেখেছে, 'আমি ওটা জানতে চাই না।'

ওর মনের জোর দেখে আমি অবাক। ভরসাও পেয়েছি যথেষ্ট। সত্যি কথা বলতে কি, ওর এই স্ট্যান্ডটায় পুরোপুরি আস্থা না-রাখতে না-পারলে রজতের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে আমি অগ্রসর হতেই পারতাম না। তৈরি করা ছাড়া কী? সবটা বানানো। অন্তত, আমার দিক থেকে। ঘনশ্যামকে পূর্বাপর ও যথারীতি ডেট দিতে দিতেই আমি রজতের সঙ্গে এই কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করেছি। একসঙ্গে দু-ঘাটের জল খেয়ে গেছি, যতদিন সম্ভব। প্রথমে চার ফেলে কাছে এনে, তারপর বঁড়শিতে গেঁথে খেলিয়ে একদম ডাঙার কাছে এনে যখন আব-একটি খ্যাঁচ মারার অপেক্ষা, আমি তখনই ঠিক করলাম—তা হলে আর না।

বেনারসি কেনা হলো, বিয়ের দিনটা বলতে বারণ করলেও, ঘনশ্যাম আমাদের ব্যাপারটা সবই জানত।

এ নয় যে, লুকিয়েছি কিছু কখনও, ওর কাছে। এমনও হয়েছে, সারা দুপুর রজতের সঙ্গে কাটিয়ে সন্ধেবেলা ছুটে গেছি ঘনশ্যামের কাছে। যেভাবে পাখি ফেরে নীড়ে। না-না, ভুল। যে-ভাবে দিনান্ত রিপোর্টার ফেরে তার কাগজের অফিসে। নিউজ এডিটরের সামনে দাঁড়ায়।

'আজকের ডেভেলপমেন্ট কী, বলো?'

'আজ তারা দেখাল রজত।'

'তারা? দুপুরবেলায়!'

'হ্যাঁ তারা। দুপুরে তারা দেখা যায় না নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে কেমন বুঝতে পারল তারামণ্ডলে গিয়েছিলাম আমরা। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, রজত হলে মাথায় হাতুড়ি মেরে এইসব পেরেক বসাতে হতো। তবু রজত। ঘনশ্যামের প্রেম তো আমাকে সারাজীবনের গ্যারান্টি দিতে পারে না। তা সে যতই সাঁচ্চা হোক। তাই রজত। হোক শূন্য, কিন্তু সেটাই উত্তর। আমি উত্তরমালা দেখে নিয়ে অঙ্ক কষতে বসেছি।

'কী হলো ওখানে বলো?'

'কী আবার হবে?'

'কিছুই হলো না? অত অন্ধকার।'

'হবে কী করে। মনে হলো এই প্রথম মুখ তুলে আকাশ দেখছে। তারা-ফারা বলতে চেনে শুধু চাঁদ আর সূর্য। শুকতারা যে শুক্রগ্রহ তাই জানে না। সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে স্ট্রেটলাইন টেনে লুব্ধক দেখাচ্ছি যখন—'

'দেখাচ্ছ যখন?'

'বহুক্ষণ ধরে উশখুশ করছিল। শেষে একবার আমার হাতের ওপর হাতটা রাখল—'

'তারপর... তারপর? তুমি নিশ্চয়ই হাতটা টেনে নিলে?'

'সুযোগ পেলাম কই। রেখেই, যেন রাখতে চায়নি—হাতে হাত লেগে গেছে—স্যাঁৎ করে টেনে নিল হাতটা।' বুঝতে পারি আমার কন্টাক্ট লেন্স সরে যাচ্ছে গভীর কটাক্ষে, 'তোমার মতো নাকি সবাই? বিশ্বকর্মা পুজোর দিন প্রথম দেখা, সপ্তমীর দিন কিস। তা-ও কি শুধু ঠোঁটে? অষ্টমীর দিনে ফার্স্ট অ্যাটেম্পট, কিছুতেই পারে না, নবমীর দিনে দুটো

ট্রফি-ফার্স্ট হাফ অ্যাণ্ড সেকেন্ড হাফে দু-দুটো গোল।'

সেদিন আমরা বসেছিলাম পুরনো নিউমার্কেটে ফ্লুরির ছোট দোকানটার দোতলায়। প্যাসেজের দিকটায় সিলিং পর্যন্ত গ্লাস-প্যানেল। সাদা-লাল টিউনিক পরা ওয়েটার। ঘনশ্যাম বলে, বেশ বিলেত বিলেত লাগে। বিলেত বলতে আমেরিকা। ও যেখানকার এম-ডি। ওখানে ছোট শহরের ড্রাগ স্টোরগুলো নাকি এরকম। অবশ্য ওখানে নাকি বই, কফি, সিগারেট, কোল্ডড্রিঙ্কস, কেক-প্যাস্ট্রি মায় প্যারগেটিভ, কনট্যাসপটিভ থেকে বার্ডস, বিয়ার—সব মিলিয়ে এক হরেকরকমবা।

শীতের সকালবেলা। ৯টা-ফটা হবে। সবে মার্কেট খুলেছে। লোকজন কম। তাছাড়া মার্কেটের শব্দ এ-দোকানে ঢোকে না। শীতাতপের সঙ্গে শব্দও এখানে নিয়ন্ত্রিত।

এই সাতসকালে আমরা এখানে এসেছি চ্যাপলিনে 'বাই বাই ব্লুজ' নামে ফেস্টিভ্যাল ফিল্মটা দেখব বলে। আমিই টিকিট কেটেছি।

বেনারসি কেনা হয়েছে শুনলে যা ভেবেছিলাম; যা বোঝার তখুনি বুঝল।

'দিন ঠিক হয়ে গেছে?'

কাঁধ পর্যন্ত মাথা হেলিয়ে আমি বললাম, 'হ্যাঁ'।

কিন্তু ওর মুখ থেকে চোখ সরালাম না।

যা আশা করেছিলাম। একপলক যেন অন্ধকার, কিন্তু তারপরেই পট করে আলো জ্বলে উঠল।

'বাঃ' ঘনশ্যাম বলল, 'কে পছন্দ করল? মা না-বৌদি?'

'পছন্দ আমিই করলাম। যদিও মা সঙ্গে ছিল।'

'কী-রঙ পছন্দ করলে?'

'সাদা। পাড়ে রুপোলি কাজ।'

'রজত সাদা পছন্দ করবে?'

'তুমি শুনলে অবাক হবে, আমিও তাই হয়েছিলাম, যখন শুনলাম রজতের সাদাই পছন্দ।'

চোখের সাদা ধূসর কনট্যাক্ট মণি ওর প্রতি অকম্পিত রেখে আমি হেসে বললাম, 'এই যা, রজতের কথা ওঠার-তো কথা ছিল না।'

ওর একটা বড়সড় প্রশ্বাস পড়ছে দেখে আমি অবাক। এমনও তো কথা ছিল না। তা, সব কথাই কি আর অক্ষরে অক্ষরে রাখা যায়, না মানুষ রাখতে পারে।

আমি আস্তে আস্তে হাতদুটো ধরে জানতে চাইলাম 'এই, তুমি কি জেলাস হয়ে পড়ছ?'

উত্তরে ঘনশ্যাম কী বলল আমার শোনা হলো না। কেননা, এইসময় সদ্যখোলা নাহুমের মধ্যে কেক কিনছিল এক মৌন দম্পতি, লাল পশমে মোড়া ওদের ফুটফুটে বাচ্চাটা, টলোমলো পায়ে কাচের দরজাটা ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়াল। মা-বাবা এখনো জানে না কিছুই। একি, একি, সে যে এই দিকেই আসছে। এখনো বেশি দোকান বন্ধ আর প্যাসেজেও কেউ নেই। কেউ যদি তুলে নেয়? মেয়ে-বাচ্চা বলে কথা! আরব কানট্রিজে চালান দিতে পারে!

না, না, ওই যে নাহুম-এর থলথলে মোটা ইহুদি মালিক নিজেই উঠে যাচ্ছেন বিচ্ছুটাকে ধরে আনতে।

আগাগোড়া মাস্টার শটে এক সাইলেন্ট পিকচার যেন।

উৎকণ্ঠায় উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আমি বসে পড়ি। অবশ্য বেনারসি কিনেই যে সিদ্ধান্ত নিলাম, তা না-ও হতে পারে। বেনারসি কেনা হলো আমার কৈফিয়ত, বরফের ওপর

রক্তের ফোঁটার অনেকখানি জুড়ে বরং সেখানেই পড়ে আছে।

একদিন রজত আর একদিন ঘনশ্যাম; এমন-কি একই দিনে রজত সেরে তারপর ঘনশ্যাম—এ জিনিস করতে করতে আমি শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। রজতের সঙ্গে ব্যাপারটা ছিল বরং অনেক স্বস্তির আর সহজ। সে তো ঘনশ্যামের অস্তিত্বের কথা জানেই না। স্বস্তিকর বলেই মিলেমিশেও যাচ্ছিলাম অনেক সহজে। ওর জন্য দুর্বলতা তৈরি হচ্ছে, টের পাচ্ছিলাম, আহা, বাচ্চা ছেলে! আমার চেয়ে হিসেবমতো সে বছর দুই ছোট; জানাতে বোকাহাবাটা বললে কিনা, 'তাহলে ওদিকে দু'বছর পুষিয়ে দিও।' শুনে আমি যা বোঝার বুঝেও ওর মুখে শুনতে চাই, আর তাই ওর মতোই, বোকাহাবা মুখে তাকাই, আর যেই বলেছি, 'মানে?' —অমনি খপ করে হাতটা চেপে ধরে। 'তাহলে দু'বছর পরে রিটায়ার করবে। আমি তখনও ন্যাকা সেজে যেই না বলেছি, 'চাকরি?'— অর্থাৎ আমার—অমনি পিপিং রেস্তোঁরায় ঢাকা কেবিনের মধ্যে এক ঝটকায় বুকে টেনে নিয়ে যা-যা করল—বন্ধ ঘর হলে সেদিনই শেষ দেখে ছাড়ত। সেদিনই তখন ঘনশ্যাম বসে আছে, আমারই জন্য সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ কফিহাউসে। ওখানে ওর বন্ধুবান্ধব আছে, সময় কেটে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বসে তো আছে আমারই জন্যে। প্রায় ঘন্টাখানেক দেরি হলো পৌঁছতে।

এমনটা যাতে না-হয় সেই চেষ্টাই করি। কিন্তু রজতের সঙ্গে উঠতি সম্পর্ক আর সে যদি অফিসে হঠাৎ ফোন করে পীড়াপীড়ি করে যে 'আজই'—'না' বলতে পারি না। তাছাড়া তার ওপরেই বাকি জীবনের বাজি ধরেছি। কিন্তু সেদিন ঘনশ্যামকেও বলা ছিল আর তখন তা ক্যানসেল করারও উপায় নেই। ঘনশ্যামের কাছে পৌঁছলে সে কতটা বুঝতে পারছে—আদৌ পারছে কি না সেটা অবশ্য একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

আজকাল যত দেরিই হোক ঘনশ্যাম অপেক্ষা করে। কফিহাউস বন্ধ হয়ে গেলেও বাইরে একা দাঁড়িয়ে থাকে। আজকাল একটা পাঁচিল উঠছে দুজনের মাঝখানে। আগে সব বলতাম। আজকাল ও কখনও জানতে চায় না, এত দেরি হলো কেন। আমিও তো বলি না। বিয়ের দিনের মতো এটাও যেন বলা বারণ, রজতের সঙ্গে অ্যাপো থাকলে সাজগোজ আমাকে একটু বেশিই করতে হয়। আজকাল তো ঠোঁটে রঙ লাগাই, অবশ্য সেটা শুধু রজত যেদিন।

ঘনশ্যামের দিন একদম দরকার করে না। ঘনশ্যাম পুরনো চাল, ভাতে এমনই বাড়ে। অথচ যেদিন পিপিং কাণ্ড, লেডিজ রুমে গিয়ে যতই ঠিকঠাক করে এসে থাকি, বেশ বুঝতে পারছিলাম অন্তত ঠোঁটটা বেশ লাল হয়ে ফুলে থাকারই কথা—এবং আছে—যা রজত সেদিন টানতে টানতে প্রায় তার কণ্ঠনালি অবধি টেনে নিয়ে গিয়েছিল, আর আমিও ছাড়ছিলাম যতটা পারি। আমার ঠোঁটে এখনো একটুও মাংস লাগেনি। এখনো সেই বেলুনের চামড়ার মতো পাতলা। সেই ষোল বছরে যেমনটি ছিল।

কিন্তু, এভাবে আমি আর পেরে উঠছিলাম না যেন। আর এই আত্মগ্লানি আর দোটানা, যা আমাকে পাগল করে দিচ্ছে দিনের পর দিন, আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, ঘনশ্যাম যে শুধু এটা বুঝেও বুঝতে চাইছে না, তা নয়—দোটানার মাঝখানে দুলতে তার বেশ ভালোই লাগছে। তার দোটানা বলতে আমি আর ওর স্ত্রী সুপ্রভা। ওর স্ত্রী সুপ্রভা সম্বন্ধে আমি যা জানি—সে তো একটা খড়ের কাঠামো। রক্তমাংস নেই। বিছানা-যোগ্যতা যেটুকু ছিল, আমি আসার পর সেটুকুও সে হারিয়ে বেঁচেছে। মাঝে দু-একবার ঘনশ্যামের ট্রাউজারের পকেটে কনস্ট্রাসেপটিভ পেয়েও একটা কথা বলেনি। সে, কে, কী, কেন, কবে, কোথায়—বলবে যে, সে-মুরোদ কোথায়! করুণাই করি আমি তাকে। আমার বিছানা-যোগ্যতা প্রমাণিত এবং পাঁচ বছর ধরে যতবার, ততবার ঘনশ্যাম মুখে না-বলেও আমাকে

বুঝিয়ে গেছে, যদিও দুই সন্তানের বাবা নারী-শরীর বলতে যা, সে-অভিজ্ঞতা ওর জীবনে এই প্রথম। ওর বৌ তো শুনলাম, জামাকাপড়ই সব খোলে না। আর আমি? লজ্জা-শরম খুলে তবে খাটে উঠি। এদিকে থেকে আমি করুণাই করে এসেছি ওর স্ত্রীকে, বরাবর। হিজড়ে, নান ও অযৌন স্ত্রী আমার কাছে একই। কারণ তিনজনেই প্রকৃতির ইচ্ছার বিরোধিতা করছে। তিনজনেই প্রতিবন্ধী।

অথচ, স্ত্রী সুপ্রভাকে একটু তাচ্ছিল্য করলেই কত শক্ত হয়ে যায় তার চেয়াল। মুখচ্ছবিই যায় বদলে। ওর স্ত্রী ওর কাছ থেকে যেটা পেয়েছে সেটা আমি কিছুতেই পাচ্ছি না, আমি পদে পদে টের পেয়েছি। ও যখন আমার বিছানা-যোগ্যতার প্রশংসায় মুখর (সে কথায় বা কাজে যাই হোক)—আমার মনে হতে শুরু করল, এ যেন এক রয়াল বেঙ্গলের মধ্যাহ্নভোজন—আমার দুই উরু-নিতম্ব, রবার গাছের কাণ্ডের মতো পিচ্ছিল উরুদ্বয়, বেদীর মতো তলপেট, তথা পাকা পোনার পেটির মতো যোনি (অলংকরণ ঘনশ্যামের)—এ সবই ওর স্ত্রীর মধ্যে কেন পায়নি—কেন পায় না—এটাই যেন ওর আসল আক্ষেপ। এইসব গেঁড়িগুগলি ও-ঘাটে পেলে আর এ-ঘাটে ঘাই দিত না। মাঝে মাঝে সন্দেহ হতো, এটাই যেন আমাদের যৌন সম্পর্কের মর্মবাণী—ওর দিক থেকে। আবার এ-ও ঠিক যে, ওর স্ত্রী আর আমি যেন দুদিক থেকে আসা সমুদ্রের দুটি ঢেউ—আর ও চাইছিল এ-ভাবেই দুই ঢেউ-এর দোলায় যতদিন সম্ভব দুলে যেতে। ওর এই আত্মপ্রসাদ, এই নার্সিসাস-সুখে বাধা দিতেই আমি খেলাচ্ছলে মঞ্চে ডেকে আনি রজতকে।

অবশেষে যেদিন অফিস থেকে বেরিয়ে মনে হলো, আজ আবার কার সঙ্গে অ্যাপো—রজত না ঘনশ্যাম, ৬টার সময় আমি আজ কোথায় যাব—পিপিং না কফি হাউস—কিছুতেই মনে করতে পারলাম না যে কে,—সেদিন কান্না পেল। সেদিন ঘেন্না হলো। মনে হলো আমি পাগল হয়ে যাব। বা, গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আমার সামনে কোনও পথ নেই।

ঠিক করলাম পিপিং-এই যাই। যদি দেখি রজত বসে আছে, তাহলে ওকে ঘনশ্যামের অস্তিত্বের কথা আজ বলব। লতাতন্তুময় জালের কেন্দ্রে যে বসে আছে, যাকে মারতে গেলেই দেখছি, তার বদলে আমি বসে আছি কেন্দ্রে। আমি পারছি না।

রজত এগিয়ে অসুক। ছিঁড়ে ফেলুক জাল। বাঁচাক আমাকে। আমাকে অর্জন করুক। নাটকে, সিনেমায় এর চেয়ে অনেক কম কারণে খুনোখুনি হয়। নাটক, সিনেমা এসব তো মানুষের কল্পনা, আর্ট। আসলে ব্যাপারটা তো জন্তু-জানোয়ার লেভেলের। বলশালী কুকুর এসে যেভাবে অনুসরণকারী নেড়িদের হটায় ও কাঙ্ক্ষিতকে অধিগত করে, সে সেভাবে আমার কাছে আসুক। ঘনশ্যামকে সে পাড়া-ছাড়া করুক।

হায়রে, সেদিন রজতের দিন নয়। একঘন্টা কেবিনে বসে থেকে, একপ্লেট চপ স্যুয়ে খেয়ে ভরা পেটে কফি হাউসে গিয়ে দেখি বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘনশ্যাম সিগারেট খাচ্ছে। শীতের রাত। সে ছাড়া গলিতে কেউ নেই।

ঘনশ্যাম,

যদিও তুমি জানাতে বারণ করেছিলে, ১৩ নভেম্বর রজতের সঙ্গে আমার বিয়ে। সঙ্গে নিমন্ত্রণপত্র। এখনো দিন-পনেরো দেরি। নিমন্ত্রণপত্রে রজতের ঠিকানা রয়েছে।

ওই ঠিকানায় তুমি, পত্রপাঠ, আমার ২/১ টা ন্যুড ছবি পাঠিয়ে দাও, যা তুমি একদিন শখ করে তুলেছিল। তারপর যা হবার তা হবে।

আমি কাল সারারাত জেগে বসেছিলাম। যতদূর ভাবা সম্ভব ভেবে দেখলাম। ভেবে

দেখলাম, লোকাল অ্যানাসথেসিয়া করে নিজের হাতে নাকের পাটা ফুটো করে তোমার জুয়েলার বন্ধু বি. সরকারের দোকানে নিয়ে গিয়ে যে-হীরের নাকছাবি তুমি পরিয়ে দিয়েছ, তা খুলে ফেলার সাধ্য আমার নেই।

আমার সামনে এখন দুটো রাস্তা। এক : সারাজীবন রজতের কাছে তোমার কথা লুকনো। অথবা....রজতের কাছে যাবজ্জীবন জেল খাটার তুলনায়, তোমার দেওয়া রজ্জু গলায় বেঁধে আত্মহত্যা করাটাই আমার কিছুটা সম্ভ্রান্ত বিকল্প বলে মনে হলো।

ইতি
তোমার
দাসী, বাঁদি, অথবা রক্ষিতা
কণিকা।

একা এবং কয়েকজন, শরৎ, ২০০০

সরমার পুত্রকন্যা

রাতে বাড়ি ফিরে খামটা যথারীতি ফ্রিজের ওপর রেখে রোজকারের মতো শ্যামলেন্দু জানতে চাইল, 'কেউ ফোন করেছিল?'

মানালি বলল, 'কুলু করেছিল।'

কুলু মানালির ছোটোবোন। মানালি মায়ের পেটে আসে প্রায় বিনা নোটিশে নবদম্পতির একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায়, মানালিতে হনিমুন পর্বে। বাবা ডা. ধরণীধর মল্লিক ছিলেন উঠতি গায়নকোলজিস্ট। ভাগ্যিস সেই সঙ্গে ছিলেন বেশ রোমান্টিকও। মা পীড়াপীড়ি করলেও মধুচন্দ্রিমার সন্তান বাবা নষ্ট করতে দেননি। ছোটো বোন আসতে আরও চার বছর। যদিও তারই মতো বোনের জন্ম হ্যারিংটন স্ট্রিটের নার্সিং হোমে আর সেই ডা. অমিয় পাইনের হাতেই—কিন্তু দিদির নাম মানালি হলে, বোনের নাম কুলু ছাড়া আর হবেটা কী।

কুলু দিদিকে ফোন করে খড়্গপুর থেকে। প্রায়ই করে। ওর বর বরেন আই.আই.টি.র লেকচারার। দুই বোনে কী কথা হল, সেটা তার জানার কথা নয়। তাকে জানাবার কথাও নয়। শ্যামলেন্দু জানতে চেয়েছিল, মেয়ে রাখির কথা। স্কুল থেকে রাখিদের বড়োদিনের এক্সকারশানে পুরী নিয়ে গিয়েছিল। চিলকা, কোনারক নিয়ে ৭ দিনের ট্যুর। ফেরার পথে রাখি মাসির বাড়িতে নেমে গেছে। পুরী থেকে পাওয়া ফোনে পি. টি টিচার সুরভিদিকে খড়্গাপুরে নামিয়ে দিতে, নিজে বলেছিল শ্যামলেন্দু। খড়্গাপুর থেকে রাখি ফোন করে ছিল কিনা সেটাই জানতে চেয়েছিল শ্যামলেন্দু।

'ও কী করছ?'

আর একটা হাফ পেগ খাবে বলে, ক্লোজেট থেকে শ্যামলেন্দু আধাআধি পাঁইটটা বের করছিল। বলল, 'কেন, তুমি একটু খাবে না?'

'না।'

'ছোটো করে?'

'না।'

শ্যামলেন্দু পাঁইটটা তবু বের করে খাবার টেবিলের ওপর রাখে। ইন কেস। যদি মত বদলায়। তার উদ্দেশ্য, মানালিকে একটু খাওয়ানো। ওর অল্পেই কাজ হয়। রাখির আজ-কালের মধ্যেই ফেরার কথা। যদিও ক্লাস টেনে মেয়ে এবং শোবার ঘরও আলাদা— রাখি ঘুমুলে পাড়া জুড়ুলে তবে মানালি শোবার ঘরে ঢোকে, ছিটকিনি দেয় দরজায়। তবে তাদের রাত জাগা।

আজ সেই পিছুটান নেই। এখন তো পিরিয়ডের মাঝামাঝিই হবে। কোনও অজুহাত থাকতে পারে না।

অ্যাস্টরে দু'পেগ। আর হাফ হলে বেশ টনটনে হয় শরীরটা। প্রথম শ্রেণীর আফ্রোদিজিয়াকের কাজ করে।

আজ পঙ্কজ পোৎদার অফিসে এসেছিলেন। রামপুরিয়ারা বড়োবাজার সার্কেলের নাম করা ডিলার। তাদের নায়েব। পদের নাম 'ব্যাপার সহায়ক।' খাম তো একটা পেলই শ্যামলেন্দু। সেই সঙ্গে অ্যাস্টরে টেংরি কাবাবের সঙ্গে নানরোটি। আর দু'পেগ সাদা বাকার্ডি।

'জামাইকার রাম, যদিও এখানেই বটল্ড্ হচ্ছে আজকাল', পঙ্কজবাবু বললেন, 'দেখুন খেয়ে। শুনেছি বেশ করেছে।'

'আপনিও নিন একটা।'

জিভ টিভ বের করে পঙ্কজ পোৎদার 'অঁয়বঁয় ময়' জাতীয় কিছু একটা বললেন। যার মানে, আমি খাই না।

'স্যার' বললেন না।

শ্যামলেন্দু গ্লাসে একটু চুমুক দিয়ে বলল, 'বাঃ ফাইন।'

তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে তার, বলল, 'ব্রিট্‌ন্ তো আগে জামাইকান রাম ছাড়া কিছু পুঁছতই না। লানডানে দেখলাম, অন্তত, ইমিগ্রান্টরা, ইণ্ডিয়ান রাম পেলে চেটে খাচ্ছে।'

দশ বছর আগে অফিস থেকে তাকে দু'মাসের বিলেতে পাঠিয়ে ছিল অ্যাসেসমেন্টের কী একটা কোর্স করে আসতে। যে, ট্যাক্সেশন ওখানে কী ভাবে হয়। তিন সপ্তাহের প্রোগ্রাম ছিল।

প্যারিস না দেখে ফিরবে? তাই বলতে গেলে রক্ত বেচে এক সপ্তাহ বেশি থেকে এসেছিল। শ্যামলেন্দু সে কথাই মনে করিয়ে দেয় আর কী, পঙ্কজবাবুকে। সে, সচরাচর বাঙালি—বিট্রেনকে খাঁটি ইংরেজ বানাতে অ্যাকর্ডিয়ানের মতো দু'দিক থেকে তার স্বরযন্ত্রকে এমন চেপে ধরে যাতে গলা থেকে ব্রিট্‌ন্-ও নয়, 'ব্রিটন' উচ্চারিত হতে পারে। সে লান্‌ডান্ বলে। মানে, আর পাঁচটা সি. টি. ও.র মতো আমি হেঁজিপেঁজি নয় হে, ওহে পঙ্কজ, যদিও তাদের মতো ঘুষ খাই, আর সেটা বুঝে নাও।

অ্যাস্টরে নেমন্তন্ন করেছিল রামপুরিয়ার জামাই রাজেশ। গেটে রিসিভ করলেন পঙ্কজবাবু। শেষে মুহূর্তে আটকে গেছে বলে ক্ষমা চেয়ে রাজশের ব্যক্তিগত চিঠি সঙ্গে খাম।

রামপুরিয়ারা পুরানো পার্টি। বনেদি ঘর খাম চোখ বুজে নেওয়া যায়। তাদের হয়ে পঙ্কজবাবু আগেও এসেছেন। খাম দিয়ে গেছেন। এই প্রথম জামাই—কা ডাক পড়েছিল অ্যাস্টরে। বোঝা যায়, রামপুরিয়ার মার্কশিটে শ্যামলেন্দুর নম্বর বাড়ছে। তবে ক্যাটাগরি ওয়ানে পৌঁছতে এখনো ঢের দেরি। সেটা বোঝা যাবে, যেদিন ক্যালকাটা ক্লাবে নিয়ে

যাবে। তবে, ওখানে যেতে গেলে অফিসের প্রথম টায়ারে যেতে হয়। নইলে এসে পেচ্ছাপ করতে গিয়ে দেখল স্বয়ং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সমাদ্দার সাহেব 'জেন্টেলম্যান' আলো করে পাশের প্যানে মাইনাস করছেন, সে তো হয় না। মন্ত্রী হলে বেঙ্গল ক্লাবের ঘরে। সে বরং অনেক সেফ। গেলে দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। অ্যাটাচড্ বাথ।

কিন্তু ব্রিট্‌ন্.....লান্‌ডান্....পঙ্কজবাবু এ-সবের ধার দিয়েও গেলেন না। এই তো প্রথম জানলেন যে ওদের সার্কেলের সি.টি.ও লন্ডন গেছে। জিজ্ঞেস করলে পারতেন, সে আর কোনও দেশে গিয়েছিল কিনা। তাহলে, সি.টি.ও বলতে পারত, প্যারিসে গিয়েছিল। না, জার্মানি যায়নি। তাকে কানেক্টিং ফ্লাইট দিতে পারেনি বলে জাল এয়ারলাইন্স ৩৬ ঘন্টা রাখতে বাধ্য হয়েছিল মাদ্রিদে। যার মধ্যে সময় করে গিয়েছিল বুল ফাইটিঙে। গলায় বেঁধা বর্শাসহ ষাঁড় এক গুঁতোয় ফেলে দিল মাতাদোরকে, গুঁতোতেই থাকল—দ্বিতীয় মাতাদোর এসে লাল কাপড় নাড়িয়ে ডাকছে তাকে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপই নেই—সারা এরেনা জুড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে চল্লিশ হাজার উৎকণ্ঠিত দর্শক—তাদের মধ্যে একজন এই শ্যামলেন্দু শর্মা, টাউন স্কুলের ড্রিল মাস্টার বঙ্কুবিকাশ ধরের ছেলে শ্যামলেন্দুবিকাশ ধর—একি বলবার মতো ঘটনা নয়? খোদ মাদ্রিদেই বা এমন ঘটনা কবার ঘটেছে? মরে তো ষাঁড়গুলো। কাঁধ এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করা জরির ঝালর ঝোলা সেই জমকালো বর্শা মাথা থেকে মাটির দিকে নিচু—টপটপ করে ঝরে পড়ছে ষাঁড়ের ঘাম ও রক্ত—দৃশ্য তো একটাই। অন্তত সিনেমায় যা দেখায়। কিন্তু মাতাদোরের মৃত্যু, তাও লাইভ—পৃথিবীতে ক'জন দেখেছে। ঝাড়া দশটি বছর ধরে সেই গল্প বলতে বলতে চোয়াল ব্যথা হয়ে গেছে শ্যামলেন্দুর।

সেদিনের খেলার টিকিটটা তো অফিসের টেবিলে কাচের নীচেই থাকে—একদম মাথার দিকে। যাতে সবাই দেখতে পায়। অনেকেই কৌতূহল প্রকাশ করে।

পঙ্কজবাবু তো ক'বারই এলেন। ও-সব দেখেও দেখেন না। যেন ও-সব কিছুই না। ওই লান্‌ডান্ কী ব্রিটন। দ্বিতীয় রাউণ্ডের বাকার্ডিতে চার টুকরো আইসকিউব ফেলে যেন বিষ মেশালেন এমন প্ররোচনামূলক হাসি হেসে পঙ্কজবাবু বললেন, 'এবার দেখুন, মনে হয় অরো টেস্ট পাবেন।'

'স্যার' বললেন না।

খায় না তবু জানল কী করে। হোটেলে বাটলারিও করে নাকি, পার্টটাইম? আরে বাবা, মালিকের হয়ে টাকা দিতে এসেছিস। মালিকের পয়সায় মদ খাওয়াচ্ছিস, কোথায় ডাইনে বাঁয়ে লেজ নাড়াবি তা না, লোকটা কেমন ন্যাজ খাড়া করে আছে দ্যাখো। ওষুধের স্টকের সেই বিরাট গরমিলটা ধরে, ডাঙায় তুলে মাছ ফের জলে ছেড়ে দেবার পর থেকে তোর বাপ রামপুরিয়া তো আমার পা চাটে। খাম পাঠিয়েছে কি এমনি এমনি। অমন খামে মানালির স্টিল আলমারির ভল্ট ভরে গেছে। সেই গোপনতম গোপন ভল্ট যা বিশেষ ভাবে তৈরি করে দিয়েছিল স্টিলকো ফার্ণিচারের ভূপতিবাবু—স্বয়ং নির্মাতা ছাড়া যার খবর রাখে শুধু মানালি আর শ্যামলেন্দু। মানালি যা প্রয়োজনে খোলে ও বন্ধ করে। সান্ত্রো দূরস্থান, ওখানে বোধহয় এতদিনে ওপেল-আস্ট্রা কেনার টাকাও হয়ে এল।

টাকাগুলোকে খালি চরিত্রবান করার অপেক্ষা। রামপুরিয়া নিজে আশ্বাস দিয়েছেন। সব সফেদ হো যায়েগা। বিলকুল।

কী করে?

'সার, ভাবিজীর আপনার কত্তো বড়ো ফামিলি। হাই ফামিলি! বাবা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেড—রূপেন্দরোনারায়ণ মল্লিক। লাভ ম্যারেজ আপনাদের, সে ঠিক আছে।

লেকিন শাদিকে বাদ স্রিফ পঁচাশ-ভরি সোনা কি মিলেনি?' রিসিভারের মাউথ পিসে হাত চাপা দিয়ে তাঁর বাগড়ি মার্কেটের গুদামে বসে রামপুরিয়া বলে রেখেছেন, 'ফিন্ স্রিৎতুর সোময় আপনার মাওভি বহুকে চালিশভরি দিলে—একদম গাও থেকে খুলে—হাঁ-হাঁ উইটনেস আছে—সোববাই দেখেছে' মাউথ পিস থেকে হাত তুলে, 'হালু? জাস্ট এ মিনিট। হোল্ড অন প্লিজ,' হাত চাপা দিয়ে, 'ডোন্ট ওরি স্যার। আই শ্যাল অ্যারেঞ্জ। আশ্‌সি-নব্বই ভরি অর্নামেন্ট বিক্রির বিল আপনি পাবেন। হামার জুয়েলার আছে। ওদের ভি কালা সোনা সাদা হয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে কিনা। লিন এখানেই তো সার, আপনার চার লাখ রূপেয়া সফেদ হয়ে গেল। বোলিয়ে, হ্যায় কি না?' হাত তুলে, 'হালু ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ।'

কুকুরই বটে। তবে এরা হল গিয়ে জাত-কুকুর। রামপুরিয়ার গায়ে যদি হয়তো ইংলিশ ব্লাড হাউন্ডেরই রক্ত। বাপ-ঠাকুর্দাতে ছন্দপতন থাকলেও কি—এদের একটা পেডিগ্রি আছে। তুলনায় আলিপুর কোর্টের ব্রিফলেস এই পঙ্কজ পোৎদার—একটা রোঁয়া-বেরনো নেড়ি ছাড়া কী?

কুকুর বল, কুকুরি বল, জাত-কুকুরের অন্যতম আন্তর্জাতিক আচরণবিধি হল, পায়খানা করে মাটি আঁচড়ে সেটা চাপা দেওয়া।

যে সব বিষয়ে জানা নেই কিছুই, সে নিয়ে কত কথাই তো হয়, অফিসে। কার্গিলে দেশপ্রেম থেকে মকবুল ফিদা হুসেন। কার্গিল-ফার্গিল পেলে তো কথাই নেই। ইস্তামবুলের ভূমিকম্প বা গাইসালের ট্রেন দুর্ঘটনার মতো হাড়হাড্ডি পেয়ে গেলেও বেশ ক'দিন ধরে কামড়াকামড়ি চলে। শুধু ঘুষ শব্দটি এ অফিসে কখনো উচ্চারিত হয় না। সে নিয়ে কোনও আলাপচারি হয়না। আসলে, কে কোথায় হেগে এল সেটা তো বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা, চাপা দিতে পেরেছ, না পারোনি। না পারলেই জাত গেল, অন্তত আমাদের এ সারমেয় সমাজে।

তবে অফিসে গোটাকতক আছে যারা ল্যাপ ডগ, পুড্‌ল্ টাইপের। একদম কোলে-টোলে উঠে পড়ে। যেমন বড়ো সাহেবের বেয়ারা বলভদ্র নায়েক। সেদিন যা করল। সেদিন শ্যামলেন্দু টেবিলে একেবারে শেষ মুহূর্তে একটা ফাইল এনে রাখল। শ্যামলেন্দুর অফিসিয়াল সিল-টিল সবে মেরে এনেছে। শুধু একটা সই হবে।

শ্যামলেন্দু বলেছিল, 'আজ রেখে যাও। কাল দেখব।'

'স্যার, শুধু একটা সই।'

'বললাম তো কাল।' কব্জি উল্টে শ্যামলেন্দু বলল, 'এখন ৫টা।' বড়ো সাহেবের দুই বেয়ারার মধ্যে একজন বলেও বটে, আবার হাবভাবে ঈষৎ মেয়েলিপনার জন্যও বলভদ্র সর্বত্র একটু প্রশ্রয় পেয়ে থাকে। বড়ো সাহেবের বেয়ারা বলে নয়, তার গলা এমনিতে খুব হেঁড়ে। হিজড়েদের যেমন। গলার স্বর ভিক্ষা প্রার্থনার ক্ষেত্রেও নামাতে পারে না। তাই মনে হল সে কুকুর হয়ে রাসভ-নিনাদ করছে যখন সে চিৎকার করে বলল, যদিও মুখ-চোখ, তার সমস্ত শরীরময় তখন একটিই ভাষা আর তা অনুনয়ের, 'স্যার, তাহলে আপনি আমাকে অন্তত পঁচাশ টঙকা দিন।'

'তার মানে?'—চোখে শ্যামলেন্দু বলভদ্রের দিকে তাকায়।

'সার, এটাই তো পইলা কেস পেলাম সারাদিনে। আর ঘরে ফিরে পঁচাশ টঙকা আপনার বউমাকে দিতেই হবে।'

জনাচারেক ইন্সপেক্টর তখন শ্যামলেন্দুর ঘরে। সবাই হৌ-হৌ করে হেসে ওঠে।

বাড়ি ফিরে মালকিনের বেত্রাঘাত থেকে পরিত্রাণের আশায় এক লাফে একেবারে

আই.টি.ও.র কোলে উঠে বসার কুকুরছানা সরলতায়—সবাই মুগ্ধ। 'এই নাও'—শ্যামলেন্দু ও হাসতে হাসতে ফাইলে সই করে দেয়, 'আজ আর কেস এনো না যেন।'

ইনসপেক্টর ইয়াসিন বলল, 'আর কেন আনবে। একশো তো হয়েই গেল।'

'একশো? পঞ্চাশ বলল যে।'

'পঞ্চাশ আমাদের সই। আপনার সিগনেচার মানে তো হয়ে গেল। এর রেট একশো।'

ঘাড় কাত করে হেসে বলভদ্র তা মেনেও নিল। যেন জানত না, ফের জেনে, রীতিমতো শ্লাঘা বোধ করে শ্যামলেন্দু।

আঁতলেমি করার এতটুকু চান্স যদি সি.টি.আই দীপঙ্কর নন্দী ছাড়বে!

'কনফেশনে ফেলিক্স ক্রুলকেও ছাড়িয়ে গেল।' সে বলল।

কে ফিলিক্স ক্রুল, কী ফেলিক্স ক্রুল—খুলে বলল না। অবশ্য সবাই বুঝল ব্যাপারটা কী। নইলে তো জানতে চাইত! তবে দীপঙ্কর অনায়াসেই টলস্টয় বলতে পারত। তবু চেনা-চেনা লাগত। কিছুতেই বলবে না। শালা এমন স্যাডিস্ট।

জাতের এ আর এক জগতের কুকুর। সবাই যখন ঘেউঘেউ করছে—এরা দল ছেড়ে দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। কোনো খবর রেফার করার সময় এরা কখনো আনন্দবাজার কি আজকাল রেফার করে না (বর্তমান তো নয়ই)—বলে, 'আজকের ইকনমিক্স টাইমসটা দেখেছেন?' যা থেকে সারমেয়, সেই স্বর্গের দেবী সরমার পেটের ছেলে যেন এই দীপঙ্কর।

কিন্তু এই কালো-কোট, হেড়ো, চর্মসার পঙ্কজ পোৎদার—এ কোন জাতের কুকুর? মনে হচ্ছে নেড়ি। কিন্তু তাই কি? গায়ের রোঁয়া সবই উঠে-টুঠে গেছে ঠিকই। কিন্তু এই আদ্যন্ত ইগনোর করার ক্ষমতা এই না-ছোড় শ্ববারি—এ তো নেড়িদের থাকার কথা নয়।

পঞ্চজবাবুর একমাত্র মেয়ে নমিতা একদিন এসেছিল অফিসে বাবার সঙ্গে। তারপর একদিন একাই এল। সাদা শালোয়ার কামিজের ওপর নানা রঙের দোপাটির অজস্র পাপড়ি বসানো কামিজের মধ্যে ফেটে-পড়া মেয়েটিকে দেখে প্রথম দিনেই আকর্ষণীয় লেগেছিল। আকর্ষণীয় বলতে নন্দনতাত্ত্বিক কিছু যে, তা না। মনে হয়েছিল, একে পাওয়া যায়? ভাবতে দোষ কী। তাই ভেবেছিল।

পরে একা আসা শুরু করল। মাত্র মাস তিনেকের মধ্যে নমিতা এখন তার হাতের তালুতে। লেক ক্লাবে বসার আগে অফিসের গাড়িতে, গেটের বাঁ-দিকের অন্ধকারে বসেছে তিন চারদিন—আর স্লিভলেস জামার কাঁধ থেকে আঙুল পর্যন্ত হাত বুলিয়েছে— ড্রাইভার ভুবন সোম ঘুরে আসতে গেছে 'আধঘণ্টার জন্যে'। যা ভেবেছিল তা নয়। একেবারে প্রফেশনাল। এমনিতে একটা ১০০ টাকার নোট নেয়। ডায়মণ্ডহারবার রোডের রিসর্টে সারাদিনের জন্যে প্রথমদিন নেবে ৫০০ বলে রেখেছে। প্রথমদিন? 'আমার নয়, আপনারও নয়', অন্ধকারে কী দারুণ ককেটিস হাসি হেসে বলেছিল মেয়েটা, 'আপনার সঙ্গে আমার আর আমার সঙ্গে আপনার তো প্রথম?'

হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে ১০ বছর বসে আছে। পিওনের চাকরি পেয়েছিল। এ কাজ তার চেয়ে ভাল সে মনে করে। বাবার মাইনে বেড়ে-টেড়ে ৩৫০০। তিন ভাই। বাড়ি ভাড়া ৭৫০। টিপে-টাপে দেখেছে শ্যামলেন্দু। ডান দিকের তবলাটি বাঁয়ের তুলনায় বেশ ঝোলা। ঠোঁটের পিছনে পুরু মাংস।

চর্ম ও অস্থিসার পরাজিত একটা মুখ। গভীর কোটরের ভেতর খুদে খুদে চোখ। পাতা নেই একটাও। ভ্রূ কবে খসে গেছে। কিন্তু চোখের মণিদুটো এখনো কি অসম্ভব ঝকঝকে। নেড়িসুলভ খাড়া কানদুটো যেন ততদূরের সঙ্কেত শুনতে পাচ্ছে যা ডালমেশিয়ানরা পায়।

বা, তারাও পায় না। স্প্যানিয়েলরা পায়। বা, তারাও পায় না। মাস্টিফ, ডোবারম্যান, গ্রেট ডেন....সব....সবাইকে টেক্কা দিয়ে এই রণেভঙ্গ নেড়ি পঙ্কজ পোৎদার অবশেষ এসে বসেছেন যেন শতাব্দীর ভস্মস্তূপের ওপর। মহাপ্রস্থানের পথে যুধিষ্ঠিরের কুকুরটাও তো ছিল পথভ্রষ্ট নেড়ি। কিন্তু সে কি সত্যিই তাই ছিল?

কত দূরের সঙ্কেত পাচ্ছে সে? হঠাৎ ঠিক করল শ্যামলেন্দু, নমিতার সঙ্গে সে আর এগোবে না।

আর এক রাউন্ড বলবেন কিনা জানতে চাইলেন পঙ্কজবাবু। আবারও 'সার' বললেন না।

গ্লাস পাঁইট সব ডাইনিং টেবিলে সাজিয়ে শ্যামলেন্দু ঢুকেছিল বাথরুমে। চান-টান করে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে দেখল, খামটা তখনও ফ্রিজের ওপর পড়ে আছে। এমনটা তো হয়নি কখনো, আগে! খাম এলেই, উইদাউট কোয়েশ্চেনিং হাউ অর হোয়ার ফ্রম, মানালি সেটা সেই ভল্টের মধ্যে গুঁজে দেয় যার অস্তিত্ব এক নির্মাতা জানে, যা খোলা বন্ধের অধিকার শুধু তার। আর স্বামী শ্যামলেন্দুর। অ্যাটাচিতে ভরার সময় যেটুকু বুঝেছে, যদি নোটগুলো একশো'র হয়, তাহলে ভালই। অবশ্য পঞ্চাশ হলে বিশেষ কিছু না।

কিন্তু এখনও ফ্রিজের কাছে পড়ে আছে যে বড়ো!

কী ব্যাপার? সে কাছে গিয়ে মানালির মুখ শুঁকল। সামনে, পিছন, ঘাড় গর্দান বুক চিবুক কোথা থেকেও সেই চেনা সুগন্ধ আসছে না তো। কেমন একটা বিপদ-বিপদ গন্ধই যেন।

শ্যামলেন্দু মালালির কাঁধে হাত রাখলে সে আপাদমাথা শিউরে ওঠে।

'কী হয়েছে মানালি?'

'কিছু না।'

'নিশ্চয়ই কিছু।' শ্যামলেন্দু ওর কাঁধ জোরে চেপে ধরে বলল, 'বলো আমাকে।'

অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে চেয়ারে বসে থাকল মানালি। শ্যামলেন্দু দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। উত্তরের জন্য। মানালি, যেন নিজেই অপরাধী, মাথা নিচু রেখে বলল, 'রাখি ইজ প্রেগনান্ট।'

সাপের পিঠ থেকে পা তুলে নিয়ে পিছিয়ে এল শ্যামলেন্দু, 'এই না। যাঃ।'

'কুলু তাই বলল, ওখানে টেস্ট হয়েছে। ল্যাব রিপোর্টও তাই বলছে।'

নিস্তব্ধতা।

'রাখির সঙ্গে কথা বললে?'

'বললাম।'

'কী বলল?'

বলল, 'কোচিং-এর স্যার রমাপ্রসাদের কথা!'

'র-মা-প্র-সা-দ? তার তো বউ-বাচ্চা আছে।'

'আর লোক পেলি না হারামজাদি। আমি বলেছি মর্-মর্। গলায় দড়ি দিয়ে মর্। সেই থেকে দরজায় খিল দিয়েছে। কুলু আমাদের আজই যেতে বলেছিল।

'কেন বন্ধ করে রাখো তুমি সেলুলার?'

শ্যামলেন্দুর বুকে হঠাৎ কিল মারতে শুরু করল মানালি, 'এত রাত অব্দি কোথায় মদ খাচ্ছিলে?'

যে অজানা আশঙ্কা মানালির বুকের ভেতরে ঢেঁকির পাড় পড়ছে, সেই একই উদ্বেগে

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে শ্যামলেন্দুর। মা হয়ে মেয়েকে অতবড়ো অভিসম্পাত দিল কী করে মানালি? সে কি জানে না, এর চেয়ে আরও কত সামান্য কারণে আজকাল মেয়েরা কী করে বসছে! ভেবে, তার হাড় হিম হয়ে এল।

অতি বিমূর্তভাবে শ্যামলেন্দু হঠাৎ অনুভব করল, তার লেজ খাড়া হয়ে উঠেছে। আকাশভরা ঝকঝকে চাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চার পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সে ছুটে চলেছে খড়্গপুরের বিধানপল্লীর দিকে।

তার থাবা থেকে নখ বেরিয়ে পড়ে ফের ঢুকে যাচ্ছে থাবার মধ্যে। কষে গজগজ করছে ফেনা। খাঁটি ভারতীয় নেড়ির বিঘৎখানেক লম্বা জিভের ডগা থেকে টপটপ করে নাল ঝরে পড়ছে তো পড়ছেই। মুখ দিয়ে বের হয়ে চলেছে একটানা ও বিরতিহীন গর্‌র্‌র্‌র্ শব্দ।

বন্ধ দরজার ওদিকে রাখি হয়তো এতক্ষণ ঝুলেই পড়েছে।

সেকাল-একালের সেতু, ২০০০

খেলতে খেলতে

১/কুমির কুমির

খুব ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের এবং ছেলেদের খেলাগুলোর মাঝখানে টানা ছিল একটা নিষিদ্ধ লক্ষ্মণরেখা। যেমন ফ্রক-পরা মেয়েরা দু'হাতে গোটাকতক নুড়ি নিয়ে জাগলিং করত 'এতোল-বেতোল শ্যামলা-শেতল' বলতে বলতে। সেখানে কোনও ছেলে-খেলুড়ে কখনও দেখিনি। ছোটবেলা থেকে এ-রকম শিক্ষানবিশি আদৌ না থাকা সত্ত্বেও, বড়বেলায় যত জাগলার দেখেছি তারা কিন্তু সবাই পুরুষ। আমাদের ছোটবেলায় (১৯৪০-৪৫ নাগাদ) গলির মুখে চীনা জাগলারকে একসঙ্গে খানকুড়ি বল নিয়ে লোফালুফি করতে দেখা যেত। অবশ্য, এদিক থেকে ভাবলে হোটেলের সব রাঁধুনিই তো পুরুষ। এবং সারা পৃথিবীতেই।

মেয়েদের এমনই আর-একটা নিজস্ব খেলা ছিল 'কুমির-কুমির' খেলা। এটা অবশ্য টিপিকাল মেয়েলি খেলা। কারণ এ-খেলার মূল আবেদন হল প্ররোচিত করা। যে-কোনোও একটা ছোট মাঠে বা বড় ছাদেও খেলতে দেখেছি। এ-খেলায় গোটা মাঠ বা ছাদটাই হল জল, এবং কয়েকটি চিহ্নিত উঁচু জায়গা হল ডাঙা। মাঠে একজন অন্যমনস্ক 'কুমির' (খেলোয়াড়) ঘোরাফেরা করছে। হয়ত সে নখই কাটছে, বা আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটছে। বা রোদ পোহাচ্ছে কুমিরসুলভ চক্ষু মুদে থাকার ভান করে আর এ-দিক ও-দিক সে-দিক থেকে 'এই কুমির তোর জলকে নেমেছি'[১] বলে বাকি খেলোয়াড়রা 'জলে' নেমে তাকে প্ররোচিত করছে। কাছে বা দূরে জলে-নামা অনেকের মধ্যে কার দিকে সে ছুটে যাবে—সেটাই হিসেব—আর শিকার ধরতে পারলেই, যে ধরা পড়ল—সে হয়ে যাবে কুমির।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে কলকাতায় বোমা পড়লে আহিরীটোলায় ঠাকুর্দার বাড়ি ছেড়ে আমরা পালিয়ে গেলাম রাঁচিতে। তখন বছর-দশেক বয়স।

স্টেশন থেকে টাঙ্গা গিয়ে থামল রাঁচির জেলা স্কুলের গায়ে কমিশনার্স কম্পাউন্ড এলাকার 'গ্রেপ ভাইন' নামে একটি একতলা বাড়ির সামনে। গ্রেস নাম্নী জনৈকা আদিবাসী

খ্রিস্টান নার্সের ওই বাড়ির তখন দুটি ঘরের ভাড়া ছিল ২৫ টাকা। বাবা বিলিতি সওদাগরি অফিসের বড়বাবু। তাঁকে কলকাতায় থেকে যেতে হল।

নার্স গ্রেসের মেয়ের একটা খ্রিস্টান নাম ছিল নিশ্চয়ই। তবে সেটা নেহাতই পোশাকি। বিফৎবারে (বৃহস্পতিবার) জন্মেছিল বলে বীফি নামেই সে ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ। বীফির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা কিন্তু ওই কুমির-কুমির খেলতে খেলতেই।

রাঁচিতে গিয়ে আমি দেখলাম ডক্টর-ডক্টর খেলার বহুল প্রচলন থাকলেও, রাঁচিতে মেয়েরা কুমির-কুমির খেলা সম্পর্কে কিছুই জানে না। ফলত, খেলাটি ওদের ভাল করে শিখিয়ে দেওয়ার দায় আমার ওপর বর্তালেও, খেলাটি যে মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই বাঞ্ছনীয়—তা আর ওদের বললাম না। ভাবলাম, ফলেন পরিচীয়তে। কলকাতার নবাগত কোচকে খুবই সরল মনে খেলতেও নিল রাঁচির কিশোরীরা।

প্রথম দিন (আমাকে আর দরকার হয়নি) খেলা হয়েছিল রাঁচির জেলা স্কুলের মাঠে। প্রথমে ডাঙাগুলো চিহ্নিত করা হল। তারপর জলে নেমে সবাই বলছে—'এই কুমির তোর জলকে নেমেছি'—যে যেমন পারে বাংলাতেই বলছে—আমি যেমন শিখিয়েছি। আর কুমির তেড়ে যাচ্ছে কারও কারও দিকে—কিন্তু শিকার এতদূরে তো চলে আসেনি যে দৌড়ে ডাঙায় উঠে পড়তে পারবে না।

আমি যখন কুমির হলাম, তখনই বোঝা গেল, কেন খেলাটি মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা ভাল। অন্তত বীফি বুঝল। অনেককেই, ধরতে আমি পারতাম, কিন্তু আমি ধরব বীফিকে। বীফিকে ধরব বলেই আমি তাকে আমায় ধরতে দিয়েছি ও কুমির বনেছি। আর বীফিকে একবার জড়িয়ে ধরে, বয়সে একটু ছোট হলেও, অনেক বেশি শক্তিধর কুমির যে তাকে সহজে ছাড়বে না এ তো বলাই বাহুল্য। খেলাখেলির কুমির, বীফি দেখল, গা-জোয়ারিতে কম যায় না। 'ছোড়্ ছোড়্, এ বুঢ়ঢা (আমার ডাকনাম বুড়ো, তাই ওখানে সবাই বলত বুঢ়ঢা) ছোড় দো মুঝে' বলে লজ্জায়, সঙ্কোচে কখনও রাগের মাধ্যমে—সে সনির্বন্ধ অনুরোধই করতে লাগল আমায়। অথচ, যত বলে, আমি ওকে হাসতে হাসতে ততই জাপটে ধরি। শেষে সে আমার গালে একটা চড় মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় ও মাঠ ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। সজ্ঞানে তো নয়ই, অজ্ঞানতইও কী দোষ করলাম—অন্তত তখন বুঝতে পারিনি। তবে বীফি আর কুমির-কুমির খেলতে আসেনি। বরং, রাঁচিতে যে ৬ মাস ছিলাম, তার মধ্যে একদিন দুপুরে স্কুল পালিয়ে আমাকে রতন টকিজে 'বন্ধন' দেখতে নিয়ে গেছে (শ্রেঃ অশোককুমার, মুমতাজ)।

এর পর থেকে বেলা যত বেড়েছে—বুঝতে শিখেছি ছেলেদের খেলা আর মেয়েদের খেলা—এর মাঝখানের লক্ষণরেখাটা ভেঙে ফেলাই হল আসল খেলা। এ-খেলায় একটা তুচ্ছতম ভুল পাসের জন্য এক জীবনের ভুলচুক হয়ে যেতে পারে। সার্থকতর অন্য সংজ্ঞা পাওয়ার আগে পর্যন্ত—এর নাম দেওয়া যেতে পারে জীবন-মরণ খেলা। এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিস্তর গান আছে যা শুনে বোঝা যায় এ-খেলায় পৃথিবীর চিরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে উনি ছিলেন অন্যতম—সে ব্যাপারটা উনিই যতই কেন চেপে দিয়ে থাকুন। যদিও ক্যাচ মিস করেছেন বিস্তর। তাঁর ক্রীড়াসংগীতগুলির মধ্যে প্রথমেই মনে আসে :

আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা যে
প্রিয় আমার, ওগো প্রিয়—
বড়ো উতলা আজ পরান আমার
খেলাতে হার মানবে কি ও।

প্রথম পঙক্তি 'যে'-সহযোগেই আমি রাখলাম, গীতবিতানে থাক বা না থাক। কারণ

আমার গায়ক-বন্ধু উস্তাদ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের, বিশেষত গানের আসরে, ওটা ছিল তাঁর হিট্ সঙ্। যখন গাইতেন 'যে'-যোগেই গাইতেন। পরে একটি লাইন আসবে যেখানে গাইতে হবে :

কেবল তুমিই কি গো এমনিভাবে
রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে....

এখানে রাঙিয়েটা বদলে শক্তি অবশ্যই করবেন 'রাঙ্গিয়ে' এবং ওই শব্দটির জন্য স্বরলিপিতে মাত্র ৪টি দানা বরাদ্দ থাকলেও উস্তাদ কীভাবে, গানের সমস্ত বন্দিশ ভেঙে, তাকে ৪ থেকে ৮, ৮ থেকে ১৬—দমবন্ধ না হওয়া পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান—সেটাই ছিল দেখার জিনিস। আর এ-খেলায় (বিশেষত কবিতায়) শক্তির চেয়ে ভাল লেফট-উইঙ্গার বাংলা সাহিত্যে আর নেই বললেই চলে। বাংলার কবিতার একাধারে ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর জীবনানন্দকে আমি এর মধ্যে টানব না।

আমার মনে হয় ওঁর যে প্রাণের খেলা—সেখানে ওঁর ক্রীড়াসঙ্গিনী ছিল আবহমান সময়, ইতিহাসচেতনা—এরা সব—যা কিনা, আমাদের মতো পাঁচ পাবলিকের বোধবুদ্ধির বাইরে। কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রাণের খেলা ছিল বড়ই নখরময় ও দস্তুর। সেখানে তাই অনবরত রক্তপাত।

'চন্দ্রমল্লিকার মাংস পড়ে আছে ঘাসে
সে যেন এখনই চলে আসে।'

তাকে তন্ত্রাভিলাষী আর্তুব র‍্যাঁবোর মতো মনে হয় যখন সে এ-ভাবে ওভার বাউন্ডারি মারে—সব হিসাব-কিতাব উড়ন্ত বল হয়ে যখন উড়ে যায়। উদ্‌ভ্রান্ত দর্শক যখন ঢিল ছোঁড়ে, খেলায় রক্তপাত হয়।

২/প্রাণের খেলা

তো যা বলছিলাম। প্রাণের খেলা! এ-খেলা কে কার সঙ্গে খেলবে, সেই খেলোয়াড়কে খুঁজে পাওয়ার পক্ষে সত্যিই একটা জীবন যথেষ্ট নয়। খুঁজে হয়ত কেউ পেল, চিনতেও পারলো দু'জনে দু'জনকে—কিন্তু সাহসই হল না লক্ষণের গণ্ডি ভাঙতে। তাই কে যে হারিয়ে গেল কোথায়। এ-খেলায় এমনটাই বেশি হয়।

আমার দাদা কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন হাওড়ার বিখ্যাত বি.ডি.এফ.সি ক্লাবের নামকরা ফুটবল-প্লেয়ার। ক্লাবটি বিখ্যাত অবশ্য একটাই কারণে। আর তা হল ওই অখ্যাত ক্লাব থেকেই এসেছেন শৈলেন মান্না। খালিপায়ে অলিম্পিক খেলেছিলেন বলে, কথিত আছে, স্বয়ং রানী এলিজাবেথ নাকি তাঁর পায়ে হাত দিয়েছিলেন (পা টিপে দেখেছিলেন)। শৈলেন মান্নাকে নিয়ে এমন কত গল্পই তো আছে। কিন্তু এটা কেউ জানেন কি যে, আমতা না শিয়ালখালায় বি.ডি.এফ.সি-র হয়ে অল্পবয়সে কোথাও খেলতে গিয়ে—এদিকের গোলের সামনে থেকে মান্নাদা এমন এক কিক করেন যা বিপক্ষের গোলের একদম ভেতর গিয়ে পড়ে। হতে পারে যে গ্রামের মাঠটি ছিল ছোট—কিন্তু কত আর—এবং এমন ঘটনা পৃথিবীর সকার-শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ নেই বলে রেফারি গোল দিতে চাননি। অন্তত আর-একজন খেলোয়াড়ের পায়ের ছোঁয়া লাগা দরকার—এই নাকি নিয়ম। তাই হবে। কারণ একা-একা তো কোনও খেলাই হওয়ার নয়—শুধু প্রাণের খেলা কেন!

সে বার দাদা ছিলেন ক্যাপ্টেন। মান্নাদা গুরুজ্ঞান করতেন বলেই শুনেছি—অন্তত শুরুর দিকে। এমন যে, একবার মোহনবাগান শিল্ড জিতলে গুরুদক্ষিণা হিসেবে সেই শিল্ড বি.ডি.এফ.সি. ক্লাবে যাওয়ার পথে আমাদের ১৮ সারদা চ্যাটার্জি লেনের বাড়ির

বৈঠকখানায় পুরো একবেলা অধিষ্ঠিত ছিলেন। পাড়া ভেঙে লোক এসেছিল শিল্ডে মালা দিতে। তখন মাথায় আমি শিল্ডের চেয়ে একটু ছোট হলেও—এই ঘটনা দৃশ্য হয়ে আমাদের পারিবারিক অ্যালবামে সেই থেকে ছিল—এবং এখনও আছে।

৮২ বছর বয়সে দাদা মারা গেলেন ১৯৯৭-এ। উনি বাইসাইকেল-কিকে দক্ষ ছিলেন। অফ-সাইডের কারণে বাদ দেওয়া গোলগুলি ধরলে উনি পাওলো রোসির চেয়ে বেশি গোল দিয়েছিলেন বলে দাদা দাবি রেখে গেছেন। পাওলো রোসির খেলা উনি দেখে গেছেন।

দাদা ছিলেন পিতৃপ্রতিম। ছিলেন ২৪ বছরের বড়। তবু বলতে হয় সেই সুঠাম, সুন্দর দাড়িতে ভাঁজ (আমাদের জিন ফ্যাক্টর)—প্রাণের খেলাতেও তিনি ছিলেন একজন অতি উঁচুদরের উইঙ্গার—এবং সেখানেও তাঁর স্কোর খুব নগণ্য হবে না (এ বিষয়ে পাওলো রোসির স্কোর জানি না)।

ছেলেপুলেদের বিয়ে হয়ে যাবার পরও উনি বৌদির সম্মতি নিয়ে আর-একটি বিবাহ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। দাদার যখন ৬২, পাড়ার ফোটোগ্রাফার কাবুলদার উদ্দেশে ওর এই সকরুণ অ্যাপোলজি আমার কানে আজও বাজে:

'আজ তুমিই বলো কাবুল, কাঁথায় ছোটছেলের মুতের গন্ধ—আর তাদের ঝরঝরে পায়খানার গন্ধও কত সুন্দর—এ সব কি আর একবার শুকতে সাধ হয় না! তুমি বলবে, জানি, কেন নাতি-নাতনি তো হয়েছে। নাতি-নাতনি হয়েছে, আরও হবে, আমি তা জানি। কিন্তু তুমি বলো কাবুল, নিজের ছেলের মুতের গন্ধ, আর নাতির মুতের গন্ধ—নিজের ছেলে কোলে তোলা আর নাতি কোলে তোলা—এ কি এক হল!' আহা কবিতার মতো কানে বাজে এখনও, কথাগুলো।

আসলে দাদার কন্যাসমা কাবুলদার বোনের কমপ্লেনের কারণেই কাবুলদা এসেছিলেন বাড়িতে। যা বোঝার বুঝে কিছু না বলে ফিরে গেলেন। ডাক্তারও তাই বললেন। আসলে ফুটবলে হেড দিয়ে দিয়ে পাওলো রোসির রেকর্ড ভাঙতে গিয়ে—ফুটবলে হেড দিতে দিতে, মাথাটা দাদার...

৩/গানের খেলা

যখন 'কলকাতা' পত্রিকা বেরোত—বছরে অন্তত একবার আমরা কলকাতার বাইরে আমাদের এ-টিম নিয়ে খেলতে যেতাম।

বিশেষত, দোলের আগের দিন। খেলার কোচ কখনও জ্যোতির্ময় দত্ত। কখনও বা রঘুনাথ গোস্বামী। রঘুনাথ গোস্বামীর টিমে কে সি দাশদের (মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী) মল্লিকপুরের বাগানবাড়িতে দিনভর গানের খেলা। না, রিমেক নয়। গান যা তখুনি রচিত হবে—এবং সুরকারও বাটি, ঘটি, হাঁড়ি, গ্লাস (কাচ, কাঁসা ও মাটির) প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্রবাদ্য নিয়ে প্রস্তুত—তালপাতার তৈরি বংশীবাদক-কাম-সুরকার আর কেউ নন—স্বয়ং বটুকদা (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী)।

প্রথম পঙ্‌ক্তি বলল রঘুনাথ:

'ঘাসের ডগায় ফুটেছে ফুল...'

সুভাষ মুখোপাধ্যায় অম্নি বললেন :

'আয়রে পরে সোনার দুল।'

ব্যাস, আর কথা নেই। আর বলতে হল না। মিউজিক্যাল হ্যাণ্ডসদের একগুচ্ছ ফুলসুদ্ধ

একটা শ্বেতকরবীর ডালের ব্যাটন তুলে নির্দেশ দিতে দিতে জ্যোতিরিন্দ্র সুরে ফেলে গানটি ভাঁজতে শুরু করে দিলেন এবং আর-কারও তোয়াক্কা না করে বাকি দু'লাইন নিজেই রচনা করে গানটি সমে টেনে নিয়ে গেলেন। পুরো গানটি দাঁড়াল:

ঘাসের ডগায় ফুটেছে ফুল
আয়রে পরে সোনার দুল
জলেভরা নদীকূল
আমি বেড়াবো তার উপকূল।

গানটি রিহের্সাল দিতে দিতে নানান নবীকরণ হতে থাকে। যেমন রঘুনাথ গোস্বামীর মতো 'জলে'র বদলে হবে 'এঞ্জেল'। আর 'বেড়াবো' না হয়ে হবে 'বেড়হাবো'। অন্যথায় ফোক এফেক্ট আসছে না। শুনে সবাই হই-হই করে সমর্থন করে। রঘুনাথ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী, কিছু আর্বান এফেক্ট দেবেন নাকি!' আমার সংশোধনী গৃহীত হওয়ার পর শেষমেষ গানটি দাঁড়াল এ-রকম :

ঘাসের ডগায় ফুটেছে ফুল
(সুতরাং...)
আয়রে পরে সোনার দুল
(এবং...)
এঞ্জলে ভরা নদীকূল
(অতএব...)
আমি বেড়হাবো তার উপকূল।
(তা বৈকি! তা বৈকি!)

শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে বিভিন্ন প্রাইভেট জলসায় আমা দ্বারা পরিবেশিত গানগুলির মধ্যে এটি একটি হিট সঙ্।

গানের খেলা খেলতে খেলতে এ-রকম আর-একটি মার-পেরেক গান হল :

ফিক ফিক ফিক চাঁদের হাসি
ঐ উঠেছে আকা-শে!

রঘুনাথ গোস্বামীর এক বিস্মৃত অবিস্মরণীয় সৃষ্টি হল তার লেখা এক পূর্ণাঙ্গ নাট্য-প্রহসন। নামটা ভুলে গেছি। ওই গানটি—নাটকটির একটি হিট সঙ্ ছিল বললেই হয়। গানটি যাত্রার সখী-গানের রূপান্তর—সুর ও প্রথম চার পঙ্ক্তি আমার সংগ্রহ। ভাল ভাল প্রাইভেট জলসায় আমি এই গানটিও গেয়ে থাকি (রুমালি নৃত্য সহযোগে)।

নাটকটির সঙ্গীত, স্টেজ, প্রযোজনা-পরিচালনা সবই রঘুনাথের। নায়িকার ভূমিকায় নেমেছিলেন সুভাষ-পত্নী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র সদনে একটাই 'শো' হয়েছিল।

৪/রুমাল চোর, ট্যাক্সি ইত্যাদি

জ্যোতির্ময় দত্তর টিমে গেলে চরিত্রটা হত অন্যরকম। গণ্ডি সত্যিই ভেঙে যেত।

৭৩ সালের কোন এক সংখ্যা 'কলকাতা'য় ছোট্ট এক ইঞ্চি বক্স-বিজ্ঞাপন বেরুল জ্যোতির্ময়ের নামে—

কলিকাতা হইতে পদযাত্রা
গন্তব্য অজ্ঞাত
ইচ্ছুক পদযাত্রী-যাত্রিনীরা
হাওড়া ইস্টিশানে বড় ঘড়ির

নিচে সমবেত হউন।

সময়...। তারিখ...।

সকাল ৯টায় ঘড়ির তলায় গিয়ে যাদের পাওয়া গেল তাদের মধ্যে ড্রাইভার তারাশঙ্কর, পরিচারক বিবেক-সহ রঘুনাথের পুরো ফ্যামিলি, জ্যোতিরা সবাই, আমাদের চ্যাটার্জি পরিবার, সুবীর ভট্টাচার্য (টুলু)—এমন অনেকেই। চার-পাঁচজন আগন্তুক এসেছেন বিজ্ঞাপন পড়ে। আর আমাদের অবাক করে দুটি অপরিচিতা সুন্দরী তরুণীও এসেছে দেখা গেল। যুগান্ত পেরিয়ে তাদের একজনের নামও আমার মনে পড়ল : চায়না। ওরা বডিগার্ড আনেনি। কাজেই জ্যোতি-জায়া মীনাক্ষী, তার মন্তব্য অনুযায়ী বিশেষত 'সন্দীপনের হাত থেকে' তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিল।

বাগনান অবধি সকাল-সকাল ট্রেনে গিয়ে, আমরা সেখান থেকে হাঁটা শুরু করলাম। মাঝখানে মধ্যাহ্নভোজন। বিকেলবেলা এক অপ্রত্যাশিত অজানা জলবিভাজিকা আমাদের পথরোধ করে দাঁড়াল। দেখলাম, এ সেই দূরাদয়শ্চক্রতমালতালিবনরাজিনীলা! যা নৌকো থেকে দেখে নবকুমারের মনে হয়েছিল 'জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না।' অন্তত জনম-ভোর যে ভোলা যায় না সে তো আমিই দেখছি। শুনলাম, জায়গাটার নাম গড়চুমুক আর সেটা এক সমুদ্র মোহানাই বটে। গঙ্গা এখানে একাই একশো। রূপনারায়ণ এসে মিশেছে গঙ্গার সঙ্গে। সেইসঙ্গে দামোদরও তার হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে। থৈ-থৈ কাণ্ড একেবারে। ওদিকে গেঁওখালি।

দোল পূর্ণিমার আগের দিন। 'এখুনি ঐখানে একটা চাঁদ উঠবে' বলে জ্যোতি যে দিকে হাত বাড়াল, সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে, ওমা, একেবারে সেখানেই সকড়ি-ধোয়া আর ভিম দিয়ে মাজা স্টিলের থালার মতো একটা আস্ত চাঁদ সত্যিই উঠে পড়ল—আর জ্যোতিও তাই না দেখে পরশুরামের বিরিঞ্চিবাবার মতো 'ওঠ্-ওঠ্' বলে চাঁদটাকে ওঠাতে লাগল।

চাঁদ উঠলে রাতে শুরু হল খেলাধুলো। চাঁদের আলো এত যে খবরের কাগজের হেডিংগুলোও পড়া যাবে।

নদীর ধারে বিশাল মাঠে শুরু হল আমাদের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান।

প্রথমে একটি নিরীহ খেলা। দুটি বাঁশে খুঁটি বেঁধে একটি পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে, তার পিছনে দাঁড়িয়ে চোখ রাখা যায় এমন দুটি পাশাপাশি ফুটো। এক একজন সেখানে চোখ রাখবে। টর্চ মারা হবে সেই চোখের ওপর। শুধু চোখ দেখে বলতে হবে, কার চোখ (যখন দ্রষ্টার চোখের বাঁধন খুলে দেওয়া হবে)। খুব মজার খেলা এটা। বাড়িতেও খেলা যায়। ১০ বছরের পুরনো স্বামী রঘুনাথ যখন স্ত্রী ভবানীর চোখ চিনতে পারল না, তখন তো রীতিমতোন হাস্যরোল উঠেছিল।

এরপর শুরু হল খেলা ভাঙার খেলাগুলো। স্থানাভাবে দুটি খেলার কথা সংক্ষেপে বলি।

ট্যাঙ্কি খেলা

এই খেলায় চারজন করে একটি গ্রুপ। তারা পরস্পরকে সজোরে আঁকড়ে ধরে নিজেদের পরিণত করবে একটি দুর্ভেদ্য ট্যাঙ্কে। তারপর চেনে-বাঁধা ট্যাঙ্কের মতোই ধীর ও নিশ্চিতভাবে অগ্রসর হয়ে একে অপর গ্রুপকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে বা ছত্রভঙ্গ করতে অগ্রসর হবে। ধাক্কা মারতে হবে পরস্পরের পশ্চাৎদেশ দিয়ে এবং মুখে থাকবে গাঁ-গাঁ শব্দ। আমাদের ট্যাঙ্কে চায়নাকে নিয়েছিলাম। এখানে আক্রমণ এড়ানোই আসল খেলা।

রুমাল-চোর

এ খেলাটি এমনিতে রুমাল-চোরের মতোই। সবাই গোলাকারে বসবে। এবং চোর ঘুরে ঘুরে যার পিছনে রুমাল ফেলে যাবে এবং সে বুঝতে না পারলে আর এক পাক ঘুরে এসে কিল মারবে সেই হবে পরের দানে চোর।

কিন্তু জ্যোতি এ-খেলায় একটি নতুন মাত্রাই যোগ করেছিল যে, যে চোর হবে তাকে যে চোর বানিয়েছে সে তার গালে একটি চুম্বন দান করতে বাধ্য হতে হবে—এবং ঐ পুরস্কার তাকে দিতে হবে পূর্বোক্ত খেলার জন্য টাঙানো পর্দার আড়ালে গিয়ে। চুম্বন নানাবিধ হয়ে থাকে। সেটা তারা ঠিক করবে।

কিন্তু বেজায় গোলমাল হয়ে গেল রঘুনাথদের সদ্য গোঁফ-ওঠা পরিচারক বিবেক যখন ভুল করে প্রভু-পত্নী ভবানীর পিছনে রুমালটি রাখল—এবং ভবানী তা বুঝতে পারল না।

দু'জনেই খুবই অপ্রস্তুত। ভবানী লজ্জায় লাল। আর বিবেক ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে। কিন্তু জ্যোতি ছাড়বার পাত্রই নয়। তার ঐ এক কথা : শিগগির যাও দুজনে। পর্দার আড়ালে।

ভাগ্যিস বুদ্ধি করে ভবানী বিবেককে বুকে টেনে নিয়ে সকলের সামনেই তার মাথায় চুম্বন করল।

৫/নাট্যরঙ্গ

টেনে নেওয়ার কথায় মনে পড়ে গেল তুম্বানির কথা। তুম্বানি জায়গাটা রামপুরহাট থেকে ১২ কিমি দূরে—রোড রাস্তার উপর। দুমকা যাওয়ার পথে পড়ে। সাঁওতাল পরগণার বর্ডার ওটা।

ওখানকার আবাসিক স্কুলে আমি আগের বছর ঘুরে গেছি। সবার আগে গেছে জ্যোতি। এমারজেন্সির সময় গ্রেপ্তার এড়াতে ওখানেই লুকিয়েছিল কিছুদিন। জায়গাটা টিলা ও জঙ্গলময়। দূরে রাজমহল পর্বতমালা।

১৯৭৫ সালের দোলের দিন ওখানে হয়েছিল নাটক-নাটক খেলা। সে-ও চাঁদের আলোয়। সে-ও রিমেক নয়। কোনও লেখা নাটক নয়। একটি ঘটনা দিয়ে শুরু হবে। তারপর ঘটনা যেদিকে গড়ায় গড়াবে। সেইমতো যে যেমন দরকার ডায়লগ বলবে। তুম্বনির আবাসিক স্কুলে ছাত্ররা বেশির ভাগই আদিবাসী। দোলের ছুটিতে সবাই বাড়ি চলে গেছে। মাস্টারমশাইরা সপরিবারে নাটক দেখতে এসেছেন।

চাঁদের আলোয় স্কুলবাড়ির লম্বা বারান্দায় নাটক হবে। দুমকা যাওয়ার শেষ বাস সাড়ে ১১টায় তুম্বনির স্কুল-গেটে থামল। সেখান থেকে আমি যেন নেমেছি। স্কুলে সেগুনবীথি দিয়ে হেঁটে আসছি—আর বাংলার টিচার পল্টুবাবু আমার পিছু পিছু 'ও মশায় ওটা কার ব্যাগ নিয়ে আপনি যাচ্ছেন—ওটা তো আমার ব্যাগ—' এই কথা বলতে বলতে আমার সঙ্গে এসে মঞ্চে উঠবেন। নাটকের এইটুকুই জানা। তারপর যা হাওয়ার তা হবে।

স্টেজে উঠে হইহই। 'পুলিস' 'দারোগা' বিবিধ স্বতঃপ্রবৃত্ত চরিত্র দেখা দিতে লাগল। কারণ নাটক তো নেই। নাট্যপরিচালকও নেই। শেষ পর্যন্ত সবাই আমাকে চেপে ধরল, 'যদি ব্যাগটি আপনারই হবে—বলুন ওতে কী আছে।' দারোগা (ঘাড়ে হাত রেখে) 'বলুন, বলুন নইলে গারদে পুরব। আচ্ছা মাস্টারমশাই আপনিই বলুন।' পল্টুবাবুও বললেন না কিছুতেই। শেষপর্যন্ত হাবিলদার টুলুবাবু (সুবীর ভট্টাচার্য) ডায়লগ দিলেন: 'ব্যাগটি এদের দুজনের কারও নয়। এরা হল চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই—'আর তাই না শুনে—

দারোগাবাবু (রোলটি ছিল গীতাদির স্বনির্বাচিত) আমার গলা শাড়ির আঁচল দিয়ে পেঁচিয়ে আমাকে সবার সামনে টেনে এনে 'বোল্ কমবক্ত, কামিনে! ইসকা অন্দর ক্যা হ্যায়?'

তখন আর কথা না বাড়িয়ে ব্যাগটি আমাকে খুলতে হল। আর আমরা দু'জনে খাব বলে এক বোতল মহুয়া ওই ব্যাগের মধ্যে রেখেছিলাম—আর সেটাই ফাঁস করতে চাইনি! রিহার্সাল না-দেওয়া অলিখিত নাটকের এ কি করুণ পরিণতি। দু-একজন ছাত্রও দর্শকাসনে কি ছিল না! বিপুল করতালি ও হাস্যরোলের মধ্যে হল যবনিকা পতন। চোর ধরা পড়ল। কিন্তু বসন্তের সেই মাতাল সমীরণের রাত্রে চোরাই মালের স্বাদ নিতে দেখা গেল মাস্টারমশাইদেরও কেউ কেউ রীতিমতো আগ্রহী। রঘুনাথ মদ্যপান ব্যাপারে অত্যন্ত খুতখুঁতে। হার্ড ড্রিঙ্কস বিদেশী ছাড়া ছোঁয় না। আমার গ্লাসে একটি ছোট্ট সিপ দিয়ে আমার কানে কানে যে ভাবে বললো 'আর-একটু দিন' তার মাধুর্য এখনও কানে লেগে আছে।

বরাতে হস্টেলের বিশাল হাণ্ডায় গরম গরম খিচুড়ি খেতে যখন বসলাম, বলা বাহুল্য তখন আরও দুটি বোতল শেষ হয়েছে। তারপর তুম্বনির বিশাল খেলার মাঠে শুরু হল সকলের চোখ বেঁধে কানামাছি খেলা। চক্ষুষ্মান বলতে শুধু রইল একজন। শাল জঙ্গলের গরাদের পিছনে সেদিনের দোলপূর্ণিমার চৌকিদার চাঁদ। মাঠ এত বড় যে সে কাউকে ছুঁতেই পারছে না। খুঁজেই মরছে শুধু। খুঁজেই মরছে। খুঁজছে, একজন আর একজনের কাছ থেকে ততই দূরে সরে যাচ্ছে....

৬/একা এবং গোলকি

তো, এ-ভাবেই, এই সব রেফারিহারা খেলা অতি অবুঝভাবে খেলতে খেলতে, অনেক খেলোয়াড় কাটিয়ে—হঠাৎ দেখছি, আর-এ, কোথা, সামনেই তো গোলপোস্ট। খেলোয়াড় বলতে শুধু গোলকি আর আমি। নেব নাকি একটা শট। বল শুধু দুটো পোস্টের মধ্যে দিয়ে গড়িয়ে দিলেই হবে। কারণ, এই শট গোলকি ধরবে না। সে দাঁড়িয়েই থাকবে, পোস্টে হেলান দিয়ে। দু'পা ভাঁজ করে যেমনটি দাঁড়িয়ে আছে। দাঁতে নখ কেটে যাবে।

ধুৎ! কোনও মানে হয়। কোনও মানে আছে এখনই সেই শট নেওয়ার যে শট গোলকি ধরবে না। যে গোলে রেফারির বাঁশি বাজবে না। গ্যালারি উঠে দাঁড়াবে না।

যে গোলে খেলা শেষ!

বোবাযুদ্ধ, জানুয়ারি ২০০২

আমার বন্ধু হানিফ

দিন পনের আগের' কথা। ধর্মতলার মোড়ে রাস্তা পার হচ্ছি—হঠাৎ শুনলাম একটা ক্রুদ্ধ চিৎকার, 'তুমি আমাকে শুওরের বাচ্চা বল্লে কেন?' ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, লেনিন মূর্তির সামনে দ্রুত লোক জমে যাচ্ছে একটা দাঁড়ানো ট্রামকে ঘিরে। একজন সার্জেন্ট মোটর সাইকেল ছেড়ে ট্রামের কনডাক্টরকে কেবিন থেকে নামিয়ে প্রচণ্ড মারছে। একবার রিভলভারও বের করতে গেল।

হানিফ না? তিরিশ বছর পরে দেখা। তবু চিনতে পারলাম। ভিড়ের মধ্যে হানিফও চিনতে পারল আমাকে। সার্জেন্ট তখন ওর কলার চেপে ধরেছে। হানিফ কাঁদো কাঁদো মুখে আমার উদ্দেশে বলল, 'তুই বলরে নন্দু, আমি কী দোষ করেছি।

ইনি ঘুষ নিচ্ছিলেন লরি থামিয়ে। আর আমি কেবিন থেকে বলেছি, টাকা পয়সা পরে নেবেন দাদা— ট্রামটা আগে ছেড়ে দিন। তাতে লোকটা আমাকে 'শুওরের বাচ্চা' বলল কেন তুই জিজ্ঞাসা কর।'

এবার সার্জেন্ট ওর নাকে এক ঘুসি মারল। প্রথমে একটু রক্ত বেরুল। কান্নার জন্যে সর্দি—হানিফ ভেবেছিল বোধহয়। হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিল। তারপর বড় বড় ফোঁটার চোখের জলের মতোই নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল টপ টপ করে।

সার্জেন্ট একবার কটমট করে তাকাল আমার দিকে। ড্রাইভার আমাকে চেনে। আমি অ্যাকম। আমার কী প্রাপ্য। চড়, না থাপ্পড়? ভিড়ের মধ্যে আমি দু'পা পিছিয়ে আসি।

হানিফ আমার ছোটবেলার বন্ধু। আমাদের ছোটবেলায় অনেকরকম খেলা ছিল, এখনও হয়ত আছে তারা, কিন্তু তাদের সেই জৌলুস আর নেই। যেমন, আমাদের এই চেতলার ঘুঁটের মাঠে হত বিরাট তুবড়ি প্রতিযোগিতা। তুবড়ি এখনও হয়, কালিপুজোয় এখানে ওখানে তুবড়ি জ্বলতেও দেখি। কিন্তু প্রতিযোগিতা? উঠে গেছে। প্রতিযোগিতা বলতে তুবড়ির ফুলঝুরির শেষ ফুল কতটা উঁচুতে উঠল, আর তার ঝাড়ই বা কী রকম। এক-একটা ফুলের সাইজই বা কী? কোনও তুবড়ি থেকে জুঁইফুল বেরোয়, কোনটা থেকে বেরোবে বড় বড় সন্ধ্যামালতী।

এইসবই ছিল প্রতিযোগিতায় বিচার্য বিষয়। উচ্চতা মাপার জন্য একটা ফুট-পঁচিশের বাঁশে ৬ ইঞ্চি অন্তর ওয়ান-টু-থ্রি এভাবে ৫০ পর্যন্ত টিকিট মারা থাকত। এখন কেউ বললে বিশ্বাস করবে না, কালীপুজোর রাতে ফাইনালিস্টরাই শুধু সমবেত হত। ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল অন্তত ১৫ ফুট। হিটে অনেকে সেটুকুও পেরোতে পারত না।

এখন ফ্ল্যাটবাড়িতে ভরে গেলেও, আমাদের ছোটবেলায় (১৯৪৭ নাগাদ) ঘুঁটের মাঠ ছিল এ অঞ্চলে একটি প্রান্তর বিশেষ। সেই প্রান্তর হর্ষধ্বনিতে ভরে যেত যখন প্রথম স্থানাধিকারীর হাতে তুলে দেওয়া হত একটি শিল্ড। স্বয়ং বিধাতার হাতে যার কারুকার্য। তখন তাই মনে হত। সেরা তুবড়ি-শিল্পীর গলায় সুবর্ণরঞ্জিত রৌপ্যপদক আগেই ঝুলেছে। রীতিমতন ভিক্টরি স্ট্যান্ডের উচ্চতমটিতে তাকে দাঁড় করানো হত, যে এক নম্বর। কিন্তু যে বছর শিল্ডপ্রাপক হিসেবে মাইকে ঘোষণা করতে হল হানিফ মহম্মদের নাম, সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। তাচ্ছিল্যবশতই তার তুবড়ি তিনটি সবার শেষে রাখা হয়েছিল। কারণ, কোথাকার কে এক হানিফ মহম্মদ, জাতে মুসলমান, মায়ের পুজোয় সে আবার তুবড়ি বানাবে কী। কেউ কেউ বলল, কালীপুজোয় মুসলমানের তুবড়ি অ্যালাও করল কে। ডিসকোয়ালিফাই করে দাও। এদিকে এই প্রথম কোনও তুবড়ির ফুল বাঁশ ছড়িয়ে আরও দু'ফুট উঠে গেছে। তাছাড়া জানা গেল হানিফের জামাইবাবু, গুজরাটে তার কাপড়ের কল, কালীপুজোর পুরো প্যান্ডেল খরচটা এবার তিনিই দিয়েছেন। সুভেনিয়েরে জনৈক ওয়েলউইশার হিসেবে তাঁর খাতে সেকালের ৩ হাজার টাকা লেখা আছে। এই বিখ্যাত প্রতিযোগিতায় প্রতি বছরেই সভাপতিত্ব করতেন আমার দাদু, বসাকবাড়ির ছোট তরফের মেজকর্তা আদিত্যবর্ণ বসাক। মাথায় চারফুট দু'ইঞ্চি বলে— মেডেল পরাবার জন্যে দাদুর জন্য একটি টুল আনতে হত।

তখন আমাদের পরিবারে বেডফোর্ড গাড়ি এসে গেলেও, বসাকবাড়ির মেজকর্তা আসতেন ওয়েলার ঘোড়ায় টানা একটি গাড়িতে। কিন্তু যে বছর শিল্ডপ্রাপক হিসেবে কোনও এক মহম্মদ হানিফের নাম ঘোষণা করতে হল তাঁকে, তিনি স্তম্ভিত এবং আগেই বলেছি সমবেত দর্শকমণ্ডলীও অবাক হয়ে গেল। তুবড়ি প্রতিযোগিতায় শিল্ড চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্জের পাওয়ার কথা নয়, ঘোষ-বোসরাও পায় না। কিন্তু সাধারণত ঢোল, পোদ্দার

এবং চোংদার এই তিন পদবিধারী তিন তুবড়ি-শিল্পীর কেউ না কেউ প্রতি বছর ফার্স্ট হয়। একবার কোথা থেকে এসে শিউকুমার পাঁড়েও ফার্স্ট প্রাইজ মেরে দিয়েছিল বটে। কিন্তু মহম্মদ হানিফ? এবং আমার স্তম্ভিত হওয়ার পালা এল তখন, যখন দেখলাম, ওইসব করিতকর্মা সাবালকদের হাত থেকে এবার পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ১২ বছরের একটি ছেলে আর সে ঠিক আমারই বয়সী। আর দাদু না চিনলেও আমি তাকে ঠিকই চিনেছি। গাড়িতে ঘেসেড়া দাঁড়াবার জায়গা থেকে পিছন দিকে। খালি থাকলেই, আরও ছোটবেলায়, গোপালনগর মোড় থেকে, হানিফ উঠে বসত সেখানে। আমাদের বাড়ির গেটে গাড়ি পৌঁছবার আগে কতদিন তাকে পিছনের সিট থেকে লাফিয়ে নেমে যেতে দেখেছি। সেই হানিফ তুবড়ি প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়ে বালক-বীর, রাতারাতি চেতলার হিরো হয়ে উঠল।

সবাই জানতে চায় কী তার মসাল্লা। সে তুবড়ির খোল কেনে কোথা থেকে। খোল না ফাটিয়ে তার ফুল ২৫ ফুট ছাড়িয়ে গেল কী করে।

এই তুবড়ির সূত্রেই তার সঙ্গে আমার ভাব জমল। তারা থাকত গোপালনগরে, আফতাব মস্ক লেনে। আমাদের বেহালার বাগানবাড়ির মস্ত দীঘিটি তার বড় আব্বার আমল থেকে তাদের জমা নেওয়া। তাদের মাছের ব্যবসা। আমি যা জানতাম না। বস্তির মধ্যে হলেও ওরা হাটওলার এবং একতলা আর ছোট্ট হলেও ওদের লালরঙের বাড়িটি পাকা, যদিও বৈঠকখানায় বসার জায়গা নেই। জাল রিপু হয়। ওদের সিঁড়ির ঘরে গিয়ে আমি অবাক। এত কিছু ধনসম্পত্তি আছে তার নিজের: আমার তো নিজের বলতে কানাকড়িও নেই। তার ঘরভর্তি ম্যাজিকের নানান সরঞ্জাম। অনেক ম্যাজিক মাথা থেকেই বের করেছে তো। 'তুবড়ি নয়', সে সগর্বে প্রথমদিনেই বললে, 'আমি চাই ম্যাজিক দেখিয়ে সোনার মেডেল পেতে।'

'আমি লন্ডন যাব ম্যাজিক দেখাতে একদিন, দেখবে তুমি!' পরিচয়ের সাতদিনের মাথায় চেতলার কাঠের পোল পেরোতে পেরোতে সে আমাকে বলল একদিন।

হানিফ মেটেবুরুজের হাই মাদ্রাসায় আমার ক্লাসেই পড়ে। আমি পড়তে যাই দূর বালিগঞ্জ গভর্নমেন্টে। স্কুল থেকে ফেরার সময় গাড়ি চেতলায় ঢুকত গোপালপুর দিয়ে (তখন কেওড়াতলার সামনে কাঠের পোল)। আমি ওদের বাড়ির কাছে নেমে পড়তাম। এখন তুবড়ি ছেড়ে আমাকে টানছে ওর ম্যাজিক। ম্যাজিসিয়ান হানিফের দুটো খেলা ছিল আসলে আমার খেলা। স্টেজের ওপর পাতা কাপড়ের নিচে দিয়ে সেটা ছিল আমার কালো সুতো ধরে টানাটানির খেলা। যেমন চোখ-বাঁধা হানিফের সামনে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে যাওয়া যে কোনও নম্বর পড়া। ধরা যাক কেউ লিখে গেল 151100 : মাঝখানে থামা দিয়ে দিয়ে একের জন্য একবার এবং পাঁচের জন্যে পাঁচবার সুতো টানব। জিরো মানে একটু বেশি সময় টেনে থাকব। এভাবে সুতো টানা থেকে সে অনেক কিছুই বলে দিতে পারত। যেমন তার সামনে কে? তার দাড়ি আছে কি? সে কি নীল জামা পরে এগোচ্ছে? ও শুধু হ্যাঁ-না বলে যাবে। সুতো বাঁধা থাকে ওর পায়ের বুড়ো আঙুলে। 'হ্যাঁ' মানে একবার টান। 'না' মানে দু'বার।

একবার মেটেবরুজে ওর ফুফার বাড়িতে কার জন্মদিনে যেন, হানিফের ম্যাজিক। বাড়ির ছাদে স্টেজ। টেবিলে রাখা একবাটি দুধ ভ্যানিশ করবে হানিফ। সেটাই খেলা। আসলে, আমি বোলচালের ফাঁকে দুধটা ফেলে দেব— অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে। সেবার পারিনি। কারণ উইংসের পাশে তখন এসে গিয়েছিল হানিফর ফুফার মেয়ে মুমতাজ। ফেললে তার গায়ে ফেলতে হয়। দুধটা আমি এক চুমুকে খেয়েই ফেললাম হানিফের

আড়ালে। আমি সে-কথা বলিনি। মুমতাজের কাছে শুনে হানিফ বুকে জড়িয়ে ধরল আমায়। কারণ দুধ তো নয়। সেটা ছিল ময়দা আর পিটুলিগোলা পচা জল। যা ম্যাজিক শেষে আবার আবেগে বোতলে ভরে রাখা হত। উচ্ছ্বাসে আমার গালে চুমো দিল হানিফ। তুবড়ির মশল্লার ভাগ আর তৈরির তরিকা সেদিনই প্রথম জানাল।

সেই হানিফ একদিন হঠাৎ খেয়াল করল, আমাদের বাড়িতে আমার ঘরে ওকে আমি শুধু তখনই নিয়ে যাই যখন বাড়িতে বিশেষ কেউ থাকে না। বিশেষত দাদু আর মা। দাদু তো পরের বছর কালীপুজোয় তুবড়ি প্রতিযোগীদের লিস্ট থেকে হানিফের নাম নিজের হাতে কেটেই দিলেন।

হানিফের সঙ্গে আমার শেষ কথা হয় হর্টিকালচার বাগানে। তখন বিকেলবেলা। দৌড়ে একটা শেডের নিচে যাবার আগেই শীতের অকাল বৃষ্টিতে খুব ভিজে গেলাম দুজনে। হানিফ হঠাৎ জানতে চাইল, 'আচ্ছা নন্দু, তোদের বাড়িতে আমি যখনই যাই— যাই চোরের মতো। যখন কেউ থাকে না। বা, দুপুরবেলা। যখন সবাই ঘুমোয়। ঝি-চাকর ছাড়া একদিনও কেউ আমাকে এক গ্লাস জল দেয়নি। এবং জল দেয় কাচের গ্লাসে। তোর মা-বোন কেউ কখনও আসেনি আমার সামনে। সে কি তোরা বড়লোক বলে? সেদিন তোর সঙ্গে দেখা হল গ্লোব সিনেমার লবিতে। আমিও চ্যাপলিন দেখতে গিয়েছিলাম। তুই আমাকে চিনতেই পারলি না। কী ব্যাপার বল তো? আমার দিদি বলল কী, তোমার বন্ধু তো তোমাকে চিনতেই পারল না।' আমি ইতস্তত করছি দেখে ও আমার হাত চেপে ধরল। বলল, 'না-না এ তোকে বলতেই হবে। এবার কালীপুজোয় তুবড়ি-প্রতিযোগিতা থেকে আমার নাম কাটা গেল। কে কাটল?'

আমি মাথা নিচু করে আছি দেখে হানিফ বলল, 'না-না বলো। বলতেই হবে তোমাকে।'

দেখলাম শীত নয়, উত্তেজনাতেই ওর হাত থরথর করে কাঁপছে। ওকি, আমার দাদুর কীর্তি জেনে ফেলেছে?

আমি বললাম, 'কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদ মারা গেছেন। দাদু বলছেন খুন করা হয়েছে তাঁকে। আমি সেই জন্যেই তোমাকে সেদিন চিনতে পারিনি। দাদু পাশে ছিলেন বলে।'

হানিফ বলল, 'কিন্তু কেন? শ্যামাপ্রসাদ মারা গেছেন, আমিও জানি। কিন্তু আমি কী দোষ করলাম। না-না বলো তুমি। বলতেই হবে তোমাকে। নইলে বুঝব তুমি আমার বন্ধু নও।'

'শোনো হানিফ', আমি এবার, এতদিনে বলতে বাধ্য হলাম ওকে, কারণ, 'তুমি মুসলমান।'

এরপর হানিফের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। সে আর কখনও তুবড়ি পাঠায়নি। কোথাও ম্যাজিক দেখিয়েছে বলেও শুনিনি। ওরা দেশের বাড়ি মুর্শিদাবাদ চলে গেছে, এটাই জানতাম।

তিরিশ বছর পরে ফিরে দেখা হল হানিফের সঙ্গে। এবারও আমি হানিফকে চিনলাম না। আমার সামনে লাথি মারতে মারতে হানিফকে গাড়িতে তুলল সার্জেন্ট।

শারদীয় খেলা, ১৪০৯

অন্ধস্কুলে ঘণ্টা বাজবে কখন

আমার গল্প একটাই। আর সেটা নিয়েই আমি সব গল্প লিখি, যদিও সেই মূল গল্পটি নেহাতই শিশুপাঠ্য।

এক যে ছিল ইঁদুর। আর এক ছিল হুলো। ইয়া লম্বা তার ফুলো লোমের ল্যাজ। হুলো তখন দিবানিদ্রা দিচ্ছে; নিদ্রিত তার ফুটপাত জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিশাল লোমবহুল ল্যাজও, যখন দুপুরবেলা ইঁদুর গিয়ে তাকে জাগায়।

বেড়াল : কী ব্যাপার?

ইঁদুর : তুমি আমাকে খাও।

বেড়াল : (চোখ বুজে) : আজ আমি যথেষ্ট খেয়েছি।

ইঁদুর : কিন্তু আমি তোমার কাছে এসেছি।

বেড়াল : বললাম তো আমার খিদে নেই।

ইঁদুর : কিন্তু আমাকে খাওয়া তোমার কাজ। বা, কর্তব্য।

বেড়াল : তুমি পরে এসো।

ইঁদুর : বেশ, না হয় পরে খাবে। এখন, অন্তত মেরে রাখো।

বেড়াল (বিরক্তমুখে) : আচ্ছা। তুমি মুণ্ডটা আমার মুখের মধ্যে রাখো। আমি একসময় খেয়ে নেব'খন।

ইঁদুর তাই করল। বেড়াল হাঁ করে ফের ঘুমিয়ে পড়ে।

ইঁদুর অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করে।

তারপর একসময় আর পারে না। বেড়ালের নাকে ল্যাজ ঢুকিয়ে তাকে জাগাতে বাধ্য হয়।

বেড়াল : কী হল?

ইঁদুর : কই। কখন খাবে?

বেড়াল : আঃ! দেখছ না, আমি ল্যাজটা ফুটপাতে বিছিয়ে রেখেছি। কেউ মাড়াবে, তবে না খ্যাঁক করে তোমাকে দেব এক কামড়!

ইঁদুর : কত লোক তো রাস্তা দিয়ে গেল। কেউ তো মাড়াল না!

বেড়াল : দেখা যাক না। কেউ মাড়ায় কিনা!

ইঁদুর (বেড়ালের মুখের মধ্যে বসে চিঁ-চিঁ করে) : সব্‌ব্বাই ল্যাজটা ডিঙিয়ে যাচ্ছে। একের পর এক।

বেড়াল : আরে, অত অধৈর্য হও কেন? কেউ মাড়ায় কিনা দেখাই যাক না। নইলে, ইস্কুলের ঘন্টা তো বাজল বলে।

ইঁদুর : ইস্কুল?

বেড়াল : আ-হ্যাঁ, ইস্কুল! ওই যে দূরে মস্ত বাউণ্ডারিওয়ালা বাড়িটা দেখছ, ওটাই ব্লাইণ্ড ইস্কুল। সাড়ে চারটেয় স্কুলের ঘন্টা পড়বে। হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়বে অন্ধ ছেলেমেয়েরা। ওদের কেউ না কেউ ঠিক মাড়িয়ে দেবে'খন। তুমি ততক্ষণ ধৈর্য ধর।

এত বলে বেড়াল ফের হাঁ করে ঘুমিয়ে পড়ল।

শারদীয় দর্পণ, ১৯৯০

সে আসে

এক্কা

প্রিয় বন্ধুরা, আমি প্রথমেই বলে রাখছি, এটা কোনও অ্যাডভেঞ্চারের বা বিপদের গল্প নয় যেমনটা নাকি তোমরা পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই পড়ে থাক। এই গল্পটি নিজেই বিপজ্জনক। এই গল্পটি যে পড়বে বা শুনবে সে-ই ভীষণ বিপদে পড়ে যাবে। বিপদে পড়ে যাবে বলতে, পড়ে যাবে হাড়-হিম-করা সেই ভয়ের মধ্যে যা তোমাকে 'ও মাগো' বা 'ওগো বাবাগো' বলে চিৎকার করে উঠতে বাধ্য করবে। হ্যাঁ, ভূতের গল্পই আমি বলতে যাচ্ছি। সত্যি ভূত। কারণ আমি পৃথিবীর সেই লুপ্তপ্রায় মানুষদের মধ্যে একজন যে ভূত দেখেছে। এই যেমন তোমাদের দেখতে পারছি বা তোমরা আমাকে—সে রকম। আমি ভূতের সঙ্গে কথা বলেছি। এই যেমন তোমরা আমার সঙ্গে কথা বলছ, বা আমি তোমাদের সঙ্গে। ভূতের সঙ্গে আমি গাড়ি চেপেছি। ভূ-ভূতকে আমি ছুঁয়ে দেখেছি।

আজকালকার ছেলেদের এই একটা মস্ত দোষ। তাদের সব কথাতেই জিজ্ঞাসা—কেন? কী কারণে? আমাদের ওপরের ফ্ল্যাটে থাকে কৌশিক চক্রবর্তী। একদিন কথায় কথায় আমি তাকে বললাম, কলকাতার বড় বড় হোটেলগুলোর যত এঁটোকাঁটা জমে সেই পচা খাবারের স্তূপ পরদিন ঝুড়ি করে নিলাম হয়। গরিব লোকেরা নিলামদারের কাছ থেকে তা কেনে। এটা জানো কি? শুনে কৌশিক জানতে চাইল, 'কেন?' আচ্ছা বল তো, এটা কি একটা প্রশ্ন হল? ভিখারি, ভবঘুরে, গাঁটকাটা, পাগল, রাস্তার কুকুর—এরা এঁটো খাবে না তো খাবেটা কী শুনি? হোক না একটু পচা! ছেলেটা আমার উত্তর শুনে তারপরেও প্রশ্ন করে, কেন এঁটো খাবে? কেন পচা খাবে? বলে কিনা, কুকুরেই-বা পচা খাবে কেন? শোন কথা! অথচ ক্লাস ফাইভে উঠল। সাউথ পয়েন্টের ছাত্র। এই তো জ্ঞানের বহর। তবে তোমাদের মধ্যে যে জানতে চাইলে, এই যে, কী নাম তোমার, 'তা আপনি ভূত দেখেছেন আর সেই গল্প আমাদের করবেন, এতে আমাদের বিপদটা কোথায়—' তুমি কিন্তু অত্যন্ত রেলেভেন্ট প্রশ্ন তুলেছ। 'রেলেভেন্ট' মানে কি নিশ্চয়ই কেউ জানতে চাইছ না। জানি, 'প্রাসঙ্গিক' বললে জানতে চাইতে। তা তোমার প্রশ্ন যুক্তিসঙ্গত। এই যে আমি আজ গল্পটা বলতে যাচ্ছি—এতে বিপদ আমার! তোমাদের কোনও বিপদ নেই। তোমাদের বিপদ আসবে তখনই যখন শোনার পর এই গল্পটি তোমরা কারুকে বলতে যাবে।

কারণ, এই গল্পের নায়ক একজন ভূত। তার নাম চতুর। আর যখনই কেউ তার গল্প বলে, চতুর সেখানে আসে। ক্যালিফোর্নিয়ার সান হোসে শহরে একবার আমার দুই ভাইপো আর আর তিন বন্ধুকে গল্পটা বলছিলাম। অ্যাটলান্টিক পেরিয়ে বিচ্ছুটা সেখানেও হাজির! চতুরও তোমাদের মতো একটা বাচ্চা ছেলে কিনা। আর সেও ঠিক তোমাদের মতো ভূতের গল্প শুনতে কী যে ভালবাসে! হোক না, সে গল্প তার নিজের, তবু। গল্পের আসরে সে স্বয়ং হাজির হবেই। অবশ্য এটা বাঁচোয়া যে অন্য ভূতের গল্প হলে সে আসরে চতুর আসে না। সে আসে শুধু তার গল্প হলে।

দোক্কা

একসময় প্রায় প্রতি বছরেই আমরা শ্যামপাহাড়ি নামে একটা জায়গায় বেড়াতে যেতাম।

আমরা বলতে আমি, তোমাদের কাকিমা, আর পিঙ্কিদিদি। জায়গাটা হল বাংলা-বিহার সীমান্তে। দুমকা রোডের ওপর। নলহাটি থেকে মাত্র ১৬ কিলোমিটার দূরে। সমস্ত সীমান্ত-এলাকা যেমন হয়, এখানে রাস্তার ওপর ভারী পাথর-বাঁধা একটা বাঁশের গেট নেমে আসে আর উঠে যায়। ওপারে বেশ ককিলোমিটার নো ম্যানস্ ল্যান্ড। তারপর পড়বে হরিপুরা, শিকারিপাড়া, লাঙলভাঙা, মণ্ডলপাহাড়ি, পাতাবেড়িয়া, (কাছেই মাসাঞ্জোর)—এভাবে দুমকা পর্যন্ত। এখানে চারদিকে উঁচু-নিচু টিলা, লালমাটির রাস্তা শালজঙ্গল, আরও দূরে দুমকার পিছনে রাজমহল পর্বতশ্রেণী। এইরকম ব্যাকগ্রাউণ্ডে শ্যামপাহাড়িতে রয়েছে একটা আবাসিক....আবাসিক... ওর নাম কী, ও-হ্যাঁ, রেসিডেন্সিয়াল স্কুল। এখানে ছাত্ররা থাকে হস্টেলে, মাস্টারমশাইদেরও কোয়ার্টাস আছে। গেটঅলা বিরাট স্কুলবাড়ি রাস্তার ওপরেই। আগে প্রায় প্রতিবছর পুজোর সময় আমরা এখানে এসেছি। মুকুন্দ স্মৃতিভবন নামে স্কুলের গেস্ট হাউসে থাকি। এবারেই প্রথম মাঝখানের তিনটে পুজো বাদ গেছে।

একদিন মাঠের মধ্যে দিয়ে ধুলো উড়িয়ে স্মৃতিভবনের সামনে একটা জিপ এসে থামল। বারান্দা থেকে দেখলাম, লোকেশনারায়ণ মিশ্র নামছে। যেবার সাহেবগঞ্জ বেড়াতে যাই, ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সে ছিল সাহেবগঞ্জের এস ডি ও। কদিনেই খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল বেশ কিছুদিন।

লোকেশ এখন সাস্তাল পরগনার ডেপুটি কমিশনার, ও আমাকে জানাল। বলল, জানি, প্রত্যেক বছর পুজোয় আপনারা এখানে আসেন। রামপুরহাটে দিদিকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একটা খবর নিই।' লোকেশ হঠাৎ দুম করে বলল, 'চলুন, আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'দুমকায়। আমার বাংলোয়।'

কাকিমা আর পিঙ্কি অমন হুট করে যেতে রাজি নয়। লোকেশও ছাড়বে না। অগত্যা একদিনের জন্যে আমাকে ওর সঙ্গে যেতে হল। ঠিক হল, কাকিমা আর পিঙ্কি সে-রাতটা সেকেন্ড টিচার যামিনীবাবুর বাড়িতে থাকবে। ওখানকার কারুকে কিছু বলে যাবার সুযোগ পেলাম না এত তাড়াহুড়ো করল লোকেশ। বলতে গেলে, টেররিস্টদের মতো, প্রায় অপরহণ করে নিয়ে গেল আমাকে।

আচ্ছা, এইবার শুরু হবে চতুরের গল্প। কী নাম বললে তোমার তখন, শুভব্রত? শুভব্রত, তুমি উঠে সুইচটা অফ করে দাও। যদিও লোডশেডিং চলছে, কিন্তু কারেন্ট কখন এসে পড়ে ঠিক নেই। দরজা বন্ধ করে দাও। না-না, এতে চত্বরের আসতে কোনও অসুবিধা হবে না। তার যত অসুবিধে নিয়ন কি বালব জ্বললে। তোমরা সবাই কাছে এগিয়ে এসো। গা ঘেঁষে বসো।

মোমবাতি যেমন জ্বলছে, জ্বলুক।

তেক্কা

দুমকা পর্যন্ত ৬০ কিলোমিটার রাস্তা 'হ্যাঁ না', 'ভালই'—এ-ছাড়া লোকেশ, কেন জানি না, একটাও কথা বলল না। মনে হল, লোকেশ বেশ পালটে গেছে। লোকেশ অথচ কেমন যেন লোকেশ-নয় মনে হচ্ছিল। আগে কি এতটা লম্বা ছিল লোকেশ? সবসময় অন্য কী যেন

ভাবছে। 'তুমি এখনো বিয়ে করনি লোকেশ?' জানতে চাওয়ায় প্রথমে বলল, 'হ্যাঁ।' 'তোমার স্ত্রী কি এখানে?' জানতে চাইলে চমকে উঠে বলল, 'না-না, বিয়ে আমি করিনি। পিছনের সিটে, একবার যেন দেখেছিলাম একটা ন্যাড়ামাথা বাচ্চা বিহারি ছেলে বসে আছে। মাথায় তার মস্ত টিকি। পরে তাকে আর দেখতে পাইনি। চোখের ভুল আর কী। শহরের বাইরে ছোট্ট বালুস্ট্রার্ড পাঁচিলে ঘেরা (ময়দানে যেমন) প্রকাণ্ড কম্পাউন্ডের মধ্যে লোকেশের বাংলো। কম্পাউণ্ডে প্রচুর গাছ। বাংলো বলতে পুরনো একতলা বিশাল গৃহস্থবাড়ি একটা। অনেকগুলো ঘর। প্রায় সবই তালাবন্ধ। দুটি ঘর নিয়ে লোকেশ থাকে। একা? হ্যাঁ, একা।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। লোকেশ রান্নাঘরে গিয়ে নিজেই চা করে আনল। বাড়ির ভেতর দিকের বারান্দায় বসে আমরা চা খেতে লাগলাম। বাগানের মাথায় কখন একটা আস্ত চাঁদ উঠে পড়েছে। পাঁচিল টপকে তার আলো এসে পড়ছে উঠনে। লোকেশ আগের মতোই চুপচাপ। তবে কথা তুললে উত্তর দিচ্ছে।

পাঁচিল-ঘেরা মস্ত উঠনের দুদিকে সারি সারি খানদশেক খুপরি। চাল টালির। একটাতেও দরজা নেই। সামনের দিকটা খোলা। ঘরগুলো খালি। আমি যখন জানতে চাইলাম, 'ওগুলো কী জন্যে', লোকেশ বলল, 'গরু। বাড়ির মালিকের একটা গোশালা ছিল আপনি বলতে পারেন।' এই সময় ছাদে দৌড়োদৌড়ির শব্দ। আমি ভয় পাইনি। লোকেশ নিজের থেকেই বলল, 'ভয় নেই। সারাদিন আগুন গরম। সন্ধ্যাবেলা হিম পড়ে। তাই এই সময় ছাদ ফাটে।' কী আশ্চর্য নিথর তার কণ্ঠস্বর! তার চোখ দুটোই-বা এমন ঘূর্ণমান আর পাগলাটে হল কবে! সে ছাদে ওঠার সিঁড়ির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। 'চলুন ভেতরে যাই।' বলে ঘরে ঢুকে লোকেশ ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করল। একটু পরে 'আপনি থাকুন, কিছুক্ষণ বইটই পড়ুন। কি গান শুনুন।' রেকর্ড প্লেয়ারের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল, 'আমি ঘন্টাখানেকের মধ্যে ঘুরে আসছি। রাত্রে গল্প হবে। ভয় নেই!' লোকেশ স্মিতমুখে আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'ভয় পাবার কিছু নেই। একটা কাজের ছেলে আসতে পারে। তার নাম চতুর। ছেলেটা বোবা। দেখবেন, তার মাথা ন্যাড়া। ঘাড় পর্যন্ত প্রকাণ্ড টিকি। কাজ-টাজ করে চলে যাবে। আপনি জিপে দেখেছেন ওকে।'

লোকেশ চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই আমি আবার ছাদে দুপদাপ শব্দ পেলাম। আমি কৌতূহল চাপতে না পেরে দরজা খুলে ছাদের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম। সিঁড়িতে আলো নেই। শুধু ল্যাডিং-এর কাছে বন্ধ কাচের জানালা দিয়ে খানিকটা জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, ছাদের দরজার ওপর ভেতর দিকে থেকে একাধিক খিল মারা। এবং তার প্রত্যেকটি নাটবল্টু দিয়ে সাঁটা। খোলার উপায় নেই। তাহলে লোকেশ যা বলে গেছে তাই ঠিক। ছাদ ফাটাছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখি একটা ফতুয়া-পরা বাচ্চাছেলে মুখোমুখি রান্নাঘরে বঁটিতে কী কুটছে। তার মাথা ন্যাড়া। মস্ত ঘাড় পর্যন্ত টিকি। গলায় পৈতে। তবে তার মাথা নিচু। মুখ দেখা যায় না। এই নিশ্চিত সেই কাজের ছেলেটা।

'তুমি চতুর?'

সে সাড়া দিল না। মুখ তুলল না। বাংলা বোঝে না ভেবে বা হয়ত কালাও, এ-রকম ভেবে আমি হিন্দিতে আরও চেঁচিয়ে বললাম, 'তুম ক্যা চতুর হো?' সে বঁটি পর্যন্ত মুখ নামিয়ে আনে। বড় লাজুক ছেলে তো। 'এক পেয়ালা চা বানা না' বলে আমি ঘরে চলে এলাম। আধঘন্টা হয়ে গেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অগ্রদানী' গল্পটা 'খাও হে চক্রবর্তী' পর্যন্ত সবটা পড়া হয়ে গেল, চায়ের দেখা নেই। বাইরে বেরিয়ে দেখি, রান্নাঘরে আলো জ্বলছে, বঁটিটাও পড়ে আছে। কিন্তু চতুর নেই।

সিঁড়িতে চোখ পড়তে দেখি, ওই যেখানটা জানলা দিয়ে এসে চাঁদের আলো পড়ে আছে, সেখানে থেকে চতুর নেমে আসছে। তার মাথা বুকের দিকে নিচু। মুখ দেখা যায় না।

আমি ধমক দিলাম, 'এই চ'—'

'তুর' পর্যন্ত বলে উঠার আগের চতুর ল্যান্ডিং পর্যন্ত তরতর করে উঠে গিয়ে ওধারে অদৃশ্য হয়ে গেল। কী অবিশ্বাস্য দ্রুততায়! চার্লি চ্যাপলিন যে-ভাবে হাঁটে অনেক সময়, তার চেয়েও দ্রুত পায়ে। আর কীভাবে উঠে গেল জানো? এই দেখ, লোম খাড়া হয়ে উঠেছে আমার! সে উঠে গেল আমার দিকে মুখোমুখি, পিছু হেঁটে, যদিও তার কিশোর মুখখানা বুকের সঙ্গে লুটিয়ে। এভাবে মানুষে সিঁড়ি ভাঙে? পিছু হেঁটে অত দ্রুত কেউ উঠে যেতে পারে সিঁড়ি দিয়ে? আর অমন চোখের পলকে?

উঠন জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। দশ দশটি স্বাস্থ্যবতী মুলতানী গরু দশটি গোয়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে আমার দিকে ড্যাবড্যাবে চোখে তাকিয়ে আছে। তাদের প্রত্যেকের গা চুমকাম করা। সাদা বুঝলাম সবই। আমার হাড় হিম হয়ে এল। বলা বাহুল্য, লোকেশ আর ফেরে নি। রাত ১২ টায় দুমকা থেকে রামপুরহাটের লাস্ট বাস ছাড়ে। পায়ে হেঁটে আমি বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছলাম।

আরও রাতে, যামিনীবাবু সব শুনে বললেন, 'করেছেন কী! সাঁওতাল পরগনার ডি সি, কী নাম বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, এল এন মিশরা—ওঁর জিপ তো লাঙলভাঙার কাছে খাদে পড়ে গিয়েছিল। এ তো দু-বছর আগের ঘটনা। উনি নিজেই ড্রাইভ করছিলেন। সঙ্গে ছিল ওই ছেলেটা—চতুরানন দ্বিবেদী। দুজনেই স্পট-ডেড।'

চৌকা

গল্পটা শুনলে। আর শুনলে একদম হর্সের মাউথ থেকে। রোমাঞ্চকর! কী বল? কিন্তু, তবু, যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন করেছিল শুভব্রত, এ তো আরও-একটা ভূতের গল্প। এবং এতে আমাদের বিপদটা কোথায়? হ্যাঁ, আমি এগিয়ে আসতে বলেছি। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে বলেছি তোমাদের। কেন তা জানো কি? জানো না!

বলছি, শোন,

এই নিয়ে গল্পটা আমি (সান হোসে নিয়ে) পাঁচবার বললাম। যতবার বলেছি ততবার... ততবার চতুর সেখানে এসেছে। কিন্তু তবু বলব, এটাও তত ভয়ের নয়। ভূত আসে আসুক। দেখা না দিলেই হল।

আসলে, চতুর যেভাবে আসে সেটাই ভয়ের। সে আসে শ্রোতাদের একজন হয়ে। কীভাবে?

এই যে তোমরা কজন এখানে এসেছ, এর মধ্যে একজন আসলে আসোনি। ওই যে শুভব্রত, ও হয়ত এখন ম্যাথ করছে বাড়িতে। শুভব্রত আসেনি। এসেছে চতুর। শুভব্রত সেজে।

না-না, চিৎকার কর না শুভব্রত। তুমি নাও হতে পার। তুমি হয়ত এসেছ। তাহলে অন্য কেউ। পরে খোঁজ নিও তোমরা। একজন আসেনি। এমনকি সে-জন আমিও হতে পারি। হয়ত খোঁজ নিয়ে দেখবে, আমি আজ এই সময় শান্তিনিকেতনে কালোদার দোকানে চা খাচ্ছিলাম।

হঠাৎ নিবে গেল মোমবাতিটা। কে নেবাল? না, চতুর নয়। মোম জ্বললে, আমি

আগেই বলেছি, চতুরের কোনও অসুবিধে হয় না। হাওয়াই নিবিয়েছে। আমি আবার বলছি, তোমরা চুপ কর। চুপটি করে বসে থাক। যতক্ষণ না আলো আসে। কেউ কারুকে জড়িয়ে ধরতে যেও না। ভুলে যেও না, যাকে জড়াবে, সে চতুর হতে পারে।

মনে রেখ, আমরা যারা এখানে উপস্থিত আমাদের মধ্যে একজন চতুর।

শারদীয় সকাল, ১৯৯২

বলাবাহুল্য

একবার এক মশা-গিন্নি ঠিক করল, গোশাল ছেড়ে সে কিছুদিন হুই-উঁচুতে হাতির কানের মধ্যে বসবাস করবে এবং সেই মতো হাতির কানের কাছে উড়ে গিয়ে যথা সম্ভব ভনভনিয়ে তার অভিলাষ ব্যক্ত করে জানাল, মহাশয়ের যদি কোনও আপত্তি থাকে জানাবেন।

বলাবাহুল্য, উত্তরে হাতি, শুঁড় দিয়ে আর একটা কচি দেখে ডাল ভেঙে নিয়ে ফল পাতা সহ সবটা উদরে পাঠিয়ে দিল।

এক সপ্তাহ পরে মশা-গিন্নি ফ্যামিলি নিয়ে হাজির। বলল, 'মহাশয় আপনি যখন কিছু জানালেন না, ধরে নিচ্ছি, আপনার কোনও আপত্তি নেই।' এত বলে সে হাতির কানের মধ্যে ঢুকে গেল এবং সেখানেই সপরিবারে বসবাস করতে লাগল।

বলাবাহুল্য, প্রথম ক'দিন ভালই লেগেছিল। হাতি সেদিন কান-পর্যন্ত ফণা-তোলা মস্ত ময়াল সাপটাকে শুঁড়ে তুলে নদীর ওপারে ছুঁড়ে ফেলে দিল—এবং তারপর বানভাসি নদীর খরস্রোত সাঁতরে ওপারে গিয়ে উঠল—তটস্থ ওরা, শেষ পর্যন্ত না ভেবে পারেনি যে, এসব ওরাই করছে।

কিন্তু, দেখা গেল অসুবিধে হচ্ছে মশা-গিন্নির এবং খুবই। তিন দিনের মাথায় তার এক ফোঁটা রক্ত চাই-ই আর সেজন্য মানুষের পাতলা চামড়াই আদর্শ। আর ঐ রক্তটুকু চুষে না পেলে, তার গর্ভসঞ্চার হয় না—তিনদিন অন্তর ডিম পাড়তে জলও চাই কিছুটা। এখানে কোথায় মানুষ। কোথায় জল।

পুরুষদের আর কী। কার গর্ভ হল না হল, তাতে ওদের ভারি বয়েই গেল। ওরা তো গাছ-পাতার রস খেয়েই দিব্যি বেঁচে থাকে। ওদের আর গর্ভযন্ত্রণা সইতে হয় না। ডিম পাড়াপাড়ির দায়ও নেই।

কয়েক দিন যেতে না যেতেই তাই, মশা-গিন্নি বুঝতে পারল এত উঁচুতে, এ হেন-বাতাস-বহুল বড়সড় ও পরিচ্ছন্ন বাসস্থান তার বা তাদের পক্ষে আদৌ উপযুক্ত নয়। বলা বাহুল্য, তখন সে হাতিকে বলল, 'মহাশয়, আপনার কর্ণালয়টি রাজপ্রাসাদ-বিশেষ হলেও আমাদের পক্ষে মোটেও সুবিধাজনক নয়। তাই আমি আমার পূর্বতন বাসা অন্ধকার ও মলমূত্রগন্ধী খড় খুরনিকেতনেই আবারও ফিরে যাবার অনুমতি চাইছি। আমাদের আত্মীয় স্বজনগণও সব ঐখানে। এ ব্যাপারে আপনার আপত্তি থাকলে জানান।'

বলাবাহুল্য, হাতি এবারেও বলল না কিছু। শুধু অগ্র-পশ্চাৎ গা দুলিয়ে গেল। মৌনই সম্মতিলক্ষণ ধরে নিয়ে মশা-পরিবারও সহর্ষে তাদের জাতীয় সঙ্গীত ('বোঁ-ও-ও....) গাইতে গাইতে হস্তিকর্ণ ছেড়ে উঠে গেল তাদের নরক-স্বর্গের দিকে।

তাদের আসা-যাওয়ার ব্যাপারটা অজানাই থেকে গেল হাতির।

চিরন্তন, জানুয়ারি ২০০২

ঝিনচ্যাকচুকুচুকু

ঝিনচ্যাকচুকুচুকু।

শুনেই তোমাদের মনে হচ্ছে আজ আবার গেছোদাদা তোমাদের নতুন কোন গল্পগাপ্পি দিতে এল। ছোট ছোট সোনা বন্ধুরা, তা নয়। আসলে এই নামে একটা খেলা আছে। কিন্তু খেলাটা যে কী, এক্ষুনি বলব না তোমাদের। কারণ শুনলেই বইপত্তর ফেলে তোমরা এক্ষুনি খেলাটা খেলতে শুরু করে দেবে।

— না না। বলুন আপনি খেলাটা। প্লিজ গেছোদাদা। ঝিনচ্যাক—

কী বললেন?

—চুকুচুকু বললেন। ঝিনচ্যাকচুকুচুকু।

— হাঃ হাঃ হাঃ। কী মজার। এক্ষুনি বলুন গেছোদাদা। প্লিজ, প্লিজ গেছোদাদা।

না, বুকুন। সে তোমরা যতই সবাই মিলে পীড়াপীড়ি করো। সব খেলার মতোই গল্প বলাও একটা খেলা। আর সে খেলারও নিয়মকানুন আছে। এই খেলার গল্পটা আমি বলব সবার শেষে। ৩৭ বছর আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে খেলাটা শিখতে। আর তোমরা ১০-১৫ মিনিট ধৈর্য ধরতে পারবে না?

—৩৭ বছর গেছোদাদা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। পাক্কা ৩৭ বছর। এ বছর পুজোয় দুমকার কাছে বেনাগড়িয়ায় বেড়াতে না গেলে আমার সঙ্গে তো মুঙ্গেরিলালের দেখাই হত না। মুঙ্গেরিলাল তোমারই মতো একটা বাচ্চা ছেলে। ওর বাবা নেই। আর মা সুশীলা বেসরা বেনাগড়িয়া মিশন চার্চ হাসপাতালের নার্স। ওরা সাঁওতাল। উঁচু বাঁধ-দেওয়া টলটলে পানীয় জলের পুকুর। প্রথম দিনেই সেই জলের ওপর দিয়ে ব্যাঙাচি খেলা দেখিয়ে আমাকে অবাক করে দিল মুঙ্গেরি।

—ব্যাঙ জানি গেছোদাদা। কিন্তু ব্যাঙাচি?

— আমি জানি গেছোদাদা। ট্যাডপোল!

বাঃ, ব্রেভো জ্যোতিস্মিতা। তবে, দশে দশ পেতে তুমি—যদি ব্যাঙাচি কী তা বুকুন জানত।

— ব্যাঙাচি খেলাটা বলুন গেছোদাদা।

আরে, এ ব্যাঙাচি সে ব্যাঙাচি নয়। এ হল একটা খোলামকুচি।

— খো-লাম-কুচি!

অবাক করলে বুকুন। খোলামকুচি কী, তাও জানো না? তোমার কাছে কেউ যদি জানতে চায় 'মাউস' কী, যতটা অবাক হবে তুমি, আমি তার চেয়ে বেশি অবাক হলাম। কেউ জানো না তোমরা? ভাল। মানছি, অক্সফোর্ড অ্যাডভান্সড লার্নার ডিক্সনারিতে শব্দটা নেই। আর জুনিয়র এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতেও শব্দটা ওঠেনি। এসব কথা সাহেব-বাচ্চা কেউ বললে কথা ছিল। তোমাকে কি মানায়? তা যাক, শোনো তাহলে। খোলামকুচি আর কিছু না। একটুকরো খুরি-ভাঙা।

— খুরি কী আমি জানি গেছোদাদা। খুরি করে দাদুর জন্যে বাঞ্ছারাম থেকে রোজ রসগোল্লা আসে।

হ্যাঁ। সেই খুরি-ভাঙা। তারই একটুকরো, একটা খোলামকুচি ছুঁড়ে সে পুকুরের এ পার থেকে ও পার পাঠাতে পারত। জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে সেটা যখন ও পারের দিকে যেত, ঠিক

যেন একটা ব্যাঙাচি—ওই, কী বললে তুমি জ্যোতিস্মিতা?

— ট্যাডপোল।

হ্যাঁ, ঠিক যেন ট্যাডপোল। জলের ওপর দিয়ে স্রিক্ স্রিক্ করে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। শেষ লাফটা ছিল দেখার মতো। যে লাফ দিয়ে আমাদের ব্যাঙ বাবাজি—আমাদের বাংলা খোলমকুচি—এক লাফে ডাঙায় উঠে, পড়ে থাকত। মুঙ্গেরি তখন ওপার থেকে ছুঁড়ত।

— হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

হাসলে তুমি সাগর, হাসো। আমি কিন্তু এপার থেকে ছুঁড়ে কোনওবারেই দশ-বারো হাতের বেশিদূরে পাঠাতে পারিনি।

আর একটা খেলা আমাকে দেখিয়েছিল মুঙ্গেরি। অবশ্য সে খেলা শেখার প্রশ্নই ওঠে না। আর তোমরা খেলতেও যেও না যেন। হাত-পা ভাঙবে। অবশ্য খেলবেই বা কী করে। যে খেলায় খেলার সাথী ১০০ গাছ—সে কী তোমাদের খেলা হতে পারে? পারে না। হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি, বলছি। বলব বলেই তো। এই খেলাটার ওদের ভাষায় নাম হল ঝুলঝাপ্পি।

না না গুলতাপ্তি নয়। ভুল শুনেছ তুমি পারিজাত। ঝুলঝাপ্পি। অনেকটা টার্জনের মতো খেলাটা, তবে ঝুরি ধরে নয়। একটা মস্ত কাজুবাদামের বন আছে মিশনের। একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে আর একটা গাছে চলে যাওয়া। চোখের পলকে এভাবে ঝুলতে ঝুলতে গাছ থেকে গাছে কোথায় যে চলে যেত মুঙ্গেরিলাল। তোমরা খেলা বলতে বোঝ খেলার মাঠ। কিন্তু মাথার মধ্যেও একটা মাঠ আছে। মাথার মধ্যে এক খেলোয়াড় আছে, তার নাম মন। সে খেলে শুধু তার নিজের আনন্দে। এমনই এক খেলা ব্যাঙ-ব্যাঙাচি। এমনই খেলা ঝুলঝাপ্পি। এসব খেলা খেলতে দোসর লাগে না। খেলতে তোমাদের কত কিছু লাগে। ব্যাট, বল, উইকেট—তারপর গ্লাভস্, প্যাড কত কিছু পেলে তবে তোমরা খেলতে নামো। তোমার জানো কি এমন খেলা, যে খেলা খেলতে গেলে মন আর মেজাজ ছাড়া কিছুই লাগে না? বা, সামান্য কিছু লাগে। আমি যে ফুটবল খেলা ক্রিকেটের চেয়ে, এমনকি ব্যাডমিন্টনের চেয়ে, এমনকি বিলিয়ার্ড বা টেবল টেনিসের চেয়েও বেশি পছন্দ করি, তার কারণ হল, একটা বল হলেই হল। আর খান দুই পা। মাঠ তো পড়েই রয়েছে। খেলো ইণ্ডিয়া খেলো!

জ্যোতিস্মিতা, তুমি বলেছ ঠিকই। যদিও শুনে সবাই বোকার মতো হেসে উঠলে, আমার ছোট ছোট সোনা বন্ধুরা। তোমার বক্তব্য, তাহলে তো দুটো পা থাকলেই হয়! বলেরই বা দরকার কী। এই তো বললে তুমি! হয়ই তো। তুমি কি পি টি উষার নাম শোনোনি? অত দূর কেরলে যাবার দরকার কী? জ্যোতির্ময়ী শিকদার—এই তো দেবগ্রামের মেয়ে আমাদের। শোনোনি নাম? তাহলে কত? সামান্য জিনিস নিয়ে খেলা যায় বললাম তো। একটা ছোট খোলামকুচি!

হাসছ তোমরা? আরে, এই খেলাটা খেলতে খেলতেই তো গাছ থেকে নেমে এসে মুঙ্গেরি আমাকে শেখাল ঝিনচ্যাকচুকুচুকু খেলাটা।

—ঝিনচ্যাকচুকুচুকু।

— হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

— ঝিনচ্যাক?

— চুকুচুকু।

— হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ।

শব্দটা শুনেই এত হাসছ তোমরা? পরে তাহলে কী করবে। হাসি সব ফুরিয়ে যাবে

যে। শোনো বলি। মুঙ্গেরি পড়াশোনা করে সুরোচুয়া বর্ডার পেরিয়ে মাইল দশেক দূরে তুমবনির হাইস্কুলে। থাকে ওখানেই হস্টেলে। এবারেই শিখে এসেছে খেলাটা। কলকাতার ছেলে ওর রুমমেট বুধাদিত্য—ফার্স্ট বয় ক্লাসের—সে শিখিয়েছে ওকে। খেলাটা একটা বাক্য নিয়ে। আর বাক্যটা হল:

'চড়িয়ে তোর গাল লাল করে দেব'

হেসো না। হেসো না। বললাম তো পরে তাহলে কী করবে।

আসল খেলাটা হল, তুমি তোমার পার্টনারকে বলবে:

'চড়িয়ে তোর গাল লাল করে দেব।' সে তো বলতেই পার। এতে আর খেলা কী? কিন্তু তোমাকে বলতে হবে প্রত্যেকটি শব্দের পর 'ঝিনচ্যাক' আর 'চুকুচুকু' শব্দ দুটো লাগিয়ে। কেসটা তাহলে এইরকম দাঁড়াবে:

চড়িয়ে-ঝিনচ্যাক তোর চুকুচুকু গাল-ঝিনচ্যাক লাল-চুকুচুকু করে দেব-ঝিনচ্যাকচুকুচুকু। খেলাটা এইভাবে চলবে।

চলবে? হ্যাঁ, চলতেই থাকবে। কারণ, প্রত্যেক খেলোয়াড়কে কণ্ঠস্বর ও অভিনয়ে নানান অভিব্যক্তি দিয়ে কথাটা নানাভাবে বলতে হবে। যেমন—

গভীর দুঃখের সঙ্গে 'তোর গাল ঝিনচ্যাক' থেকে সবটা।

ভীষণ রাগ করে 'তোর গাল ঝিনচ্যাক' থেকে সবটা

আহ্লাদে অষ্টখণ্ড হয়ে : তোর গাল ঝিনচ্যাক থেকে সবটা।

তখন গোটা ব্যাপারটা টেনিদার ভাষায় হিল্লারিয়াস এ লা গ্রাণ্ডি হয়ে দাঁড়াবে নাকি?

শারদীয় খেলা, ২০০৩

গ্র ন্থ প রি চি তি

১.

পঞ্চাশটি গল্প। প্রথম প্রকাশ—বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৩। প্রকাশক—প্রিয়ব্রত দেব। প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। ৭, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-১৩। প্রচ্ছদ-যোগেন চৌধুরী। উৎসর্গ-'অশোক দাশগুপ্ত/আমাদের সম্পাদক'। মূল্য-৭৫টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৫৬। ভূমিকায় ১৯৬২ সালে লেখা 'সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (কৃত্তিবাস, ১৫ সংখ্যা) পুনর্মুদ্রিত। (পরিশিষ্ট-এ ছাপা হল)

সংকলিত গল্পগুলি ক্রমানুসারে—'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী', 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য', 'হ্যাঁ, প্রিয়তমা', 'সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' সংকলন থেকে অবর্জিতভাবে গৃহীত। তাছাড়া 'হিরোসিমা, মাই লাভ ও অন্যান্য' থেকে দুটি গল্প—'জুপিটার ও থেটিস' এবং 'শেষ মেট্রো'। আর 'চারজন টারজন' মিনিবুক-১১, ১৯৮০-তে প্রকাশিত 'ছেলেটা' শিরোনামে একটি রচনা, যেটি মিনিবুকে ছাপা হয়েছিল যোগেন চৌধুরীর ড্রইং-সহ 'এটি একটি সাক্ষাৎকার' পরিচয়ে; সেটি অপরিবর্তিতভাবে 'পঞ্চাশটি গল্প' সংকলনভুক্ত হয়েছে। তাছাড়া অগ্রন্থায়িত গল্প—কালিম্পঙের স্মৃতি, স্মৃতি, শূকরনন্দিনী, কথা বলো...., বাসাবদল, বেঁটে লোকের ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে: এর মানে সূর্যাস্ত আসন্ন, ইতিহাসের ধারা, যখন সবাই ছিল গর্ভবতী, জাগো, মসৃণ ত্বক, আমার বন্ধু পুলকেশ, ফুটবল খেলার শব্দ, সেইসব আত্মহত্যা, ভাল মানুষদের জন্য ধ্বংসধ্বনি। দুটি থ্রিলার—আইভি সোম হত্যামামলা (১৯৭৮): একটি পোস্টমর্টেম, আঁধার রাতের কল্লোল। দুটি ছোটদের গল্প—সে আসে, অন্ধস্কুলে ঘন্টা বাজবে কখন।

সন্দীপনের লেখা এমন কিছু কিছু গল্প আছে যা ওঁর সমগ্র ভাবনাবিন্দুর পরিচয় বহন করে। সেই গল্পের বক্তব্য হয়ে যায় গূঢ় অর্থবহ। খানিকটা প্রতীকী সেইসব লেখাগুলো সাধারণত ছোট আকৃতির আর আপাত সারল্যের মোড়কে ঢাকা। অনেক সময় তা 'ছোটদের গল্প' হিসাবে পরিচিত; যেমন 'অন্ধস্কুলে ঘণ্টা বাজবে কখন'। অনেকেই এই গল্পটার আলোচনা করেন; সন্দীপনও নানাভাবে ইঙ্গিত করেন এই গল্পের গূঢ় অর্থের দিকে। কিন্তু প্রথম প্রকাশের পরিকল্পনায় আদৌ এটা ছোটদের গল্প ছিল না। ১৩৯৭ (১৯৯০) বঙ্গাব্দের শারদীয় 'দর্পণ' পত্রিকায় অত্যন্ত সিরিয়াসভাবে লেখালিখির বাস্তবতাবোধ ও লেখকের সংযোগ-সাধন নিয়ে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক অবস্থাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন তিনি। তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ তুলে একটা নিবন্ধধর্মী ভূমিকা করেছিলেন। তারই অন্তর্গত ছিল ইঁদুর-বেড়ালের গল্পটা। শেষে পৌঁছে প্রথমাংশের সঙ্গে একটা বৃত্তায়নও ঘটানো হয়েছে। গ্রন্থভুক্ত হওয়ার সময় সেই প্রথম ও শেষাংশ বাদ দিয়ে একটা ছোটদের লেখা হয়ে যায় বড়দের গল্পটা। সন্দীপনের লেখালিখির এই নানা ধরনের সম্পাদনা বা অদল-বদল সব সময় চলে, চলতেই থাকে। সুযোগ পেলেই পুনর্মুদ্রণের আগে একটু রূপ বদলে দেওয়ার এই ঝোঁক লেখাকে কতটা বদলে দিতে পারে, তারই একটা নমুনা হিসাবে শারদীয় 'দর্পণ'-এ প্রকাশিত পুরনো লেখাটা সম্পূর্ণ ছেপে দেওয়া হল। তখন নাম ছিল 'অন্ধস্কুলে কখন ঘণ্টা বাজবে' আর 'পঞ্চাশটি গল্প'-এ নাম বদলে হল 'অন্ধস্কুলে ঘণ্টা বাজবে কখন'। কীভাবে এই রূপান্তরটা ঘটে তার পরিচয় খানিকটা মিলবে দুটো মিলিয়ে পড়লে।

তখন ছাত্র। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আচ্ছা মাঝিদের সঙ্গে আপনি বহুরাত পদ্মায় কাটিয়েছেন, তাই না?'

'রাতে?' উনি শুনে অবাক, 'আমি দিনেও কখনো ঘুরিনি।'

'আপনি ওদের চিনতেন না?'

বরানগরে ওঁর গোপাললাল ঠাকুর রোডের বসার-কাম-লেখার ঘরে বসে মানিকবাবু আমাকে বলেছিলেন, 'ঐ দু-একবার ওদের সঙ্গে বিড়িটিড়ি টেনেছিলাম আর কী।'

'ডাঙ্গায়?'

'না তো কী।' উনি হেসে বলেছিলেন 'নদীতে?'

এখন এই গল্প যদি সত্য হয় (বজ্রাঘাত হোক আমার মাথায় যদি অক্ষরে অক্ষরে না বলে থাকি) তাহলে এ থেকে আমরা কী বুঝব? মানিকবাবু আমাকে শিশুজ্ঞানে বোকা বানিয়েছিলেন এমন সম্ভাবনা নেই। কারণ, উনি যে পদ্মানদীর মাঝিদের সঙ্গে বিস্তর ওঠাবোস করেছিলেন হেন তথ্য কোথাও পাওয়া যায় না। বরং সমরেশ বসু তাই করেছিলেন। বহুদিন ছিলেন গঙ্গার মোহনায়।

যারা প্রতিভাবান লেখক তাদের পক্ষে ওভাবে 'পদ্মানদীর মাঝি' সম্ভব হয়। সূর্য যেন। প্রথমে দেখা দেয় অরুণোদয়ের আলো। তারপর একটু একটু করে কাহিনি ফুটে ওঠে। চরিত্রগুলি একে একে দেখা দেয়। বেলা যত বাড়ে তাদের ছায়া তত লম্বা হয়। এর ছায়া গিয়ে ছোঁয় ওকে। যেন বৃক্ষ; পাতাগুলো এ ওর আলো, ও এর ছায়া মেখে কেমন ল্যাজে গোবরে।

'পদ্মানদীর মাঝি' এমনই এক সূর্য-স্নাত রচনা। কুবের এমনই এক সৌরসসন্তান, যদিও কৌন্তেয়। এখানে লেখক হচ্ছে সূর্য। কুমারী কুন্তি সে জবাকুসুম সঙ্কাশে এসে ধর্মাধর্ম হারায় ও সন্তান ধারণ করে।

মানিকবাবুরা, যাঁরা প্রতিভাবান, তাঁরা পারেন। সমরেশ বসু পারেন না। মাস কয়েক মোহনার মাঝির সঙ্গে নৌকাবিহার করে এসে প্রভূত গর্ভযন্ত্রণার পর তাই পর্বত করলেন মূষিক প্রসব : গঙ্গা। কোথা পদ্মানদীর মাঝি আর কোথা গঙ্গা। কোথা চাঁদ, কোথা চাঁদমালা!

আবার ধরুণ আমিও একজন লেখক। আমিও লিখছি। না-পদ্মা, না-মোহনা, না-গঙ্গা-কিছুই আমাকে টানে না। মানিকবাবুর মতো জানি না। মাঝি-মল্লা দূরস্থান, অফিস-আড্ডায় বহুদিনের চেনা মানুষ, এমন কি ভাই-ব্রাদার, জন্মসূত্রে যারা আত্মীয়—কতনা বকবকম করেছি যাদের সঙ্গে—শ্মশানে ও বিবাহে গেছি যাদের কারণে—এমন কি অন্নপ্রাশনে—ভোরে আগে জেগে উঠে ঘুমন্ত যে শয্যাসঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞবোধ করেছি এ কারণে যে যাক, সারারাত তাহলে একা ঘুমুইনি—এদের কারুকে লেখার চরিত্র করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ আমি এদের জানি না। তাই চিনি না। আমি না-মানিক। না-সমরেশ।

আমার গল্প একটাই। আর সেটা নিয়েই আমি সব গল্প লিখি, যদিও সেই মূল গল্পটি নেহাৎই শিশুপাঠ্য।

এক যে ছিল ইঁদুর। আর এক ছিল হুলো। ইয়া লম্বা তার ফুলো লোমের ল্যাজ। হুলো তখন দিবানিদ্রা দিচ্ছে; নিদ্রিত তার ফুটপাত জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিশাল লোমবহুল ল্যাজও, যখন দুপুরবেলা ইঁদুর গিয়ে তাকে জাগায়।

বেড়াল ঃ কী ব্যাপার?

ইদুঁর ঃ তুমি আমাকে খাও।

বেড়াল (চোখ বুজে) ঃ আজ আমি যথেষ্ট খেয়েছি।

ইঁদুর ঃ কিন্তু আমি তোমার কাছে এসেছি।

বেড়াল ঃ বললাম তো আমার খিদে নেই।

ইঁদুর ঃ কিন্তু আমাকে খাওয়া তোমার কাজ। বা কর্তব্য।

বেড়াল ঃ তুমি পরে এসো।

ইঁদুর ঃ বেশ। নাহয় পরে খাবে। এখন, অন্তত মেরে রাখো।

বেড়াল ঃ (বিরক্তমুখে) ঃ আচ্ছা। তুমি মুণ্ডুটা আমার মুখের মধ্যে রাখো। আমি একসময় খেয়ে নেব'খন।

ইঁদুর তাই করল। বেড়াল হাঁ করে ফের ঘুমিয়ে পড়ে।

ইঁদুর অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করে।

তারপর একসময় আর পারে না। বিড়ালের নাকে ন্যাজ ঢুকিয়ে তাকে জাগাতে বাধ্য হয়।

বেড়াল ঃ কী হল?

ইঁদুর ঃ কই। কখন খাবে?

বেড়াল ঃ আঃ! দেখছ না, আমি ল্যাজটা ফুটপাতে বিছিয়ে রেখেছি। কেউ মাড়াবে তবে না খ্যাঁক করে তোমাকে দেব এক কামড়!

ইঁদুর ঃ কত লোক তো রাস্তা দিয়ে গেল। কেউ তো মাড়াল না!

বেড়াল ঃ দেখা যাক না। কেউ মাড়ায় কিনা!

ইঁদুর (বেড়ালের মুখের মধ্যে বসে চিঁ চিঁ করে) ঃ সব্বাই ল্যাজটা ডিঙিয়ে যাচ্ছে। একের পর এক।

বেড়াল ঃ আরে অত অধৈর্য হও কেন? কেউ মাড়ায় কিনা দেখাই যাক না। নইলে, ইস্কুলের ঘণ্টা তো বাজল বলে।

ইঁদুর ঃ ইস্কুলে?

বেড়াল ঃ আ-হ্যাঁ, ইস্কুল! ঐ যে দূরে মস্ত বাউন্ডারিওলা বাড়িটা দেখছ, ওটাই ব্রাইন্ড ইস্কুল। সাড়ে চারটেয় স্কুলের ঘণ্টা পড়বে। হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়বে অন্ধ ছেলেমেয়েরা। ওদের কেউ না কেউ ঠিক মাড়িয়ে দেবে'খন। তুমি ততক্ষণ ধৈর্য ধরো।

এত বলে বেড়াল ফের হাঁ করে ঘুমিয়ে পড়ল।

না পদ্মা। না মেঘনা। না গঙ্গা। না মানিক। না সমরেশ।

আমাদের প্রবাহ নেই। আমরা রয়েছি মহাদেবের জটায়।

আজও সেখানে থেকে গেছি।

জটার বাধন খুলবে কবে?

অন্ধস্কুলে ঘণ্টা বাজবে কখন?

১৯৯৫ সালের বঙ্কিম পুরস্কার পাওয়া এবং এই প্রথম এতবড় গল্পসংকলন বলেই বোধহয় সর্বাধিক লিখিতভাবে আলোচিত হয়েছে এই বইটি। ছোট-বড় নানা পত্রপত্রিকায়, সংকলনে এই বইটিকে ঘিরেই সন্দীপন-চর্চা নতুনভাবে নানা মাত্রা লাভ করেছে। নুমনা রূপে দুটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত দুজন বিশিষ্ট আলোচকের রচনার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করে দুধরনের পাঠ-অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত বুঝে নেওয়া যেতে পারে—

(১) 'সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের একটি স্বতন্ত্র এবং অনমনীয় চরিত্র আছে, মানিয়ে চলবার প্রবণতা নেই সব শ্রেণীর পাঠকের সঙ্গে। তাঁর 'পঞ্চাশটি গল্প'-এর

সংকলন হাতে নিয়ে একথাই প্রথমে মনে হল। খুবই শৈলীনির্ভর তাঁর রচনা। শব্দসজ্জা, নানাবিধ প্রাসঙ্গিক উল্লেখ, উপমা-চিত্রকল্পের বিন্যাস, যে-কোন উপলব্ধির এক মানবিক, কাব্যময়, চিত্ত-চমৎকারী অভিব্যক্তি দান তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য কিন্তু তাঁর গল্প ঘটনা-নির্ভর নয়। লেখকের ভাষাটি বর্জন করলে তাঁর অনুভূতি সহজে সঞ্চারিত হবে না পাঠকের মনে।' *(সুমিতা চক্রবর্তী, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪)*

(২) 'অ্যাডাল্টদের জন্য এসব গল্প, শৌখিন লোকেদের কাছে দুঃসহ, দুর্গন্ধ মনে হবে— আর যাঁদের জগতে 'যতবার আলো জ্বালাতে চাই/নিভে যায় বারে বারে', যাঁদের জগতে গভীর অন্ধকারে কারও আসনই পাতা থাকে না, যাকে সাহিত্যের ইতিহাসে পোস্ট-মডার্নিস্ট আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাঁরা অবশ্যই সন্দীপনের লেখা খুঁজে পড়বেন। খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অকস্মাৎ বিস্ফোরণ তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য, যে জন্য গড়গড় করে পড়ে ফেলার জন্য তাঁর লেখা না, পঁচিশ বছরের পুরনো লেখা, আগে-পড়া লেখাও, আবার পড়লে নতুন লাগে, সত্য মনে হয় খণ্ড খণ্ড ছবি, অখণ্ড ছবি গড়ে তোলার কোনও চেষ্টা নেই, যে জন্য তাঁর লেখা প্রথম থেকে, মাঝ থেকে, শেষ থেকে পড়া যায়, ক্লান্তি আসে না। পঁচিশ বছর ধরে লিখে সন্দীপন অন্তত এটা বলতেই পারেন, তিনি অনন্য— এই ধরনের লেখা বাংলায় বেশি লেখা হয়নি। কোনারক থেকে যে করতালের শব্দ ভেসে আসে, সেটা জীবনের নয়, মৃত্যুর। সে শব্দ সবার কাছে পৌঁছয় না, কেননা, সন্দীপনেরই ভাষায়, 'কানের বদলে আমাদের মাথায় দু-পাশে খন্ডৎ-ত'।' *(নিত্যপ্রিয় ঘোষ, আজকাল, ২০ এপ্রিল ১৯৯৩)*

পত্রপত্রিকার আলোচনাগুলোতে যে কটা বিষয় অধিকাংশ সময় আলোচিত হয়, কখনও সমালোচিত হয়, তার মধ্যে একটা—যৌনতা। একজন লেখককে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেওয়ার মত এটা একটা বিষয় বলে ভাবেন অনেকে। ভাবেন, আমবাগানের কথা থাকবে কিন্তু রামবাগান নয়, সোনারপুর থাকবে সোনাগাছি নয়। যৌনতার হাত ধরে আধুনিকতাকে চেনা, আধুনিক মানুষের যৌনচেতনার মধ্যে দিয়ে পাঁচ দশকের মধ্যবিত্ত বাঙালিকে পড়ে নেওয়ার যে আয়োজন—স্বপ্ন ও অবচেতনের উল্লেখযোগ্য উত্তরাধিকার; সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকাটাই অনেক আলোচকের আদর্শ। 'পঞ্চাশটি গল্প' আলোচনা করতে গিয়ে উদয় ভাদুড়ি লেখেন :

'সন্দীপনের গল্পের চরিত্রগুলির দৈনন্দিনতার যৌনচেতনার, এমনকি যৌনক্রীড়ার একটি বিশিষ্ট জায়গা আছে—রীতিমত সোচ্চার ও গুরুত্বপূর্ণ। স্ত্রী, নিকট আত্মীয়া, বাড়ির ঝি কিংবা বেশ্যা, যাই হোক—কেন্দ্রীয় বা পার্শ্বচরিত্রের (পুং-স্ত্রী নির্বিশেষে) ভাষা নির্ভেজাল, সাবলীল শরীরিভাষা। এখানে যৌনতাও, কোথাও কোথাও পারভারশনের মাত্রা ছুঁয়ে থাকে।' *(অনুষ্টুপ, গ্রীষ্ম সংখ্যা ১৯৯৩)*

এ সম্পর্কে কী মনে করেন সন্দীপন?

উত্তর : সেক্স আবার কী! এটাকে আলাদা করে লোকে কেন যে উল্লেখ করে জানি না। খাবার-দাবারের কথা বলে না, ঘুমের কথা বলে না, বাতকর্মের কথা বলে না— কেবল এটাই বলাবলি হয়। এটাকে একমাত্র গুরুত্ব দিতে পারে মেয়েরা—যে, তুমি আমার শরীরের ভেতর ছ ইঞ্চি ঢুকে যাচ্ছো, সুতরাং আমার এ নিয়ে কথাবার্তা আছে—তারা এটা বলতেই পারে কিন্তু বাকি লোকদের এতে এত কী কনসার্ন হওয়ার আছে আমি তো বুঝি না। তাছাড়া আমার লেখায় সেক্স থাকে না, সেক্স অ্যাক্টের কোনো বর্ণনা কোথাও নেই। আমার লেখা মূলত সেনজুয়াল।

প্রশ্ন : এখানেই তো সেক্সচুয়াল হয়ে গেল।

উত্তর : তা বলতে পারো। আমি ধর্মচর্চা করি না, করলে সেখানেও যৌনতা থাকত। যৌনতা তো একটা উৎসব। জীবনের সেরা আনন্দই যৌনতা। এখানে শারীরিকতা একটা উপলক্ষ্য মাত্র। কামনাগুলো যেখান থেকে আসে, সেটা তো মন। যৌনতার আগে পুরুষের লিঙ্গোত্থান হয় এবং নারীর নিপ্‌ল শক্ত হয়ে ওঠে— তা, এগুলো তো আসল ব্যাপার না। আসল হল, যে ডিজায়ারগুলো শক্ত করার সেটা মেরে ফেলা কি উচিত হবে? জাপানে নাকি বেশ্যারা বলে, 'ডু ইউ ডিজায়ার মি?' শরীর মাধ্যম হতে পারে কিন্তু ডিজায়ারই আসল। আমি সেই কথাই লিখি।

(জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে দুটো একটা কথা যা আমরা জানি
সম্পাদনা : অদ্রীশ বিশ্বাস, প্রবীর চক্রবর্তী, ১৯৯৬)

প্রসঙ্গটিকে মেয়েদের জায়গা থেকে দেখেছেন সুমিতা চক্রবর্তী এবং পূর্বোক্ত আনন্দবাজারের সমালোচনায় লিখেছেন :

'নারী সম্পর্কে লেখকের মনোভাবটিও আজ কিছু প্রশ্ন জাগায়। দুটি পৃথক সম্প্রদায় বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে নারী ও পুরুষ। শরীর-লক্ষণে যে নারী—সে মননশীলতায় পিছিয়ে থাকে, সূক্ষ্ম ও মননী অতৃপ্তিবোধের সন্ধান পায়নি কখনো—এমনই যেন লেখকের বিশ্বাস। নারীদেহ-বর্ণনায় বহু লেখককেই, ইচ্ছায় অথবা অজ্ঞাতে বাড়তি রঙে কলম রাঙিয়ে নিতে দেখা যায়। সন্দীপন তার ব্যতিক্রম নন। অনুমান করি, সচেতন ইচ্ছাতেই।'

সন্দীপন : এটাকে যদি একটা অভিযোগ বলা হয়, তবে আমি মানছি এটা একটা খাঁটি অভিযোগ। আমি তাদের কাছ থেকে খুব বেশি কিছু আশা করি না, ইন্টেলেকচুয়ালি। মেয়েরা যদি ভালভাবে যৌনতা দিতে পারে, আমার মনে হয় সেটাই তাদের ইন্টালেক্টের কাছে শ্রেষ্ঠ অবদান। ওই শরীর-সর্বস্বতা ইন্টালেক্টদের ভীষণ দরকার। জেমস জয়েসের স্ত্রীকে লেখা প্রেমপত্র পড়লে বোঝা যায়—সহধর্মিনী মোটেই নন।

(জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার)

সুবীর রায়চৌধুরী সন্দীপনের লেখার এই অ-বিশুদ্ধ 'হৃদয়' সম্পর্কের দিকটিকে আলোচনা করতে গিয়ে একজন নাগরিক লেখকের বেঁচে থাকার খেলা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। টিকে থাকার রণকৌশলে সেই 'খেলা' হয়ে ওঠে নর-নারীর প্রেম ও যৌনতা বিষয়ে টিকে থাকার শক্তি-ক্ষমতা-রাজনীতির তত্ত্ব। 'অপ্রতিরোধ্য সন্দীপন' শিরোনামক সেই লেখায় সুবীর রায়চৌধুরী লিখেছেন :

'তিনি লেখার সময়ে বোধহয় হৃদয় নামক বস্তুটিকে পকেটে পুরে রাখেন। প্রেম অথবা যে কোনো মানবিক সম্পর্কই তার কাছে আসলে শিকার-শিকারির্ খেলা। এখানে ভাল বা মন্দ মানুষের প্রশ্নই ওঠে না। রাজনৈতিক কর্মী, লেখক, শিল্পী, ঠিকেদার-বড়োবাবু, মদের আসরের বন্ধু-বান্ধব, ছা-পোষা গেরস্ত, আত্মীয়স্বজন—সবাই ধান্দাবাজ, যে যার খেলা খেলছে।'

(সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে দুটো একটা কথা যা আমরা জানি)

২.

কুষ্ঠ রোগিণীর জন্য চুম্বন (মিনিবুক)। প্রথম প্রকাশ—বইমেলা ১৯৯৪। প্রকাশক—

প্রতাপকুমার রায়। আজকাল পাবলিশার্স লিমিটেড। ৯৬,রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা-৯। প্রচ্ছদ—দেবব্রত ঘোষ। উৎসর্গ—'দেবব্রত ঘোষ-কে/'ম সমব্রাব ম ফ্রের''। মূল্য—আলাদাভাবে উল্লেখ ছিল না, একগুচ্ছ মিনিবুকের সঙ্গে বেরিয়েছিল।

সংকলিত দুটি গল্পের প্রথম গল্প—কুষ্ঠ রোগিণীর জন্য চুম্বন। গল্পটি সামান্য অদল-বদল করে আগে দুবার ছাপা হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন নামে—(১) রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন ও বা-লে বিলোচন (পদাবলী, ৪বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৯৮৯), (২) সমুদ্রপাখির ডাক (শরাদীয় বসুমতী, ১৯৯২)। মিনিবুকের [illegible] গল্প—আমি, এখন। বইমেলা ১৯৭৯ সালে এই গল্পটি সমর তালুকদার গৃহীত সাক্ষাৎকার রূপে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল—'এখন আমার কোনো চশমা নেই'। তখন মিনিবুক আকৃতিতে বের হয়। প্রকাশক—সমর তালুকদার, জার্নাল শহর, ডি-এ ১৭৪ সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৬৪। প্রচ্ছদ—পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৩। মূল্য-৭০ পয়সা। 'আমি, এখন' ছাপা হয়—আজকাল, ১৫ অক্টোবর ১৯৯৩, সেটা ছিল 'মহালয়া ১৪০০' সাপ্লিমেন্টারির অন্তর্গত।

৩.

আমার বন্ধু পিনাকী (মিনিবুক)। প্রথম প্রকাশ—বইমেলা ১৯৯৫। প্রকাশক—প্রতাপকুমার রায়। আজকাল পাবলিশার্স লিমিটেড। ৯৬, রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা-৯। প্রচ্ছদ—দেবব্রত ঘোষ। অলঙ্করণ—তাপস সরকার। উৎসর্গ—'বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়/কবিবরেষু'। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩২। দাম আলাদাভাবে উল্লেখ নেই, একগুচ্ছ মিনিবুকের সঙ্গে বেরিয়েছিল।

সংকলিত গল্পগুলি ক্রমানুসারে—আমার বন্ধু পিনাকী, জীবন: একজন ব্যবহারকারীর বিবরণ, আমি, এখন, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।

৪.

সোনালি ডানার ঈগল (মিনিবুক)। প্রথম প্রকাশ—বইমেলা ১৯৯৬। প্রকাশক—প্রতাপকুমার রায়। আজকাল পাবলিশার্স লিমিটেড। ৯৬, রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা-৯। প্রচ্ছদ—দেব্রবত ঘোষ। উৎসর্গ—'অশেষ গুণাধার/একরাম আলি [illegible]ক'। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩২। দাম আলাদাভাবে উল্লেখ নেই, একগুচ্ছ মিনিবুকের সঙ্গে বেরিয়েছিল।

বইমেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'আজকাল' পত্রিকার 'আজকের বই' শিরোনামে একটি আলোচনায় জ্যোতির্ময় দত্ত লিখেছেন, 'সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে আমরা এতকাল ঠাট্টা করে বলতুম, তিনি বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট ফরাসি লেখেন। 'হিরোসিমা, মাই লাভ' পড়ে মনে হয়েছিল তিনি বাংলাভাষায় প্রথম আন্তর্জাতিক উপন্যাস লিখেছেন। এবার 'সোনালি ডানার ঈগল' পড়ে মনে হল অবশিষ্ট আন্তর্জাতিক গল্পটিও লিখে ফেলেছেন।' *(সোনালি ডানার সন্দীপন, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬)*

বহু আলোচিত, প্রশংসিত এই গল্পটির উল্লেখযোগ্যতার কারণ যে 'আন্তর্জাতিক' শিরোপার মুকুট, তার মনস্তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত রয়েছে হয়তো গল্পের বিদেশি-ঘেঁষা কাহিনি। বলা ভাল অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রেক্ষাপট। কেউ কেউ একে বিদেশি কাহিনি অনুসারিও ভেবেছেন। আদতে এ কাহিনি পুরোপুরি ভারতীয় এবং সন্দীপনের নিজের অভিজ্ঞতা প্রসূত।

প্রশ্ন : কীভাবে পেয়েছিলেন সোনালি ডানার ঈগলের কাহিনি?

উত্তর : গোপালপুর বেড়াতে গিয়েছিলাম সপরিবারে। সঙ্গে আরো বন্ধু-বান্ধব ছিল।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে সত্যিই ওরকম একটা অদ্ভুত আলো-জ্বলা, পুরনো, থম্‌থমে, রহস্যময় বাড়ি দেখতে পেলাম। আমি শুনেছিলাম গোপালপুরের একটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। সেসব আর কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা খোঁজ করতেই স্থানীয় লোকরা আমাকে ওই বাড়িটায় যাওয়ার কথা বলে। আমি সঙ্গীদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে, একটু আসছি, বলে বাড়ির ভেতর ঢুকে যাই। রিচার্ড জেমস স্মিথ নামে যে বৃদ্ধের কথা লিখেছি, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। এক সময় থাইরয়েড সারানোর জন্য উনি সমুদ্রতীরে লোনা বাতাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এই বাড়িটা কিনেছিলেন। তারপর আর ফিরে যাননি। সঙ্গী দুই পরিচারিকা নিয়ে একটা ঘরে শুয়ে থাকেন। মেয়ে বিদেশে থাকে। পাশের ঘরটা মেয়ের জন্য সাজানো, যদি কোনোদিন বিদেশ থেকে আসে এই আশায়। সেই ঘরটা বাদে বাকি ঘর টুরিস্টদের ভাড়া দেওয়া হয়। সেখানেই আমি একটা স্টাফ্‌ড বার্ড দেখি—ঠিক ঈগল নয়, অন্য কিছু। আমি সেটাকে ঈগল বানাই। তখন কেন্ট গার্ডনারের গোল্ডেন ঈগল নিয়ে লেখা বইটা এনে পড়ে নিই।

প্রশ্ন : গল্পে যা ঘটেছে, সেই অবিশ্বাস্য অ্যাংলো ইন্ডিয়ান-ভারতবর্ষকে ঘরের ভেতর দেখতে পেয়েছেন আপনি?

উত্তর : প্রায় সবটাই। দু দিন গিয়েছিলাম। গোটা পরিবারের গল্পটা হুবহু শোনা ওই জেমস স্মিথের মুখেই। কোথায় যে কল্পনা ঢুকেছে আর সত্যের সঙ্গে গলা জড়িয়ে বসে গেছে, সেটা ঠিকঠাক আমিও জানি না। তবে তা অতি সামান্যই, যতটুকু করতে পারেন একজন লেখক।

(অপ্রকাশিত ব্যক্তিগত আলাপচারিতা থেকে, মার্চ ২০০৫)

৫.

এক যে ছিল দেওয়াল। প্রথম প্রকাশ—বইমেলা ১৯৯৭। প্রকাশক—প্রচেতা ঘোষ তাপস ঘোষ। অপ্রকাশ, আসানসোল পুস্তকালয়, রাহা লেন, আসানসোল-৭১৩৩০১। প্রচ্ছদ—প্রকাশ কর্মকার। রচনাকাল—নাম-রচনা ছাড়া সব লেখাই ১৯৭০ থেকে ৭২-এ। উৎসর্গ—'যতদিন জীবন/ততদিন দীপক/(মজুমদার)'। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩২। দাম-১০টাকা।

ভূমিকায় লেখা : 'বোবাযুদ্ধ পত্রিকার লালা (প্রচেতা) এবং তাপস এসে বলল, আমরা এবার বইমেলায় একটা বই বের করব যাতে থাকবে লেখকদের সেইসব লেখা যা কেউ ছাপাতে চায়নি, তাই প্রকাশিত হয়নি। আপনার কি আছে এমন কোনো লেখা?

'বেশ কয়েকটা লেখা আছে যদিও, যা সম্পর্কহানির ভয়ে ছাপাইনি। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত লেখা? হ্যাঁ মনে পড়ল একজনের কথা : এক যে ছিল দেওয়াল। চারবার চারটি পত্রিকা ফেরত দিয়েছে। একজন সম্পাদক, চার পাতার ভর্ৎসনাসহ।

'তাকে সমর্থন করতে চারধারে জড়ো হল আরও কিছু লেখা—লেখা না খেলা তা অবশ্য কোনোদিন জানি না। আমি তো বরাবরই 'তুমি কেন লেখো' এর উত্তরে একটা কথাই বলে গেছি : ইন অর্ডার টু পাস টাইম।

'১৯৭০-৭২। ছোটবেলার ডাক্তার-ডাক্তার খেলার মত—যখন, যত্রতত্র স্টেথিস্কোপ। নিষ্পাপ পাপ। সেইসব।

'শুধু, 'এক যে ছিল দেওয়াল' ১৯৯৫-এ।'

শেষ মলাটে লাল রঙে ছাপা—'এক যে ছিল দেওয়াল। বরানগর, ১৯৭০-৭২। যখন রাস্তার মোড়ে মোড়ে নেকড়ে। লাশের গা থেকে ধূপের সুরভি। এসব তখনকার লেখা। ধুলো থেকে এসেছিল। এরা এখন ধুলোতেই ফিরে যাচ্ছে।—সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়'

সব মিলে চোদ্দটা গদ্য-পদ্য-পোস্টার-অনুবাদ কবিতা। কিন্তু বইটার ইংরাজি পরিচয়ে লেখা হয়েছে 'Collection of stories'। 'এক যে ছিল দেওয়াল' আলাদাভাবে ছাপা হয় ১৯৯৭ সালের বইমেলা সংখ্যা 'বোবাযুদ্ধ' পত্রিকায়।

৬.

সোনালি ডানার ঈগল (গল্প একাদশ)। প্রথম প্রকাশ—বইমেলা ১৯৯৮। প্রকাশক—মানবেন্দ্রনাথ পাত্র। কথা ও কাহিনী (বুক সেলার্স) প্রাঃ লিঃ। ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩। প্রচ্ছদ-হিরণ মিত্র। উৎসর্গ—'গদ্য এবং পদ্যকার/জীবনানন্দ দাশ/কৈফিয়ত শুধু এই একজনের কাছে'। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮৬। দাম-৩০ টাকা।

সংকলিত গল্পগুলি ক্রমানুসারে—আমার বন্ধু পিনাকী, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, জীবন: একজন ব্যবহারকারীর বিবরণ, আমি, এখন, এখানে সকলে একপ্রকার কুশলে আছি, একটি মৃত্যু সম্পর্কে পূর্ব ঘোষণা, প্রেতিনীর হাসি, রবীন্দ্রনাথ ও রেনোয়া, এক যে ছিল দেওয়াল, ভারতবর্ষ, সোনালি ডানার ঈগল।

সূচনাপত্রে লেখা—'এই ১১টি গল্প গত ২ বছরে লেখা (১৯৯৬-৯৭)। এরা আমার আর কোনও বইতে নেই। পাঠকের কাছে সম্মান না পেলেও এদের কোনও অসম্মান হবে না। ধুলো থেকে এরা এসেছিল। ধুলোতেই ফিরে যাবে এবং অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে।—লেখক।'

এই বইটির উদ্বোধন ঘটেছিল ১৯৯৮ বইমেলার মঞ্চে। উদ্বোধনকারী শঙ্খ ঘোষ উদ্বোধনী-ভাষণে সূচনাপত্রের লেখাটি পাঠ করেন এবং জানান, যা বলার এখানেই সব বলা আছে। দীর্ঘদিন বাদে আয়োজন করা সন্দীপনের বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উৎসাহ ছিল প্রবল। সে কথাই জানিয়েছেন 'আজকাল'-এর বইমেলা সংবাদদাতা, 'ভীড়ের মধ্যে থেকে চিনে নেওয়া যায় ওই লম্বা চশমাআটা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে, যিনি একদা ঘন্টা বাজিয়ে পত্রিকা বিক্রি করেছেন। এবার আলোকিত মঞ্চে প্রবল ভীড়ে সন্দীপন-অনুরাগীদের দু পাশে নিয়ে নতুন বই উদ্বোধন করলেন। কান পেতে যা শোনা যায় তার সব সত্য নয়, কিছু সত্য আড়ালে থেকে যায়। যেমন, এবার, এই বই উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আড়াল থেকে শোনা গেল আবার ঘন্টাধ্বনি, সেই তরুণ তুর্কী সন্দীপনের। বোঝা গেল, গল্প একাদশের কৃশ বইটির মধ্যে দিয়ে তাবৎ আকর্ষণ টেনে নিয়ে গেলেন গতকাল। তারপর আর কোনও অনুষ্ঠান জমেনি।' *(আজকাল, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮)*

চারদিন বাদে ওই একই পত্রিকায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় 'এবারের বইমেলা' প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'সন্দীপন বাংলা ভাষায় একটা আশ্চর্য বিদেশী গল্প লিখেছেন। সেটার নাম 'সোনালি ডানার ঈগল'। বিদেশী গল্প কেন বলছি, বলা উচিত আশ্চর্য গল্প! বহুদিন বাদে ওঁর এমন কলার-তোলা লেখা পড়লাম। এরপর আর কী লিখলেন তাতে কিছু আসে-যায় না। অথবা খুবই আসে যায়।' *(আজকাল ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮)*

৭.

'সোনালি ডানার ঈগল'-এর পর এ পর্যন্ত আর কোনো গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

অগ্রন্থায়িত নতুন গল্পের মধ্যে বেশ কিছু ছাপা হয়েছিল প্রথম খণ্ডে, বর্তমান খণ্ডে খুঁজে পাওয়া অবশিষ্ট গল্পগুলো ছাপা হল।

'রিক্তের যাত্রায় জাগো' এবং 'বাস স্টপে তিন মিনিট' সত্তর দশকে লেখা গল্প। বাকি সব গত সাত বছরের রচনা।

পরিশিষ্ট-১

'পঞ্চাশটি গল্প' বইয়ের ভূমিকা

১

সাহিত্যের ইতিহাসে এক-একটা সময় আসে, যখন নতুন সাহিত্যভাষার প্রয়োজন হয়। ইউরোপে এই প্রয়োজন এসেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে সময়ে, তখনই সিম্বলিস্ট আন্দোলনের জন্ম হয়। ওখানে এটাই শেষ বড় আন্দোলন এবং আজ পর্যন্ত সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আন্দোলন, এত বড় যে, পরে নানা কবিসাহিত্যিকের মধ্যে এর প্রকার-ভেদ ঘটলেও, মৌলিকভাবে এর চেয়ে গুরুতর সাহিত্যচিন্তা আর কী হতে পারে, তা ধারণা করা যায় না। অতএব সাহিত্যে আধুনিকতা একশ বছরেরও কিছু বেশি পুরনো ব্যাপার।

তিরিশের যুগে বাঙলা কবিতা সেই কাব্যভাষা পায়, যা রবীন্দ্রনাথের পর নতুন, যখন থেকে তা আধুনিক কবিতা বলে চিহ্নিত হয়। বিশেষত জীবনানন্দ দাশ বাঙলা কাব্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাষায় কবিতা রচনা করেন। আজ আধুনিক কাব্যভাষা ছাড়া, পুরনো কাব্য-ভাষায় কবিতা রচনা করা যায় কি? যায় না বলেই কবিশেখরেরা আর কবিতা লিখতে পারেন না, পদ্য লিখে থাকেন।

'জীবনদেবতা', 'দেবতার গ্রাস' বা 'বিরহানন্দ', ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত....কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে....পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে—এইসব কবিতা অন্য লেখকের নামে আবার ছাপা হচ্ছে, একথা কোনও কবি বা কাব্যপিপাসু আর ভাবতে পারেন না। ন্যারেটিভ কবিতার দিন আর নেই, ওই সবের ভিতর আধুনিক অর্থে কোনও কাব্যমূল্যও আর নেই, কিন্তু 'শেষ বসন্ত'-এর মতো অসামান্য কবিতাও কি আমরা সদ্য প্রকাশিত অবস্থায় দেখতে প্রস্তুত। আশা করি, না। কারণ ওর আধুনিক কাব্যভাষা নেই, ওটা আধুনিক কবিতা নয়। অজর ডক্টর অমুক বা অমর অধ্যাপক তমুকের খারাপ লাগতে পারে, মনে হতে পারে এসব সাক্রিলিজ, (কারণ, রবীন্দ্রনাথ যতদিন জগন্নাথ তাঁরাও ততদিন পাণ্ডা) কিন্তু কথাগুলি সত্য।

কিন্তু সে যাই হোক, যে অর্থে রবীন্দ্রনাথের পর এখন কবিতার অধীশ্বরের মতো এক আধুনিক কাব্যভাষা আছে সেই অর্থে আমাদের পূর্ববর্তী গদ্যসাহিত্যের অর্থাৎ গল্প ও উপন্যাসের—বঙ্কিমচন্দ্রের পর কোনও আধুনিক সাহিত্য-ভাষা আছে কি? তিরিশের যুগের অগ্রজ লেখকরা যাঁরা শারীরিকভাবে বেঁচে আছেন বলেই আজও লিখে যাচ্ছেন; বস্তুত আজ আমরা সকলেই জেনে গেছি মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত এঁরা লিখবেন ও কিছুতেই অন্য কোনও ব্যবসা ধরবেন না—এঁদের কোনও একজনেরও সমগ্র রচনায় আধুনিক সাহিত্যভাষা আছে কি? তিরিশের যুগের বিদ্বান কবিদের জন্য আজ যেমন আধুনিক কবিতা বললেই বুঝতে পারা যায় কী বলা হচ্ছে, আধুনিক গল্প বা আধুনিক উপন্যাস বললে তেমন কিছুই বোঝায় না। কোনও নতুন ট্রেন্ড এখনো গড়ে ওঠেনি। যদিও কাব্যে জীবনানন্দ দাশের মতোই একই সময়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন ভাষায় গল্প-উপন্যাস লিখতে থাকেন। ইউরোপে আধুনিক সাহিত্য শুরু হয়ে যাবার প্রায় একশ বছর পরে বাঙলা সাহিত্যেব গদ্য ও পদ্যে অবশেষে যখন সেই

পুরনো আধুনিকতা এল, ঐতিহ্যবিরোধী ও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দুটি আধুনিক সাহিত্যভাষার লেখক একই সময়ে কাব্য ও গদ্যসাহিত্য রচনা শুরু করলেন—এই আশ্চর্যতম যোগাযোগ সত্ত্বেও দুঃখের বিষয়, সমকালীন অন্যান্য সচেতন কবিদের জন্য কবিতা যেমন তারপর থেকে আধুনিক কবিতা বলে তার পুরনো জাত ও ধর্ম ত্যাগ করল, উল্টো কারণে, অর্থাৎ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারিপাশে শরৎচন্দ্র ভায়া কল্লোলযুগ ধরে এসে ভিড় করে রইল শিল্পচৈতন্যহীন অশিক্ষিত গদ্যলেখকের দল—ইউরোপে আধুনিকতা আসার একশ বছর পরেও বাঙলা গল্প-উপন্যাসের তাই জাত বদল হল না। পঞ্চাশের দশক থেকে ইমাজিনেটিভ সাহিত্যের লক্ষণ আবার দেখা গেল; জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী গল্প লিখলেন, অসীম রায় লিখলেন উপন্যাস। কিন্তু ভিড় করে রইল সেই শিল্প সম্পর্কে অসচেতন লেখকবৃন্দ। সন ১৯৫৯ -এ এক অখ্যাত পত্রিকার পূজা সংখ্যায় কমলকুমার মজুমদার তাঁর 'অন্তর্জলী যাত্রা' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস লেখেন যা আজও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল না[১]—কারণ ভিড় সরে গেল না। তাই আমরা অমুকের কবিতা কি তমুকের কাব্যনাট্য বলি, বললেই বলা হয় ওগুলি আধুনিক কবিতা, অমুকের গল্প বা তমুকের উপন্যাস বললে তাই আধুনিকতার কোনও শিল্পশরীর ফুটে ওঠে না।

২

কখন নতুন সাহিত্যভাষার প্রয়োজন হয় একথা বলা শক্ত, এ সম্পর্কে কোনও ভবিষ্যদ্‌ বাণী করা যায় না, এর বর্তমানকেও নিশ্চিন্তে বা সুপরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। কারণ পাঁজি দেখে কোনও সাহিত্য আন্দোলন শুরু হয় না, একই জাতের লেখকরাও আগে-পরে আসেন। দূর-কাছের বিচিত্র সব কারণ থাকে। যেমন একটা কারণ এই দেখা যায় যে, বিজ্ঞান যখনই মানুষকে ছোট করে দেখাতে চায়, মানুষের ব্যক্তিত্ব তখনই শিল্প-সাহিত্যকে আশ্রয় করে, বলতে চায় যে, মানুষের সবটাই রহস্যময় ও ব্যাখ্যার অতীত। সপ্তদশ শতাব্দীতে মেকানিজম্‌ প্রবল হয়ে ওঠে, পরের শতকে রোমান্টিকরা বিদ্রোহীর ভূমিকা নেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য সময়ে বিজ্ঞান আবার মানুষকে খর্ব করে, এবার আঘাত আসে বায়োলজির দিক থেকে। থিওরি অব্‌ ইভোলিউশন মানুষকে অত্যন্ত সামান্য করে ফেলে। মনস্তত্ত্ব মানুষকে ব্যাখ্যা করে ফেলতে চায়। তখনই এই কথা বলার প্রয়োজন হয় যে, এমন কোনও থিওরি হয় না যা মানুষকে ব্যাখ্যা করতে পারে, এমন কোনও মনস্তত্ত্ব হয় না যা মানুষের মানসিকতার কাছে পরাস্ত না হয়। তখন সিম্বলিস্ট আন্দোলনের জন্ম।

অবশ্য এইসব আবিষ্কার সাহিত্য ও শিল্প-সমালোচকদের, এগুলি এম্‌পিরিকাল সত্য ছাড়া আর কিছু নয়। বস্তুত সাহিত্যের ইতিহাস সমালোচকদেরই সৃষ্টি, এক-একটি যুগের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য দিনক্ষণ দেখে এক-একটি লেখকগোষ্ঠী আর্বিভূত হন না, অনেক সময়, খুব আশ্চর্যের বিষয়, হনও। অন্তত এলিয়টের আগে পর্যন্ত ইংলন্ডের সাহিত্য-ইতিহাস পড়লে মনে হয়, বুঝি-বা পাঁজি দেখেই ওই দেশের সাহিত্যে নতুন নতুন যুগ শুরু হয়েছে। অপরপক্ষে বহু লেখক এইসব যুগের আগে-পরে লেখেন, যেমন উইলিয়াম ব্লেক। যেমন, ডস্টয়েভস্কি। যেমন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা সবাই নতুন যুগে শুরু হবার আগে তার প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন। ইংরেজি সাহিত্যের ধারাবাহিক ঐতিহ্য অনুসরণ ও তার শৃঙ্খলা আধুনিককালে টি এস এলিয়ট এবং তার গুরুতুল্য এজ্‌রা পাউন্ডের হাতে ভেঙে যেতে দেখা গেল। এলিয়ট দেশীয় ঐতিহ্য থেকে সৃষ্ট হননি। এলিয়ট ইংলন্ডের কবি নন, আবার আমেরিকার নিউ ইংলন্ডের কবিও তাঁকে বলা যাবে না।

সাহিত্যে আন্দোলন অ্যাকাডেমিক অর্থে পুরোপুরি দেশীয় ঐতিহ্য থেকে কখনওই সৃষ্টি হয় না, বরং অনেক সময় সকল অর্থে বিদেশি ঐতিহ্য থেকে এর জন্ম হয়। এগুলি একদেশে উৎপন্ন হয়ে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

ইংরেজ রোমান্টিকরা ক্লাসিসিজমের বিরোধীগোষ্ঠী ছিলেন। ফ্রান্সের সিম্বলিস্টদের নিশ্চয়ই ভলতেয়ারের রোমান্টিকতা বিরক্ত করেনি; জোলা, ফ্লবেয়ার বা আনাতোল ফ্রাঁসের ন্যাচারালিজমকে বিধ্বস্ত করতেও অতবড় শিল্পবোধের প্রয়োজন ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ইংলন্ডের রোমান্টিসিজমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। টেনিসন ব্রাউনিঙের নিও ক্লাসিসিজম রোমান্টিকদের প্রভুত্ব নষ্ট করতে পারেনি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেলি কিট্‌সের বিরুদ্ধে তারা কোনও নতুন সাহিত্যভাষা দাঁড় করাতে পারেনি। সিম্বলিস্ট আন্দোলন তা পেরেছিল, ফ্রান্সের ওই আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল ইংরেজি সাহিত্যের ঐতিহ্য থেকে, ফরাসি ঐতিহ্য থেকে হয়নি।

কিন্তু এই আন্দোলন যখন ইংলন্ডে না জন্মে ফ্রান্সে জন্মাল কী দ্রুত ও কত সহজে তা সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল এইজন্য যে দেশভেদে সেখানে হাওয়ার যাতায়াতের কোনও বাধা ছিল না। মালার্মে ছিলেন সিম্বলিস্টদের গুরু, তিনি ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন। ভের্লেন ইংলন্ডে বসবাস করেছিলেন, ইংরেজি জানতেন ভালই। ১৮৫২ সালেই বদলেয়র এড্‌গার এলান পো-র কবিতার অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। অপর দিকে জয়েস দেশের বাইরে বাইরেই কাটিয়েছেন বেশি, ফরাসি সাহিত্য যাঁর মাতৃভাষার মতো, সেই এলিয়ট আমেরিকা থেকে এলেন ইংলন্ডে, ইয়েট্‌স ইংলন্ডে বসে 'একমাত্র আন্দোলন' বলে সিম্বলিস্টসের অভ্যর্থনা করলেন। নারীর মতো রূপবান, আয়তচক্ষু মার্লামের মঙ্গলবারের আড্ডায় রু-দ্য রোমের পাঁচতলার বৈঠকখানায় তাই জিদ, দেগা, লাফার্গ, ভালেরি ইত্যাদিদের সঙ্গে অস্কার ওয়াইল্ড, জর্জ মুর ও উইলিয়াম বাটলার ইয়েট্‌সকেও উপস্থিত থাকতে দেখা যেত।

৩

অতি-আধুনিক লেখক-সম্প্রদায় কোন সাহিত্য-ঐতিহ্য বহন করবেন? তাঁদের তো অতি-আধুনিক কবিদের মতো তিরিশের যুগের অনুসরণযোগ্য কাব্য আন্দোলন নেই, তাঁদের যাঁরা অগ্রজ, তাঁরা কল্লোল কালের ফসল। বর্তমান কলেজ স্ট্রিটের প্রায় সকল লেখকের সাহিত্য-শিক্ষা বলে কিছু নেই, এমন নিম্নশ্রেণীর সাহিত্যে আর কোনও দেশে এত দীর্ঘকাল ধরে টিকে আছে কিনা সন্দেহ, আমাদের বাংলাদেশে কখনো ছিল না। এই অবস্থা কতদিন চলবে? চলবে বহুদিন, চলবে চিরকাল, কারণ হাজারে হাজারে ম্যাট্রিকুলেটের সংখ্যা বাড়ছে, ভিলাই-রাউরকেল্লা-দুর্গাপুরের লিটারেট শ্রমিকদের অবধূত, অচিন্ত্যকুমার, নীহার গুপ্ত, শংকর, বিমল মিত্র, এবং অনুল্লিখিত আরও অনেকের দরকার আছে, কিছু কাল আগে ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, পরে সুবোধ ঘোষ তাঁদের প্রিয় ছিলেন। এইসব লেখকের কাছে যে-কেউ কালীপুজোর চাঁদা চাইতে যেতে পারে। পপুলার ও ইমাজিনেটিভ এই দুই জাতে সমগ্র ইউরোপিয় সাহিত্যও চিহ্নিত হয়ে আছে।

কথাগুলির প্রসঙ্গক্রম এই যে, বাংলাদেশের অতি-আধুনিক সাহিত্যও কি ইউরোপের ঐতিহ্য থেকে জন্মাতে পারে না, যেমন ফ্রান্সের সিম্বলিস্ট আন্দোলন জন্মেছিল ইংলন্ডের ঐতিহ্য থেকে, যেমন ফ্রান্সের সিম্বলিস্ট সাহিত্য থেকে শুধু ইংলন্ডের ইয়েট্‌স, জয়েস বা এলিয়ট নয়, সমস্ত ইউরোপেই আধুনিক সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়[২] সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে এখনই অন্তত আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়, কিন্তু এটা তো

আমরা জানি যে জীবনানন্দের কাব্যভাষা এদেশের ছিল না। আর বাংলাদেশের কোন ঐতিহ্য থেকেই-বা 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র মতো অস্তিত্ববাদী উপন্যাস লেখা সম্ভব হয়েছিল? কল্পনাতীত হলেও একথা সত্য, কমলকুমার মজুমদার[৩] একজন বাঙালি লেখক, এবং তিনি আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে লিখছেন! ইয়েট্স-এর মতো আইরিশও আর কেউ ছিল না, জীবনানন্দ ছিলেন রূপসী বাংলারই কবি।

১। কথাশিল্প প্রকাশ কর্তৃক ১৩৬৯ সালে প্রথম প্রকাশিত।

২। মানুষকে নিয়ে যে অনুশীলন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় করেছিলেন, সে অনুশীলন এমনই ঘাতক যে, শেষ পর্যন্ত তা তাঁর প্রাণসংহার করেছিল। তবু তিনি অতিমানুষ ছিলেন না, তাঁর প্রতিভা ছিল অমানুষিক। ভীষণ প্রতিভা তার সমকালকে মূক করে রাখে।

এমনকি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁর সমকালকে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পারেননি। আর পারেননি জীবনানন্দ দাশ। শেষোক্তের কিছু অনুকরণ হয়েছিল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেউ অনুসরণ করতে সাহস পর্যন্ত করেনি।

তিনি বাংলা ভাষায় কিছু গ্রন্থ রচনা করতে গিয়েছিলেন বলে এক আলাদা জাতের পাঠক সমাজ প্রতিদিন প্রস্তুত হচ্ছে, তারই জন্য একদিন বাংলা সাহিত্যের অনেকটাই নিষ্প্রয়োজনীয় মনে হয়, ভবিষ্যতের পাঠক সমাজ বটতলার বদলে কলেজ স্ট্রিটের সাহিত্য বলতে পারবে।

৩। শ্রীকমলকুমার মজুমদার-এর সাম্প্রতিকতম গল্প 'গোলাপ সুন্দরী', 'এক্ষণ' নামে নবীন এক দ্বি-মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব
কৃত্তিবাস, ১৫ সংখ্যা, ১৯৬২

পরিশিষ্ট-২

'সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' বইয়ের ভূমিকা

কুড়ি শতাব্দীর এ-রকম সময়ে একজন লেখকের বড্ড বড় ট্রাজেডি ২টি। ১, তার মাথায় কোনও বৃত্তাকার পরিধি নেই; ২, আজ তার রাজা এসট্যাবলিশমেন্ট, সে সভাকবি মাত্র।

এখন লেখকমাত্রেরই অসুবিধে এই যে তার মাথায় কোনও জ্যোতি নেই। কোনও রহস্য নেই। যেমন একজন এঞ্জিনিয়ারের নেই, একজন বিজ্ঞানীর নেই। কিন্তু জ্যোতিহীন হয়ে গেলেও একজন এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বিজ্ঞানী বা সমাজকর্মীকে মানুষের আজও প্রয়োজন আছে। রকেটে চাঁদে যাওয়া কি ইলেকট্রিক ট্রেনে ব্যাণ্ডেল, হয়ত একদিন এ-সবই নিষ্প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। টেলিফোন, নতুন ব্রিজ, কারখানা, বিপ্লব, এ-সবই মানুষের মনে হবে নতুন নতুন এপিটাফ, তবু তার দেরি আছে। শিল্পীকে কিন্তু আর কোনওরূপ প্রয়োজন নেই। তার কাজ মিটে গেছে। অতএব, একদিকে জ্যোতি নেই, অন্যদিকে মানুষেরও যদি প্রয়োজন নেই, তবে লেখা কেন? কেন ছবি আঁকা? ভ্যান গঘ বা কিটস্-এর মতো শুধু, অন্তত, শিল্পীও যদি বিশ্বাস করতে পারত তার মাথার পিছনের জ্যোতিতে—প্রতিভায়—রহস্যে, তাহলে সে একাই 'কাজ' ক'রে যেতে পারত। উটের

মতো বেঁচে থাকতে পারত কেবল নিজের কণ্ঠলগ্ন জলে তেষ্টা মিটিয়ে। কিন্তু নেই, সরোবরে ছাড়া জল নেই। প্রতিভা নেই। এটা লেখক বা শিল্পী তো জানেই, আজ পাঠকমাত্রেই তা জানে। বাস্তবিক বিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি শিল্পীর এই সংকট, তার সশরীর লোপাট হয়ে যাবার এমন সম্ভাবনা এর আগে কোনও, কখনো, শিল্পীর সামনে আসেনি। জ্যোতিঃপাত ঘটে গেছে! লেখক আজ রুয়োর সেই ছবির মতো, 'বিমর্ষ রাজা', যার সিংহাসন নেই। সিংহাসনে ব'সে আছে একচেটিয়া পুঁজিপতি ও রাজা এসট্যাবলিশমেন্ট! কে কার আসনে ব'সে আছে, হায়। লেখকের প্রতিভা নেই। মানুষের লেখার প্রয়োজন নেই। লেখক ও সাধারণ মানুষ এটা জানে। তবু লেখক লিখছে কেন? না, টাকার জন্যে। টাকা দিচ্ছে এসট্যাবলিশমেন্ট। কিন্তু মজা এই যে, লেখক-পাঠক যতই একমত হোক না কেন যে লেখক-শিল্পীর মাথায় কোনও জ্যোতি নেই, ব্যবস্থা, বা, এসট্যাবলিশমেন্ট তা মানতে চায় না।

কেননা ব্যবসা। বলা হয় শিল্পীর কোনও শ্রেণীচরিত্র নেই। ওঁরা বলেন। শিল্পী হচ্ছে প্রতিভাবান। এরা যে কখন কী করে, বলে বা লেখে তার কিচ্ছু ঠিক নেই। এরা মোদোমাতাল, বেশ্যাসক্ত, এলিয়েনেটেড—এদের সকল দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়াই সুসমাজের লক্ষণ। পিকাসো যত বলছেন, 'লুক্, আই হ্যাভ নো হ্যালো', ওঁরা বলছেন, না-না সে হয় না, তুমি প্রতিভাবান, রহস্যময়, তুমি দুশ্চরিত্র, সিফিলিটিক, পাগল, কম্যুনিস্ট, কোটিপতি, ৭২ -এ তোমার ১৮ -বছরের বৌ, তোমার কথাই আলাদা। তুমি প্রদেজি। তা নাহ'লে সামান্য একটা গাউস পেন্টিং লাখের হিসেব ৮০-তে কিনে ৯০-এ বেচা যায় কী করে? বস্তুত কারখানায় লাগালে স্ট্রাইক, ব্যাঙ্কে কালোটাকা রাখা চলে না—এ এক নতুন ফ্রেমে বাঁধা ল্যাণ্ড স্পেকুলেশান।

ভারতবর্ষ তথা বাঙলাদেশের লেখকরা এসেছে মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে। একদিকে বড়লোকশ্রেণী, মাঝখানে আমলাতন্ত্র ও মিলিটারি লাইন, এদিকে গরিবরা। মধ্যবিত্তরাও থাকে এধারে, গরিবদের সঙ্গে, কিন্তু গরিবদের মধ্যে তারা হচ্ছে প্রিভিলেজ্ড ক্লাস। এদের ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, কবি, প্রফেসর, জার্নালিস্ট প্রভৃতি হতে দেওয়া হয়, বি-এ, এম-এ পাশ করতে দেওয়া হয়, ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্য এরাই করে, এমন কি কখনো এম.এল.এ. বা কৌন্সিলর দাঁড়ায়—আমলাতন্ত্র এদের মধ্যে থেকেই তৈরি হয়। যতদিন দেওয়া চলে, এদের চাকরিবাকরিও দেওয়া হয়। মোটকথা ৫০০ থেকে এদের উপার্জন ক্রমেই মাসিক ১০০০ ও ১ থেকে ২ ও ২ থেকে ৩ হাজারের দিকে অগ্রসর হয়। এ-ছাড়া উপার্জনের প্রতিস্তরেই এদের আরও করে-কর্মে নেবার সুযোগ থাকে; যেমন একজন পদস্থ কর্মচারী ঘুষ নিয়ে বা প্রফেসর প্রাইভেট ট্যুইশান ক'রে অন্যূন আরও ২০০০ অবলীলায় 'উপার্জন' করে থাকে। ক্রমেই এদের কাছে চলে আসে বাথরুম, বেডরুম, উড়ন্ত পর্দা, ফ্রিজ, টেলিফোন ও বার্নার, টেবিলে জমে ওঠে অহার্যের স্তূপ, ছেলেরা ড্রেস পরে যেতে থাকে ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে ও বাবা-মা সাহেব সেজে হাস্যকর ফ্লুরি-তে চা খেতে যায়। সেখানে ব'সে তারা, বাবা-মা, সত্যজিৎ রায় বোঝে, যে, গুপীগাইন আসলে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি ও এরূপ সমঝোতা থেকে যৌনপ্রেরণা পায়। জন্মনিয়ন্ত্রণ থেকে ব্যাঙ্ক-ন্যাশানালাইজেশান, সোস্যালিস্টিক প্যাটার্ন মায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পর্যন্ত সবকিছুতেই এরা বিশ্বাস করে, বাড়িতে আধাকোয়াট ক্ষীরের মতো দুধ বা একগ্লাস সাক্ষাৎ বেবিফুড (আমি দেখেছি!) এক চুমুকে শুষে নেবার সময়টুকু ছাড়া বাকি সময়ে এরা জানে ও কথা উঠলে মানে যে শিশুরা দুধ খেতে পায় না। সামাজিক যাতায়াত থেকে জানি, আবহাওয়ার মতোই 'দেশের দারিদ্র' এদের সোস্যিয়েবেলিটির

একটা অন্যতম বিষয়। এই মিড্‌ল থেকে আপারমিড্‌ল ক্লাসে হিন্দুমুসলমান কংগ্রেসকম্যুনিস্ট সব এক-একাকার অর্ধনারীশ্বর! গু-এর এপিঠ-ওপিঠ। বাস্তবিক দেশের স্টণ্ডার্ড-অফ-লিভিং বাড়ার কথা বলে এমন প্রতিটি শুওরের বাচ্চার, গ্রামের গরিবরা যে-জল পান করে তা দিয়ে, অন্তত একবার, ছোঁচাতে রাজি হওয়া উচিত।

অন্যদিকে এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যেই রয়েছে একটা ছোট অংশ, মার্কস যাদের আদর করে বলেছেন রেনিগেড, যারা ব্যবস্থার সঙ্গে কোলাবোরেট করে না; ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যারা ব্যবস্থাকে ভাঙে। স্বয়ং মার্কস ও লেনিন এসেছেন এই অংশ থেকে। এঁরাও রেনিগেড!

বাংলাদেশের লেখকদেরও আছে শ্রেণীচরিত্র, এঁরা এসেছেন মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে। মধ্যবিত্তশ্রেণীর দুই অংশের মতো এঁরাও দ্বিধাবিভক্ত। শেযোক্ত অংশে রয়েছে অতি-তরুণ লেখকসম্প্রদায়, যারা ব্যবস্থার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বা করতে প্রস্তুত। ৪০ বা ৫০-এর অনেকানেক লেখকের মতোই ব্যবস্থায় একটা জায়গা ক'রে নেবার জন্যে, বয়স্কদের সরিয়ে বা তারা রিটায়ার করা মাত্র ঐ সব জায়গায় ব'সে পড়ার জন্যে শক্রভাবে তারা মায়ের ভজনা করছে এ-রকম আমি মনে করি না।

একটা সাদা সত্যিকথা এই যে ৪০ ও ৫০ -এর লেখকরা মোটের ওপর তাই করেছিলেন। এঁরা বুঝতে পেরেছিলেন সিংহাসন আর তাঁদের জন্যে নয়, সেখানে বসে আছে একচেটিয়া পুঁজিপতি ও রাজা এসট্যাবলিশমেন্ট, যার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ। কলম তরবারির চেয়ে শক্তিশালী নয়, এঁরা বুঝেছিলেন। ৫০-এর কেউ কেউ ভেবেছিলেন ব্যবস্থা ও আদর্শের মাঝখান দিয়ে লেখাকে যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে এঁরা সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবেন। এঁরা ঠিকই ভেবেছিলেন। কারণ, 'এর চেয়ে লেখা ছেড়ে দেওয়া ভালো'.... এ-রকম মনে করা এঁদের পক্ষে ভুলই হত, বিশেষত ৫০-এর লেখকদের পক্ষে।

সোমেন পালিতও অনুরূপ বুঝেছিল। 'নিজের মনের ভুলে কখন সে কলমকে খড়্গের চেয়ে/ব্যাপ্ত মনে ক'রে নিয়ে লিখেছে ভূমিকা, বই, সকলকে সম্বোধন করে!'

—জুহু, জীবনানন্দ দাশ।

এসট্যাবলিশমেন্টের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রেখে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল বাঙলাদেশে ৩০-এর যুগ পর্যন্ত। সতীনাথ ভাদুড়ির লেখা আনতে তখন পাটনায় লোক যেত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সর্বৈব প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে এসট্যাবলিশমেন্টের স্বরূপ প্রথম প্রকাশ পায়। তারপর থেকে একে খুশি না রেখে উপায় নেই। সফলতা নেই।

কিন্তু লেখকের এই 'সাফল্য' কী? এসট্যাবলিশমেন্টে ঢুকে যে-কোনও তরুণ লেখক কী দেখতে পায়? সে দ্যাখে কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর বেঁটে মানুষ, রিভলভিং চেয়ারে বসে-থাকা কিছু পাউডার্ড শিম্পাঞ্জি, তাদের মুখের রগড়, এর বেশি-কিছু সে দেখতে পায় না। এই কী লেখকের সাফল্য, বড়লোকশ্রেণীর সঙ্গে এই মিশে যাওয়া?

এইজন্যেই প্রায়ই শোনা যায়, অমুক লেখক প্রাইজটা বা ঐ চাকরিটা পাবার পরেই এ-রকমটা হল। কিন্তু মুর্খ প্রৌঢ় মনে করে, 'হুঁঃ! বাড়ি করেছি কিনা। হিংসে করছে!'

অবশ্য এটা ঠিকই যে এসট্যাবলিশমেন্ট বহুরূপী, কোনও কোনও সময় তাকেই সবচেয়ে প্রগতিশীল বলে ভুল হয়। টাইম-ম্যাগাজিনে চে গুয়েভারাকে নিয়ে কাভারস্টোরি বেরোয়, আকাশবাণীর দেবদুলালরা উদযাপন করে অক্টোবর বিপ্লবের বার্ষিকী, এসট্যাবলিশমেন্ট নতুন সাহিত্যরীতির প্রোটাগনিস্ট হয়ে ওঠে ও অশ্লীলতা-মামলা লড়ে। যে-কোনও জিনিস বাণিজ্যিক স্তরে উঠলেই ব্যবস্থা তাকে গ্রহণ করে, এবং কে না জানে, আধুনিক আর্ট ও লেখাই এখন উঠ্‌তি বাণিজ্য।

যদি বা কখনো ব্যবস্থা কিছু প্রকৃত সৎ জিনিস নেয়, সকলেই জানেন, তা সাময়িক। ফরাসি বিপ্লবের পরে দিনকতক ভোগ্যপণ্য গড়াগড়ি গিয়েছিল রাস্তায়, যে শুধু দারিদ্রকে সাময়িক লুকানো। যথাসময়ে ওরা আবার তা কেড়ে নেয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে আগত বাঙলাদেশের একজন যুবক লেখকের স্বাভাবিক সমস্যাটা কী হতে পারে? নিঃসন্দেহে ব্যর্থতা। নিঃসন্দেহে এ্যালিয়েনেশান বা ডিসট্যান্স। একটা গাছে হাত দিয়ে নিশ্চয়ই সে যা বোঝে তা হল এটা কাঠ, বৃক্ষ পরে মনে হয়? এ-ভাবেই সে প্রেম, দুঃখ, বিচ্ছেদ, স্মৃতি প্রমুখ অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনগুলিকে লিঙ্গ সোজা রেখে প্রহার করতে শেখে ও ক্রমে ও-সবের রক্তমাংস বা নাউনগুলিকে পায়। পেতে চায়। বাস্তবিক, শুধু জড় ও অজড় প্রকৃতিজগৎ থেকে নয়, শুধু মানুষ থেকে নয়, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকেও সে আজ দূরে ও বিচ্ছিন্ন! 'ফুটপাতে আমি শুয়ে আছি/ফুটপাতে তুমি আছ শুয়ে/ তোমার আমার মধ্যে নেই ফুটপাত', সে লেখে।

ব্যবস্থা বা এসট্যাবলিশমেন্ট একে কী সাকসেস দেবে, এই যুবককে? একাদিন ছিল যখন ব্যবস্থা লেখককে সাফল্য দিতে পারত। খ্যাতি দিতে পারত। কিন্তু এখন আর তার সে ক্ষমতা নেই। এখন লেখক লেখে, মুজরো পায়, এসট্যাবলিশমেন্টের মুনাফা বাড়ে, আবার আসে নতুন কনজিউমার গুড্স, লোকে ভুলে যায়। এখন শীতকালে লেখ, গ্রীষ্মকালে লেখ, বর্ষাকালে লেখ; সকালে লেখ, দুপুরে লেখ, বিকেলে লেখ, রাত্রে লেখ; লেখ—শুধু লিখে যাও— কোনও একটি বই লিখে বিখ্যাত বা অমর হবার সম্ভাবনা এসট্যাবলিশমেন্ট নষ্ট করে দিয়েছে। অতএব কোনও সততা বা নীতির প্রশ্ন আর ওঠে না। আর কিছু দেবার নেই ব'লে, শুধু নিছক আত্মরক্ষার তাগিদেই সবরকম ব্যবস্থা থেকে যুবাসম্প্রদায়ের বড় অংশ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

এবং এরাই হচ্ছে আভ-গার্দে বা অগ্রবর্তী অংশ।

'সোমেন পালিতের বৈবাহিক' শীর্ষক রচনার অংশ
মিনিবুক-৩, ১৫ নভেম্বর ১৯৬৯